জাতিস্মর-কথা

শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু

পোঃ সৎসঙ্গ, বি-দেওঘর,
সাঁওতাল পরগণা, বিহার

প্রকাশক ঃ
শ্রীমধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়,
দি ঘাটশীলা কোম্পানী,
৩নং ম্যাঙ্গো লেন,
কলিকাতা—১
ফোন—২৩-২৫১৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
তালনবমী তিথি,
২৫শে ভাদ্র, ১৩৬৬

প্রুফ্ রীডার
শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন

বাইণ্ডার ঃ
সৎসঙ্গ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্ ।

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীঅমূল্যকুমার ঘোষ,
সৎসঙ্গ প্রেস,
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, এস-পি ।

মূল্য—৪৭৫

যাঁর সঙ্গলাভে নবজীবনের হিল্লোল আমার অস্ফুট
চেতনাকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল ও যাঁর
স্পন্দনপ্রেরণা আমাকে এই জাতিস্মরতথ্যসন্ধানে
উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল এবং সেই প্রচেষ্টায় আমার এই
অপটু হস্ত যে কুসুম সম্ভার চয়ন করিতে সমর্থ
হইয়াছিল তাহার মধ্য হইতে কয়েকটি মাত্র
তাঁরই শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলিরূপে প্রদত্ত হইল।

ভূমিকা

কোন্ অনাদিকাল হইতে মানবমনে স্বতঃই এই অবাধ্য প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ উত্থিত হইতেছে—আমরা কোথা হইতে এই পৃথিবীতে আসিয়াছি এবং মৃত্যুর পরই বা কোথায় যাইব? মৃত্যুতেই কি আমাদের সব শেষ হইয়া যায়, কিছুই কি অবশেষ থাকে না? মৃত্যুর রহস্যঘন যবনিকার অন্তরালে প্রগাঢ় অন্ধকার ব্যতীত আর কোন-কিছুরই অস্তিত্ব নাই কি? ইহজীবনে মানবমনের সকল কামনা, বাসনা, আশা, আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি কি এইখানেই? মৃত্যুর নির্ম্মম আঘাতে প্রিয়জনবিয়োগ-ব্যথায় বেদনাতুর হৃদয় কি অনন্তকালের মতই তার প্রিয়জন হইতে বিচ্ছিন্ন হয়? যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ এই অজানা রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে—সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের তত্ত্বদর্শী দার্শনিক, কবি—সকলেই এই প্রশ্নের সদুত্তর অন্বেষণ করিতেছে।

মৃত্যুতেই যদি সব শেষ হয় তবে এই পৃথিবীতে আসিয়া সংসার-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার ও ক্রমশঃ উন্নতিতে অধিরূঢ় হইবার যে একান্ত প্রয়াস তাহা নিতান্তই হাস্যকর হইয়া দাঁড়ায়। বাস্তব জীবনে এই সমস্যার একটা মীমাংসা যে কত প্রয়োজন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মৃত্যুই যদি জীবনের শেষ যবনিকা টানিয়া দেয়, তাহার পরে আর কিছুই যদি না থাকে তাহা হইলে এই পার্থিব জীবনের একমাত্র দিগ্‌দর্শন হইয়া দাঁড়ায় বা হওয়া উচিত চার্ব্বাক ঋষির মতবাদ—

> "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ
> ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।"

খাও-দাও আর যত পার মজা লোটো—কারণ, দুদিন পরেই সব শেষ। এ মর জগতে যে কয়টা দিন বাঁচিয়া থাকা যায়—সৎ বা অসৎ যে-কোন উপায়েই হউক—দুঃখ বা অশান্তিকে এড়াইয়া আরামে থাকিতে পারিলেই হইল। কিন্তু এই মতবাদ মানিয়া লইয়া জীবন-নৌকায় দাঁড় ফেলিয়া সংসার-জলধির ঝড়-তুফান অতিক্রম করা

মানুষের পক্ষে দুষ্কর হইয়া দাঁড়ায়, জীবনের পথে সাহস করিয়া অগ্রসর হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, উক্তরূপ ভাবনা মানুষের সামাজিক জীবনের ভিত্তিকে একেবারে শিথিল করিয়া দেয়।

মৃত্যুতেই যদি জীবনের চরম পরিসমাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে evolution বা ক্রমাভিব্যক্তিবাদও একটা অর্থহীন বাক্যমাত্র হইয়া পড়ে। ইভলিউসন শব্দের অর্থ যাহা অব্যক্ত ছিল তাহা ব্যক্ত হওয়া। সমস্ত শক্তি, সমস্ত সম্ভাবনা আমাদের ভিতরে প্রচ্ছন্ন আছে, সুযোগ-সুবিধা ঘটিলেই তাহার ব্যঞ্জনা হয়—অতএব মানুষের অভ্যুদয়ের উৎস অফুরন্ত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা ইভলিউসন স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, ইহা শুধু দেহগত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে জীবের দেহ-বিকাশের ক্রম—সরীসৃপ, পক্ষী, পশু, বানর, মানুষ ইত্যাদি। আমাদের দেশে দশাবতারের ক্রমপর্যায়—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন—ইত্যাদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে। ইহা ব্যতীত বৃহৎ-বিষ্ণু-পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, জীব—জলজ, স্থলজ বহু-সহস্র জীব-যোনী পরিভ্রমণ করিয়া মনুষ্যযোনিতে প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ দ্বিজত্বে উপনীত হয়। আবার দ্বিজের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্‌ই শ্রেষ্ঠ। সমস্ত যোনি পরিভ্রমণ করিয়া জীব সর্ব্বশেষে ব্রহ্মযোনি লাভ করে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বিবর্ত্তনের দেহগত ক্রম-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে মতভেদ নাই কিন্তু ভারতীয় মনীষিগণ বলিয়াছেন যে, বিবর্ত্তন দেহগত তো বটেই অধিকন্তু তাহা জীবন বা চিৎ (consciousness)-গতও।

আবার অধুনা পাশ্চাত্য জৈব বিজ্ঞানের আচার্য্যগণ বলিতেছেন যে, প্রাণি-শরীরে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবের উৎপত্তি হইতেছে উহা পারিপার্শ্বিক অবস্থাজনিত নহে, উহা স্বয়ংজাত ও আকস্মিক। প্রকৃতি আপনার খেয়াল-খুশী-মত প্রাণীর শরীরে আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটায়, উহা বাহিরের কোন কারণের উপর নির্ভর করে না। তবে একথা অতি নিশ্চয় যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল না হইলে কোন প্রাণীই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান বিজ্ঞান আজ যাহা বলিতেছে, বহুযুগ পূর্ব্বে ভারতের ঋষি পতঞ্জলি সেই কথাই বলিয়া গিয়াছেন—

"জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যা পূরাৎ, নিমিত্তম্
অপ্রয়োজকমং প্রকৃতীনাং বরণ ভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।"

অর্থাৎ একজাতির যে অন্য জাতিতে পরিণতি হয় তাহা প্রকৃতির আপূরণের

দ্বারাই হয়, তজ্জন্য প্রকৃতি কোন বাহিরের নিমিত্তের অপেক্ষা করে না। প্রকৃতির স্বীয় চাহিদার ক্ষুধাই এই বিবর্ত্তনের কারণ। যেমন ক্ষেত্রিক জলপূর্ণ ক্ষেত্র হইতে অন্য এক ক্ষেত্রকে জলদ্বারা প্লাবিত করিতে ইচ্ছা করিলে সেই জলের আবরণ বা আলি ভেদ করিয়া দেয়, আর তাহা ভেদ করিলে স্বতঃই সেই ক্ষেত্র প্লাবিত করে, সেইরূপ প্রকৃতি স্বতঃই আবরণকে ভেদ করিয়া এক জাতিকে আর এক জাতিতে পরিণত করে।

এস্থলে আর একটি বিষয়ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমতে জড়জগৎ প্রাণহীন, কিন্তু এই প্রাণহীন জড়জগতে কিরূপে প্রাণের উদ্ভব হইল তাহা বিজ্ঞানীদের নিকট এখন পর্য্যন্তও একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকা। বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতভেদও আছে। একদল বলেন, কোন সুদূর অতীতে একদিন প্রাণ হঠাৎ অজ্ঞাতভাবে দেখা দিয়াছিল, অন্যদল বলেন, প্রাণহীন কখনও প্রাণের জনক হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন, কোন স্মরণাতীত কালে অন্য কোন গ্রহ হইতে প্রাণের বীজ আমাদের এই পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই হইতেই আমাদের পৃথিবীতে প্রাণিজগতের উৎপত্তি। যদি অন্য কোন গ্রহ হইতেই প্রাণবীজ আসিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই গ্রহে প্রাণের উৎপত্তি কি করিয়া হইল এ বিষয়ে তাঁহারা নিরুত্তর। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বিজ্ঞান প্রাণের উৎপত্তি-সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই। সম্প্রতি বিজ্ঞান শুধু এইমাত্র বলিতেছে যে, ভাইরাস্ নামে অতি সূক্ষ্মতম জীবাণু জড় ও চেতন রাজ্যের মধ্যে সেতু রচনা করিয়াছে।

কিন্তু প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণ বলিয়া আসিতেছেন যে, যাহাকে প্রাণহীন জড় আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইতেছে তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রাণহীন নহে, সবই চিৎ-সত্তায় অনুপ্রাণিত, সবই চিন্ময়—তবে চিৎ-এর প্রকাশের তারতম্য আছে। এই চিৎশক্তি বিবর্ত্তনের প্রেরণায় প্রথমতঃ স্থাবর সৃষ্টি করিয়া উদ্ভিদরাজ্যে উপনীত হইল, পরে উদ্ভিদরাজ্য অতিক্রম করিয়া জীবরাজ্যে প্রবেশ করিল। জীবরাজ্যে বহুযোনি ভ্রমণ করিয়া জীব অবশেষে মনুষ্যদেহ গ্রহণ করে। মানুষও আবার প্রথমে অসভ্য, তারপর অর্দ্ধসভ্য, সভ্য—শেষ পর্য্যায়ে সুসভ্য মানুষ হইয়া অতিমানবের (superman) স্তরে উন্নীত হয়। তাঁহারা তখন যা-কিছুতেই সেই চিৎ-এর বিকাশ বোধ করেন এবং সৎ-চিৎ-আনন্দের পূর্ণ অধিকারী হন। তাঁহারাই ব্রহ্মবিৎ।

আর এই চরম পরিণতিতে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের বা মনুষ্যের

গতাগতির বিরাম নাই। আবার এই চরম বা পরমোৎকর্ষ লাভ করিবার পন্থা বা প্রণালী হইল জন্মান্তর। জন্মান্তর-রূপ সরণীর আশ্রয় লইয়াই মানুষকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে হয়। এ জন্মে মানুষ ক্রমবিকাশের যে ধাপে পৌঁছে, সেই উন্নতি সংস্কাররূপে তাহার মধ্যে রক্ষিত হয় এবং পরজন্মে সে সেই সংস্কারের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করে—এইরূপে জীব জন্মের পর জন্ম গ্রহণ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

পাশ্চাত্য মনীষীদের মধ্যে অনেকে এখন প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন যে, প্রাণীর যে প্রাণশক্তি (Life or Elan vital) তাহাই শরীর গঠন করিতেছে। সমস্ত প্রাণীজগতের নব নব সৃষ্টি এক ঈক্ষণা বা সঙ্কল্পের ব্যাপার—বস্তুতঃ ঈক্ষণা ব্যতিরেকে সৃষ্টি হইতেই পারে না। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বার্গসনের এই মত। তিনি বলেন, মানুষ যেমন করিয়া অণুবীক্ষণযন্ত্র গড়িয়াছে, প্রাণশক্তিও ঠিক তেমন করিয়াই চক্ষুযন্ত্র গড়িয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের কথারই প্রতিধ্বনি আমরা আজ আবার নূতন করিয়া পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের নিকট হইতে শুনিতেছি।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে আছে—

"শব্দরাগাৎ শ্রোত্রমস্য জায়তে ভাবিতাত্মনঃ
রূপরাগাৎ তথা চক্ষুঃ ঘ্রাণং গন্ধ জিঘৃক্ষয়া।"

প্রাণীর আত্মার অর্থাৎ অন্তস্থ প্রাণের শব্দ শুনিবার ভাবনা হইলে পর কান, রূপ চিনিবার ইচ্ছা হইলে চোখ, গন্ধ আঘ্রাণ করিবার বুদ্ধি হইতে নাক উৎপন্ন হইল।

তাহাই যদি হয়, অর্থাৎ দৈহিক পরিবর্তন যদি প্রাণশক্তির প্রেরণা ভিন্ন সম্ভব না হয়, তবে বিবর্তন শুধু দেহগত হয় কিরূপে? ইহা দেহগত ও জীবগত উভয়ই।

মানবদেহের বিবর্ত্তনের বা ক্রমবিকাশের যেমন একটা ধারাবাহিক সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে, সেই রকম দেহাশ্রিত দেহীর অর্থাৎ প্রাণ বা চিৎশক্তির (consciousness)-ও ক্রম-উদ্ভিন্নতার বা বিকাশেরও একটা ধারাবাহিকতা আছে। "স্থাবরে যে চিৎ নিরুদ্ধ-চেতন হইয়া আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল, উদ্ভিদে যে চিৎ জ্ঞানশক্তির স্তম্ভনে প্রাণের স্পন্দনমাত্র অনুভব করিয়াছিল, পশুপক্ষীতে যে চিৎ সুখদুঃখের অনুভূতি লাভ করিয়াও প্রজ্ঞা ও প্রেমের উচ্চতর স্পন্দনে সাড়া দিতে পারে নাই—সেই চিৎ মানব-শরীর গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে বিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসমান হইয়া সৎ-চিৎ-আনন্দের অধিকারী হয়।"

বৈজ্ঞানিক ষ্টিভেন্‌সন হাওয়েলসাহেবও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "জীব এই জগতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং প্রত্যেক জন্মে সে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তাহা তাহার জ্ঞান ও সামর্থ্যে রূপান্তরিত হয়। অতএব প্রত্যেক জন্মই তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি-বিকাশের এক-একটা সোপান-স্বরূপ। সে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া চরমে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে—আর এই গন্তব্যস্থল হইতেছে তাহার চরম পরিণতি—পরিপূর্ণতা লাভ (the perfecting of his being)। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার "চলার সাথী" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, "আর অধিগম্য যদি কিছু থাকে, তা' হ'চ্ছে স্মৃতিবাহী চেতনা যা' জীবন ও মরণকে ভেদ করিয়া পরবর্ত্তীতে পৌঁছাইয়া দেয়—কারণ ইহার ভিতর দিয়াই আমরা এই দেহেই অমরণ বা অমৃতত্ব যে কি তাহা অনুভব করিতে পারি।"

জন্মান্তরই যদি মানুষের পরিপূর্ণতা-লাভের একমাত্র প্রণালী বা পন্থা হয়, তাহা হইলে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, ইহা প্রমাণসিদ্ধ কি না।

আমরা দেখি যে, জগৎ বৈচিত্র্যময় ও বৈষম্যপূর্ণ। মানুষে মানুষে প্রভেদ তো আছেই, কিন্তু এই প্রভেদ কেবলমাত্র অবস্থা বা ভোগের প্রভেদ নয়—প্রকৃতি, প্রবৃত্তি এবং সুযোগেরও প্রভেদ। আবার একই পিতা-মাতার সন্তান একই আবেষ্টন ও সুযোগের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াও স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির বিভেদ হেতু তাহাদের কেহ হইয়া দাঁড়াইল মহাপণ্ডিত, কেহ মহামূর্খ, কেহ দস্যুতস্কর, আবার কেহ বা মহাসাধু, কেহ বা জন্মাবধি সুখৈশ্বর্য্যে লালিত-পালিত, আবার কেহ বা দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত, কেহ বা সারাজীবন নীতি ও ধর্ম্মমার্গ অনুসরণ করিয়া তাহার ন্যায্য প্রাপ্য পুরস্কার লাভে বঞ্চিত, আবার কেহ বা অন্যায় ও অধর্ম্মাচরণে সারাজীবন অতিবাহিত করিয়াও তাহার প্রাপ্য নির্য্যাতন ও তিরস্কার লাভ না করিয়া সাধুজনপ্রাপ্য পুরস্কার বা সম্মানের অধিকারী হইয়া থাকে। কেন এমন হয়?

যাঁহারা কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর স্বীকার করেন না, তাঁহাদের পক্ষে জগতের এই বৈষম্যের কোন সুযুক্তিপূর্ণ মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভবে না। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা, যাঁহারা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না, তাঁহারা জগতের এই বৈষম্যের কোন সন্তোষজনক সমাধান দিতে পারেন না। বস্তুতঃ জন্মান্তরবাদ ব্যতিরেকে অপর কোন যুক্তিযুক্ত থিওরী বা মতবাদ উপস্থাপিত করা সম্ভবও নয়।

তা'ছাড়া আমরা যাঁহাদের প্রতিভাবান্ ব্যক্তি বলি—যেমন, সেক্স্‌পিয়র, কালিদাস, মোসার্ট, তানসেন, মাইকেল এন্‌জেলো, প্লেটো, শঙ্করাচার্য্য, জুলিয়াস সিজার, চাণক্য, আইনষ্টাইন প্রভৃতি—ইঁহাদের এই অসামান্য প্রতিভার বিকাশই বা কিরূপে সম্ভব হইল? এক জীবনের culture দ্বারা অসামান্য প্রতিভার অধিকারী হওয়া সম্ভবে কি?

আবার আর এক ধরণের অদ্ভুত শিশুর পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। এই সব শিশু জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই কোনরূপ শিক্ষা ব্যতিরেকেই কেহ বা হইয়া দাঁড়ান অদ্ভুত সঙ্গীতজ্ঞ, কেহ বা অসাধারণ বাগ্মী, কেহ বা গণিত-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত—ইংরাজীতে ইঁহাদিগকে বলা হয় prodigy. মহাকবি কালিদাসের ভাষায় "প্রপেদিরে প্রাক্তন জন্মবিদ্যা"—একথা স্বীকার না করিলে ইহার আর কোন সুযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

এই পৃথিবীতে যাঁহারা মহামানবরূপে পূজিত, যাঁহাদের অসীম জ্ঞান, অলৌকিক প্রেম, মহৎ জীবন ও কর্ম্মধারা অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, মানব-সমাজকে যুগে যুগে প্রকৃত পথের নির্দ্দেশ দিয়া আগাইয়া লইয়া চলিয়াছে, সেইসব মহাপুরুষ—যেমন শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু প্রভৃতি সকলেই জন্মান্তরের কথা বলিয়াছেন।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন:

> "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
> তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥"

'হে অর্জ্জুন, আমার ও তোমার বহু বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সে সমস্ত জানি কিন্তু তুমি জান না।' যদি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি আমাদের চিত্তপটে স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিত, তাহা হইলে জন্মান্তর সত্য কিনা তাহা আলোচনা করিবার কোন প্রয়োজনই হইত না। সাধনা দ্বারা এই জাতিস্মরত্ব লাভ করা যায়, এবং ইহার প্রণালী সম্বন্ধে পাতঞ্জল ঋষি বলিয়াছেন, "সংস্কার সাক্ষাৎকারাৎ পূর্ব্ব জাতি জ্ঞানম্।" এবং পাতঞ্জল-দর্শনের ব্যাস-ভাষ্যে তত্ত্বজ্ঞানী মহর্ষি জৈগীষব্যের কথা বলা হইয়াছে যে, তিনি দশকল্পের মধ্যে যতবার যত যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সেই সব বিবরণ তাঁহার স্মৃতিতে জাগরূক ছিল। ভগবান মনু বলিয়াছেন—

> "বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ
> অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিস্মরত্তি পৌর্ব্বিকীম্।"

এবং ইঁহাদেরই মতবাদকে সমর্থন, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া জাতিস্মরতা-লাভের উপায় সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন, "অটুট ইষ্টপ্রাণতার সহিত জ্ঞান বা জানার দিকে ঝোঁক রাখিয়া অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাস ও বেদাভ্যাস তৎপর হইয়া তপস্যা বা অভীষ্ট লাভে প্রচেষ্টাপরায়ণ হওতঃ মানসিক ও শারীরিক শুচিতার সহিত প্রতি পারিপার্শ্বিকের উপকার-প্রচেষ্টা-প্রবণ থাকিয়া অন্তরের দ্রোহভাবকে অর্থাৎ অপকার করার ভাবকে তিরোহিত করে দাও—আর তোমার বিগত দৈনন্দিন কার্য্যগুলিকে অর্থাৎ এ যাবৎ যাহা কিছু করিয়াছ—পর পর দৈনিক হিসাবে প্রাত্যহিক পশ্চাদপসরণী চিন্তা দ্বারাই হউক বা যথাসম্ভব সেই কর্ম্ম বা সংস্কারগুলিকে স্মরণে আনিয়া বা সাক্ষাৎকার করিয়া স্মৃতিকে উজ্জ্বল রাখিতে চেষ্টা কর।"

সাধনা দ্বারা পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি লাভ হইয়াছে এরূপ একজন গৃহী ভক্তের কথা লেখক অবগত আছেন। তাহার সাধনালব্ধ পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির বিবরণ যথার্থ কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তাহার স্মৃতিলব্ধ পূর্ব্বজন্মের জন্মভূমিতে যাইয়া তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া লেখক এ বিষয়ে সংশয়হীন হইয়াছিলেন। তা'ছাড়া সাধনা দ্বারা পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি লাভ হইয়াছে এরূপ দুইজন মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার সুযোগ ও সৌভাগ্যও এই দীন লেখকের হইয়াছিল।

ভগবান্ বুদ্ধ বোধিদ্রুমতলে সম্বোধি লাভ করিলে পর পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি তাঁহার চিত্তপটে স্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—

"অনেক জাতি সংসারং সন্ধ্যাবিসমং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক! দিত্তট্‌ঠাহসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকুটং বিসঙ্খিতং
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তন্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা॥"

দেহরূপ-গৃহনির্ম্মাতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহাকে না পাইয়া কতবার জন্মগ্রহণ করিলাম, কত সংসারেই পরিভ্রমণ করিলাম। পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ কী দুঃখকর! হে গৃহকারক, এইবার তোমাকে দেখিয়াছি, আর গৃহনির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। তোমার সকল ফাঁসি ভগ্ন হইয়াছে, গৃহকূট নষ্ট হইয়া গিয়াছে, নির্ব্বাণগত আমার চিত্তে সকল তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান খৃষ্টিয়ান ও মুসলমানগণ জন্মান্তরে বিশ্বাসী নহেন। তাঁহারা বলেন

যে, প্রত্যেক মানব এই পৃথিবীতে একবার মাত্রই জন্মগ্রহণ করে, মৃত্যুর পর তাহারা অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত থাকে, অবশেষে শেষ বিচারের বা রোজকিয়ামতের দিন তাহাদের সকলকে জাগরিত করা হয় এবং যিনি পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছেন তাহার জন্য অনন্তকাল স্বর্গের এবং যে পাপকর্ম্ম করিয়াছেন তাহার জন্য অনন্তকাল নরকের ব্যবস্থা করেন বিশ্বের অধিপতি যিনি। কিন্তু অনন্তকালের তুলনায় এ পৃথিবীতে সামান্য কয়েক বৎসরের জীবন শাশ্বত সুখ ও দুঃখের প্রস্তুতির পক্ষে কখনও পর্য্যাপ্ত বা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কি? কিন্তু যিশুর ধর্ম্ম যখন জীবন্ত ছিল, তখন খৃষ্টীয় উপদেশকরা—যাঁহাদিগকে Christian fathers বলা হইত—যেমন, Jerome, Origen প্রভৃতি জন্মান্তর বিষয়ে উপদেশ দিতেন। অধিক কি, স্বয়ং ভগবান্ যিশু স্পষ্ট ভাষায় জন্মান্তর সম্বন্ধে তাঁহার শিষ্যদের নিকট বলিয়াছেন। তাঁহার গুরু জন-দি-ব্যাপটিষ্ট সম্বন্ধে তিনি তাঁহার শিষ্যদের নিকট বলিয়াছেন, ইনিই পূর্ব্বযুগের ধর্ম্মশিক্ষক ইলায়াস (Elias), এ যুগে জনরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।—(St. Matthew—xvi. 13-14.—xvii-10-13)

মুসলমানগণ জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু কোরাণে আছে, "God generates beings and sends them back over and over till they return to Him." (Al Quran xxx-xi)

মুসলমানদের মধ্যে সুফি-সম্প্রদায় নামে ধ্যানী সাধক-সম্প্রদায় আছেন। ইঁহারা জন্মান্তরে বিশ্বাসী, ইঁহাদের একজন প্রধান আচার্য্য জালালুদ্দিন রুমি, তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মেসনাভি'তে জন্মান্তরের—ক্রমবিবর্ত্তনের সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন।—(Masnavi—iv)

প্রাচীন পারস্য, মিশর, চীন, গ্রীস প্রভৃতি দেশে এই জন্মান্তরবাদ প্রচলিত ছিল। গল দেশে ড্রুইড্‌স্‌রা এই মতবাদ তাঁহাদের শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে আলেকজেন্দ্রিয়াতে প্রসিদ্ধ ইহুদী দার্শনিক ফিলো এই জন্মান্তরবাদ তাঁহার শিষ্যদের নিকট ব্যাখ্যা করিতেন। খৃষ্ট-জন্মের তিন শতাব্দী পরে দার্শনিক প্লটিনাস রোমে এই মতবাদ শিক্ষা দিতেন। ষোড়শ শতাব্দীতে প্লটিনাসের মতবাদ "নিও-প্লটিনিজম" নামে প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জন্মান্তরবাদ পুনরায় বিশেষরূপে প্রচারিত হইতে থাকে।

প্রাচীনকালের পাশ্চাত্য দেশের মনীষিগণ—পিথাগোরাস, প্লেটো, এম্পিডোক্লিস, সিসিরো, সেনেকা, ভার্জিল, অভিড প্রভৃতি এই মতবাদের অনুরাগী ও বিশ্বাসী

ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার জাতিস্মরও ছিলেন। মনীষী পিথাগোরাস্ তাঁহার শিষ্যবর্গের কাছে বলিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে এক জন্মে তিনি ট্রয় অবরোধের সময় এক প্রসিদ্ধ যোদ্ধারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আর এক জন্মে দার্শনিক হারমোটিমাস (Hermotimus of Clazomenae) রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—এ সম্বন্ধে তাঁহার সুস্পষ্ট স্মৃতি আছে।

১৯ শতকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জন্মান্তরবাদ পাশ্চাত্য দেশে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা আমরা তৎকালের প্রসিদ্ধ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি, সাহিত্যিকদের মতামত হইতে জানিতে পারি।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক ডেভিড্ হিউম জন্মান্তরবাদের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "It is the only system of immortality that philosophy can hearken."

দার্শনিক জেমস্ ওয়ার্ড তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক "Pluralism & Theism" -এ বলিয়াছেন, "Pre-existence & Re-incarnation is certain."

১৯ শতকে পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বপ্রধান সাহিত্যরথী, কবি-সম্রাট গ্যেটে বলিয়াছেন, "I am sure that I, such as you see me here, have lived a thousand times and I hope to come again another thousand times." পোলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক লুটোলস্কিও নিজের সম্বন্ধে ঠিক মহাকবি গ্যেটের অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হাক্সলি তাঁহার Evolution & Ethics নামক পুস্তকে বলিয়াছেন, "None but very hasty thinkers will reject it.……Like the doctrine of Evolution itself that of transmigration has its roots in the world of reality."

ইলেকট্রনের আবিষ্কর্ত্তা প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার উইলিয়ম ক্রুক্স, বৈজ্ঞানিক সার অলিভার লজ, লারকিন প্রভৃতিও জন্মান্তরবাদী।

প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক শেলী, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, টেনিসন, ব্রাউনিং, লংফেলো, হুইটম্যান, ভিক্টর হিউগো, ব্যালজ্যাক্, ইবসেন, মেটারলিঙ্ক প্রভৃতি ও দার্শনিক স্পিনোজা, হেগেল, সোপেনহাউয়ার প্রভৃতি জন্মান্তরবাদে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন।

প্রমাণ ত্রিবিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম বা আপ্তবাক্য। এ পর্য্যন্ত জন্মান্তর-

সম্বন্ধে অনুমান ও আগম-প্রমাণের কথাই বলা হইয়াছে। এইবার জন্মান্তর সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা তাহা দেখা দরকার।

পূর্ব্বজীবনের স্মৃতি সাধারণতঃ মানুষের থাকে না, কিন্তু কখনও কখনও এমন অদ্ভুত বালক-বালিকা দেখা যায়, যাহারা শিশু-অবস্থাতেই—প্রায় জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গেই তাহাদের পূর্ব্বজীবনের ঘটনাবলী বলিতে আরম্ভ করে—পূর্ব্বজীবনে সে কি ছিল, কোথায় জন্মিয়াছিল, তাহাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, বিশেষ বিশেষ ঘটনা প্রভৃতির কথা নিখুঁতভাবে বলিতে থাকে। এমন কি দূরবর্ত্তী আত্মীয়-স্বজনকে প্রথম দর্শনেই পূর্ব্বজীবনের আপনার জন বলিয়া চিনিয়া লইয়াছে এবং অনুসন্ধানে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহাদের বর্ণিত পূর্ব্ব-জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর বিবরণও যথার্থ। যাহাদের এইরূপ স্মৃতি থাকে তাহাদিগকে জাতিস্মর বলা হয়। নানারূপ পরীক্ষা-সমীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের বর্ণিত ঘটনাবলীকে জন্মান্তরের স্মৃতি ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে ব্যাখ্যান করা চলে না।

এইরূপ জাতিস্মর শিশুর জন্ম কোন বিশেষ দেশ, কাল ও পাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে—সর্ব্বদেশে, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী সকলের ভিতরেই মধ্যে মধ্যে ইহাদের আবির্ভাব ঘটে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এরূপ জাতিস্মর শিশু আমি অনেক দেখিয়াছি ও তাহাদের প্রদত্ত বিবরণের সত্যতা যাচাই করিয়াছি। জন্মান্তরবাদে অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসী সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহাদের আবির্ভাবের পরিচয় আমি পাইয়াছি।

পাশ্চাত্য দেশের অনেক সুধী ব্যক্তি বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাঁহাদের দেশের বহু জাতিস্মরের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

Soul of a People (Fielding Hall), Reincarnation for Every man (Shaw Desmond), Ring of Return (Eva Martin), Pre-existence & Reincarnation (W. Lutoslawaski) প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, জাতিস্মরত্ব দেশ ও কালের দ্বারা সীমিত নয়। আর এরূপ জাতিস্মর শিশুই জন্মান্তরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। জন্মান্তরের প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ এইরূপ কয়েকটি জাতিস্মর শিশুর প্রকৃত বিবরণ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল।

বাংলাদেশেও জাতিস্মর শিশুর অভাব নাই। বাংলার প্রসিদ্ধ বীর বিপ্লবী ত্রয়

বিনয়-বাদল-দীনেশের মধ্যে দীনেশ জাতিস্মর ছিল। বাংলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের জাতিস্মরদের বিবরণ পরবর্ত্তী খণ্ডে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বর্ত্তমানে প্রকাশিত এই "জাতিস্মর-কথা" বহুপূর্ব্বে "জাতিস্মর সন্ধানে" এই নামে সৎসঙ্গের মুখপত্র "আলোচনা" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল আলোচনা-সম্পাদকের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে।

পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে এত বিলম্ব হইল কেন একথা অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—তাহাদের অবগতির জন্য জানাই যে, যাঁহার আদেশ ও অনুপ্রেরণায় আমার এই প্রয়াস, তাঁহাকে প্রীত দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করাই ছিল আমার এই প্রচেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য। আমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে ছাপিবার কোন প্রেরণাই এতদিন অনুভব করি নাই।

অবশেষে অনেকের অনুরোধে ইহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ জানাইয়াছেন যে, এই জাতীয় পুস্তক বাংলাভাষায় নাই, সুতরাং ইহা জাতীয় সাহিত্যের একটা নূতন দিক্ উদ্‌ঘাটিত করিবে।

যদি কেহ এই "জাতিস্মর-কথা" পাঠ করিয়া এই পথে অগ্রসর হইবার প্রয়াস পান—তবে তাহাই হইবে এই পুস্তক-প্রকাশের সার্থকতা।

সুখের বিষয় সম্প্রতি রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগরে শেঠ শোহনলাল ইনষ্টিটিউট-অফ-প্যারাসাইকোলজি নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। উহার ডিরেক্টর প্রঃ এইচ, এল, ব্যানার্জিমহোদয়ের তত্ত্বাবধানে জাতিস্মর-বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণা সুরু হইয়াছে। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত কয়েকটি জাতিস্মর শিশুর কথা টেপ রেকর্ড করিয়াছেন —তাঁহাদের শুভপ্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক। অলমিতিবিস্তরেণ।

শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু

সৎসঙ্গ, দেওঘর
গুরুপূর্ণিমা, ৩রা শ্রাবণ, ১৩৬৬

জাতিস্মর-কথা

সে আজ অনেক দিনের কথা, এখন হইতে প্রায় ১৯ বৎসর আগে ১৯৩৯ সালে পাবনা সৎসঙ্গ-আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত মৃত্যু, পরলোক—অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়, পুনরায় ধরাধামে ফিরিয়া আসে কিনা; জন্মান্তর কি সত্য? যদি সত্য হয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণই বা কি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হইত। কথাপ্রসঙ্গে একদিন তিনি বলিলেন যে, মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে যাহাদের পূর্ব্ব জীবনের ঘটনাবলী স্মরণে আছে এইরূপ জাতিস্মর শিশুর কথা প্রকাশিত হয়। তাহাদের প্রদত্ত বিবরণ যথার্থ কিনা তাহা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখা প্রয়োজন। যদি তাহাদের প্রদত্ত বিবরণ সত্য হয় তাহা হইলে উহাই হইবে জন্মান্তরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সেই দিনটি ছিল ইংরাজী জুন মাসের সাত তারিখ। সেইদিনই তিনি আমার উপরে এ সম্বন্ধে তথ্যাদি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার ভার অর্পণ করেন এবং নিম্নলিখিত বাণীটি স্বহস্তে একটি খাতায় লিখিয়া উহা আমাকে দেন।

'অনবচ্ছিন্ন স্মৃতিবাহীচেতনা যা অমরণকে প্রতিষ্ঠা ক'রে মানুষকে বাস্তবভাবে অমর ক'রে তুলতে পারে—তারই অনুসন্ধিৎসুই হচ্ছি এই আমরা, এই আর্য্যজাতি—এর ভিতর দিয়েই আমরা অনন্তকে স্পর্শ ক'রে উপভোগ করতে চাই।"

মনে হইতেছে, পরলোকগত ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়-মহাশয়ের একটি প্রবন্ধে পড়িয়াছিলাম, "এই একমাত্র দেশ যেখানে মানুষ কপর্দ্দকমাত্র না লইয়াও সারা ভারত পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে।" জাতিস্মর-সন্ধান উপলক্ষে আমার ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁহার উক্তিকেই সমর্থন করে।

তাঁর আদেশ সানন্দচিত্তে শিরোধার্য্য করিয়া ১৯৩৯ সালের ১১ই জুন তারিখে পাবনা আশ্রম হইতে রওনা হই। রওনা হইবার পূর্ব্বে লোকমুখে জানিতে পারি যে, দিল্লীতে এরূপ একটি জাতিস্মর বালিকা আছে, তাই দিল্লী-অভিমুখে রওনা হই এবং ১৬ই জুন তারিখে দিল্লীতে টিমারপুর অঞ্চলে আমার এক পরিচিত বন্ধুর বাটীতে অতিথি হই।

কিন্তু বালিকাটির নাম কি, কোথায় তাহার বাসস্থান ইত্যাদি কিছুই জানা ছিল না। পর দিন হইতেই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে সীতারাম বাজারের প্রসিদ্ধ কবিরাজ পণ্ডিত ঘনানন্দ পন্থজীর সঙ্গে পরিচিত হই। তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারি যে, তিনি পতিরাম গলির ব্যারিষ্টার বাবু শ্রীরামের নিকট হইতে এরূপ একটি জাতিস্মর বালিকার কথা শুনিয়াছেন এবং ব্যারিষ্টার-মহোদয় স্বয়ং এই বালিকাটি সম্বন্ধে বিশেষভাবে সন্ধান লইয়াছেন। পন্থজীর নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া বাবু শ্রীরামের নিকট যাইয়া উপস্থিত হই। তাঁহার নিকট হইতে মেয়েটির সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জানিয়া লইয়া মেয়েটির জন্মস্থান উত্তর প্রদেশের হরদৈ জেলার ভাপুর সাপাহা গ্রামে যাইবার জন্য প্রস্তুত হই।

পরদিন হরদৈ রওনা হইবার পূর্ব্বে প্রাতে কবিরাজ ঘনানন্দ পন্থজীর সহিত দেখা করিতে যাইয়া শুনিলাম যে, সেই বালিকাটি তাহার পিতা সহ দিল্লীতে আসিয়া পতিরাম গলিতেই বেরীওয়ালী ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিতেছে, শীঘ্রই দিল্লী হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবে।

তাঁহার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বেরীওয়ালী ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। ধর্ম্মশালার দ্বিতলের একটি কক্ষে মেয়েটির সহিত দেখা হইল। মেয়েটি দেখিতে বেশ সুশ্রী ও খুব বুদ্ধিমতী বলিয়াই মনে হইল। বয়স অনুমান ৮।৯ বৎসর হইবে। মেয়েটির পিতা শ্যামল সিংহজীর সহিতও পরিচয় হইল; আমি কোথা হইতে আসিয়াছি এবং কি উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি তাহা তাঁহাকে সবিস্তারে বলিলাম। তখন সিংহজী মেয়েটিকে ডাকিয়া কাছে

বসাইলেন এবং আমার আগমনের উদ্দেশ্য তাহাকে বলিয়া বলিলেন যে, "বাবুজী তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিতে চান. তুমি তাহার যথাযথ উত্তর দিও।"

তারপর মেয়েটির সহিত নিম্নলিখিত বাক্যালাপ হইল—

প্রঃ। তোমার নাম কি ?

উঃ। শ্রীমতী রামদেবী।

প্রঃ। তোমার নাকি পূর্ব্বজীবনের কথা স্মরণে আছে ?

উঃ। হ্যাঁ, কিছু কিছু আছে।

প্রঃ। কি কি স্মরণে আছে ?

উঃ। পূর্ব্বজীবনে আমার নাম ছিল রূপকুমারী। আমার পিতার নাম ছিল বাবু বেণীমাধব গোপীনাথ মিশ্র। লক্ষ্মীপুর জেলার সৈদাপুর সরাই গ্রামে আমাদের বাসস্থান ছিল। আমি গত জীবনে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হই।

প্রঃ। পূর্ব্বজীবনে তুমি কি কি ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়াছিলে তাহা তোমার মনে আছে কি ?

উঃ। বেদ, উপনিষদাবলী, গীতা, রামায়ণ, মনুসংহিতা বিশেষভাবে পড়িয়াছিলাম।

প্রঃ। যাহা কিছু তুমি পড়িয়াছিলে তাহা সবই তোমার মনে আছে কি ?

উঃ। যাহা কিছু বিশেষভাবে পড়িয়াছিলাম সবই মনে আছে। আর অন্যান্য অংশ বা বিষয় সব মনে না থাকিলেও একটু স্মরণ করাইয়া দিলেই সব মনে পড়ে।

প্রঃ। পূর্ব্বজীবনে কে তোমকে এই সব ধর্ম্মগ্রন্থ পড়াইয়াছিলেন ?

উঃ। আমার পিতামহ বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, তিনিই আমাকে পড়াইয়াছিলেন।

প্রঃ। আচ্ছা, তুমি তো পূর্ব্বজীবনে ধর্ম্মগ্রন্থাদি খুব অধ্যয়ন করিতে—পূজা-অর্চ্চনা বা সাধনা কিছু করিতে কি ?

উঃ। তুলসীজীর পূজা করিতাম।

তারপর মেয়েটির সঙ্গে—শুধু অধ্যয়নে কিছু হয় না, জীবনে সাধনার প্রয়োজন আছে, সদ্‌গুরুর দরকার, এইসব বিষয়ে আলোচনা হইল। মেয়েটিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম—

প্রঃ। পূর্ব্বজীবনে তুমি তো ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে, এ-জীবনে ছত্রীবংশে জন্ম হইল কেন ?

উঃ। বোধ হয় কোন দোষ করিয়া থাকিব। আমার তো স্মরণ হয় না যে আমি কোন দোষ করিয়াছিলাম।

প্রঃ। জাতিস্মরত্ব বা পূর্ব্বজীবনের কথা সাধারণতঃ কাহারও মনে থাকে না, তোমার পূর্ব্বজীবনের কথা মনে রহিল কিরূপে বলিতে পার কি ?

উঃ। কেন আমার মনে রহিল তাহা বলিতে পারি না।

তারপর মেয়েটির পিতা শ্রীযুক্ত শ্যামল সিংহজীর সঙ্গে মেয়েটির সম্বন্ধে আলাপ হইল। তিনি বলিলেন, মেয়েটির বয়স যখন ছয় মাস মাত্র, তখন কাঁদিলে রামায়ণের শ্লোক আবৃত্তি করিলেই চুপ হইয়া যাইত ইহা লক্ষ্য করি। আড়াই বৎসর বয়সে যখন সে কথা বলিতে আরম্ভ করিল তখন সে ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে লাগিল, অমুক গ্রামে আমার বাড়ী, আমার পিতার নাম অমুক ইত্যাদি। আমরা তাহাকে এই সব কথা বলিতে নিষেধ করিতাম এবং বলিতাম যে, ওরূপ বলা খুব দোষের এবং মাঝে মাঝে খুব শাসাইতামও, কিন্তু সে তাহার খেয়ালখুশিমত মাঝে মাঝে পূর্ব্ব-জীবনের কথা বলিয়া যাইত। পিতাকে পুনরায় প্রশ্ন করিলাম—

প্রঃ। বালিকা রামদেবী তাহার পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা আপনি স্বয়ং বা অপর কেহ উহার সত্যতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াছেন কি ?

উঃ। লক্ষ্মীপুর খেরীর ওয়েলরাজ রাজাসাহেব ভুবনলাল (ইনি Govt. of Indiaর Council of State-এর মেম্বার) এবং উক্ত শহরের বিখ্যাত শেঠ বাবু রামস্বরূপ লক্ষ্মীপুর শহরে একটি কীর্ত্তনসভার আয়োজন করেন এবং রামদেবীকে কীর্ত্তন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। সভায়

বহুলোক—স্ত্রী ও পুরুষ সমবেত হইয়াছিল। উক্ত সভায় গোপনে রাম-দেবীর পূর্ব্বজীবনের পিতা, মাতা, কাকা, ভ্রাতা প্রভৃতিকে খবর দিয়া রাজাসাহেব আনান। কীর্ত্তন শেষ হইলে রামদেবীকে বলা হয়, সমবেত স্ত্রীলোকদের মধ্য হইতে তোমার পূর্ব্বজীবনের মাতা আছেন কিনা বাছিয়া চিনিয়া লও। রামদেবী সমবেত মহিলাদের মধ্য হইতে তাহার পূর্ব্ব-জীবনের জননীকে চিনিয়া লইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে যাইয়া উপবেশন করিল—সমবেত জনতা আনন্দে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। তারপর ঐ সভাতেই ঐ প্রকারে তাহার পূর্ব্বজীবনের পিতা, কাকা ও ভ্রাতৃদ্বয়কে চিনিয়া বাহির করে।

বাবু শ্যামল সিংহজী বলিলেন, মেয়েটির শিক্ষার জন্য আমি এ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থাই করিতে পারি নাই। আজ কয়েকদিন মাত্র হইল একজন পণ্ডিতজীকে ইহাকে পড়াইবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছি। বর্ণ পরিচয় (হিন্দী) হইবার পূর্ব্বেই হিন্দী ও সংস্কৃতে শুদ্ধ উচ্চারণ সহ রামায়ণ প্রভৃতি পড়িতে পারিত। তারপর সিংহজী রামদেবীর ফটো এবং লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত দৈনিক "ন্যাশন্যাল হেরাল্ড" ও দিল্লী হইতে প্রকাশিত দৈনিক "ন্যাশন্যাল কল" পত্রিকায় বালিকাটির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখাইলেন।

চলিয়া আসিবার পূর্ব্বে মেয়েটিকে পুনরায় বলিলাম, তোমাকে আরও ২।১টি প্রশ্ন করিব কি? মেয়েটি বলিল—অনায়াসে করিতে পারেন। তখন আমি বলিলাম—পূর্ব্বজীবনে তুমি তো উপনিষদসমূহ ভাল করিয়াই পড়িয়াছিলে; জন্মান্তর-বিদ্যা সম্বন্ধে কোন্ কোন্ প্রাচীন উপনিষদে উল্লেখ আছে স্মরণ করিয়া বলিতে পার কি?

উঃ। (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) হ্যাঁ, বলিতে পারি। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইহার উল্লেখ আছে। জন্মান্তর-বিদ্যাকে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা বলা হইত। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষত্রিয়রাজা প্রবাহণ জৈবলির নিকট ব্রাহ্মণ শ্বেতকেতু এবং তাঁহার পিতা আরুণি এই

বিদ্যালাভের জন্য গমন করিলে রাজা আরুণিকে বলিয়াছিলেন—"হে গৌতম, আপনি যে বিদ্যা আমার নিকট প্রার্থনা করিলেন, এ বিদ্যা আপনার পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণ লাভ করে নাই।" পরে তিনি তাহাকে এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যকের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে রাজর্ষি বলিতেছেন, "ইয়ং বিদ্যেতঃ পূর্ব্বং ন কস্মিংশ্চন ব্রাহ্মণ উবাস তাং ত্বহং তুভ্যং বক্ষ্যামি।" আমি বলিলাম, তোমার উত্তর শুনিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। তুমি ঠিকই বলিয়াছ, উহা বৃহদারণ্যকের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আছে। পুনরায় প্রশ্ন করিলাম—

প্রঃ। তোমার মৃত্যুমুহূর্ত্তের কোন ঘটনাই কি তোমার মনে নাই ?

উঃ। (একটু চিন্তা করিয়া) আমি যে-সব গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতাম তাহার মধ্য হইতে কতকগুলি গ্রন্থ আমার শয্যাপার্শ্বে রাখা হইয়াছিল।

প্রঃ। আচ্ছা, মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তোমার কি হইল তাহা কি তোমার কিছুই মনে নাই ?

উঃ। এইমাত্র মনে আছে যে, আমি ধোঁয়ার মত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছিলাম এবং ছয় মাস আন্দাজ খুব ঘুরিয়াছিলাম।

আজ এই পর্য্যন্ত থাক—এই বলিয়া সেদিনকার মত বিদায় লইলাম। মেয়ের পিতাকে বলিলাম—একদিন আসিয়া রামদেবীকে সঙ্গে লইয়া ফটোগ্রাফারের দোকানে যাইয়া ফটো তুলিতে ইচ্ছা করি। তিনি বলিলেন, আপনার যখন ইচ্ছা হয় আসিবেন।

সেইদিনই বাসায় আসিয়া লক্ষ্মীপুর খেরীতে ওয়েলরাজ রাজা ভুবনলাল ও শেঠ রামস্বরূপের নিকট বালিকা রামদেবীর সম্বন্ধে জানিবার জন্য পত্র দিলাম।

তার পরদিন পুনরায় পতিরাম গলিতে বেরীওয়ালী ধর্ম্মশালায় বাবু শ্যামল সিংহজীর সন্ধানে গেলাম। শুনিলাম তিনি বাহিরে গিয়াছেন, কখন আসিবেন ঠিক নাই, তাই সেখান হইতে পণ্ডিত ঘনানন্দ পন্থের ওখানে গেলাম। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নয়াদিল্লীতে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সহকারী

সম্পাদক বাবু নন্দলাল মুখার্জির বাড়ীতে গেলাম। তাঁহার সহিত বেশ আলাপ জমিয়া উঠিল; তিনি আমাকে তাঁহার বাড়ীতে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন। তিনি একলাই বাড়ীতে থাকেন। তাঁহার মেয়েটি দিল্লী ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল; মা মেয়ের কাছেই থাকেন, মধ্যে মধ্যে আসেন। দুইটি ছেলে—একটি সরকারী চাকুরী করে, অপরটি এলাহাবাদে পড়িতেছে।

নন্দবাবুকে বলিলাম, এবারে যেখানে আসিয়া উঠিয়াছি সেখানে আমার কোন অসুবিধা নাই। ভবিষ্যতে আবার দিল্লীতে আসিলে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব—এই বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতে স্নানাদি সমাপনান্তে পুনরায় পতিরাম গলিতে রাম-দেবীর ওখানে গেলাম; গিয়া শুনিলাম যে তাহারা নিকটেই এক স্থানে কীর্ত্তন করিতে গিয়াছে। তাহাদেরই একজন সঙ্গীকে সঙ্গে লইয়া হাউস কাজীর নিকটে রামদ্বারায় রামদেবীর কীর্ত্তন শুনিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম, সমগ্র প্রাঙ্গণটি সমবেত স্ত্রীপুরুষে ভর্ত্তি। রামদেবী একটি টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া হিন্দীতে কীর্ত্তন করিতেছে—অনেকটা আমাদের দেশের পদকীর্ত্তনের মত—আর মধ্যে মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া কীর্ত্তনের ব্যাখ্যা করিতেছে। খোল-করতাল বা অন্য কোন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবস্থা নাই। যদিও কীর্ত্তন হিন্দীতে হইতেছিল তথাপি বুঝিতে কোনই অসুবিধা হইল না। কীর্ত্তন বেশ ভালই লাগিল এবং জমিয়াছিলও বেশ। ছোট একটি মেয়ের পক্ষে এইরূপ জ্ঞানগর্ভ কীর্ত্তন খুবই প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই।

কীর্ত্তন শেষ হইলে স্বামীজীমহারাজ—যিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন—বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলিলেন—

এখানে আমরা বহু ভাল ভাল বক্তার, খুব বড় বড় পণ্ডিতের বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু আজ রামদেবীর বক্তৃতা ও কীর্ত্তন শুনিয়া আমরা যতদূর

মুগ্ধ হইয়াছি পূর্ব্বে এরূপ হই নাই। তিনি নানাশাস্ত্রের নির্গলিতার্থ কীর্ত্তনে এমন সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং গভীর ভাবসহকারে উহা কীর্ত্তন করিয়াছেন যে আমি বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেকেই ইহাতে মুগ্ধ হইয়া থাকিবেন।

কীর্ত্তন শেষ হইলে সভাপতি স্বামীজীমহারাজ কাপড়, ফল, নানা-প্রকার মিষ্টদ্রব্যাদি রামদেবীকে দিলেন এবং সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে অনেকে অর্থাদি প্রদান করিতে লাগিল এবং কন্যাটিকে ও কন্যার পিতাকে সাধুবাদ করিতে লাগিল। মেয়েটি আমাকে দেখিতে পাইয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল, "বাবুজী আইয়ে, মেরী সাথ চলিয়ে।"

আমি তাহাদের সঙ্গে পুনরায় পতিরাম গলিতে আসিলাম। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর মেয়েটিকে সঙ্গে লইয়া টাঙ্গা করিয়া কাশ্মীরী গেটে ফটো সার্ভিসের দোকানে গেলাম। রামদেবীর ফটো তোলা হইল—দোকানদার বলিল, আগামীকাল বৈকালে ৪টায় আসিয়া ফটো লইয়া যাইবেন। পর-দিন বৈকালে দোকান হইতে ফটো লইয়া একখানা ফটো রামদেবীকে দিয়া আসিলাম এবং কন্যা ও কন্যার পিতার নিকট হইতে সেবারের মত বিদায় লইয়া আসিলাম। তাহারাও সেইদিন রাত্রেই দিল্লী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

রামদেবীর পিতা রামদেবী সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহার যথার্থতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া যে-পত্র ওয়েলরাজ রাজা ভুবনলাল এবং শেঠ রামস্বরূপকে লিখিয়াছিলাম, তাহার উত্তরে রাজা ভুবনলালের পুত্র যুবরাজ দত্ত সিং এবং শেঠ রামস্বরূপের পত্র কিছুদিন পরে পাইয়াছিলাম। পত্রে তাঁহারা রামদেবীর পিতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য বলিয়া জানান। নিম্নে পত্র দুখানির অবিকল নকল দেওয়া হইল। ইহার কিছুদিন পরে লক্ষ্মীপুর খেরীতে যাইয়া স্থানীয় লোকদের নিকট হইতেও বালিকার বিবৃতির সত্যতা সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি।

From

Oel & Kaimarah Raj
Oel, Dist. Kheri, Oudh.

Qadim Kothi
P. O. Oel
Dt. Kheri, R. K. R. (Oudh)
Dated 29-7-39

Dear Sir,

Many thanks for your letter of the 27th instant. I know the family members of Ram Devi, daughter of Babu Shyamal Singhji of Hardoi. Saidapur is a village in the Estate. The account given by the girl is absolutely correct. In her past life she was a resident of Saidapur village, belonging to the family of Pandit Benimadhab Gopinath Misra. I can assure you that the facts are quite correct.

I have personally met the girl and ascertained the facts and am fully satisfied. She has great knowledge specially of the Ramayan and the Gita and knows them by heart. She is devoted to God and in my opinion she is a wonderful girl that I have come across.

With best wishes
Yours sincerely,
Yuvaraj Dutta Singh.

Lakshmipur Kheri
29-7-39

Dear Sir,

Received your postcard. Ram Devi, daughter of Sj. Shyamal Shinghji visited my place three months ago. Her previous father and mother were called from the village. She recognised them at my place and narrated the stories of her previous life which were accepted by the parents. I do appreciate the intelligence of the girl.

Yours sincerely,
Ram Sorup Sett.

সেবার দিল্লীতে অবস্থানকালে সম্প্রতি বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত স্থানীয় এক ভদ্রলোকের নিকট হইতে জানিতে পারি যে, বৃন্দাবনে এরূপ একটি জাতিস্মরের কথা তিনি শুনিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে আর কোন তথ্যই তিনি দিতে পারিলেন না। তাঁহার এই কথার উপর নির্ভর করিয়াই পরের দিনই বৃন্দাবন রওনা হইলাম।

বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া এক ধর্ম্মশালায় উঠিয়া স্নানাদি সমাপনান্তে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া প্রখ্যাত উড়িয়া বাবার আশ্রমে গেলাম তাঁহাকে দর্শন করিতে। সেখানে যাইয়া দেখিলাম যে, তাঁহাকে দেখিবার ও তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য বহু নরনারী সেখানে সমবেত হইয়াছেন। কুশল প্রশ্নাদির পর উড়িয়া বাবার সঙ্গে আমার বহু বিষয়ে আলোচনা হইল এবং উপস্থিত সকলেই এই আলোচনাতে বিশেষ প্রীত হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্য হইতে একজন সুঠাম দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিয়া আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, এখানে কোথায় আছি ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন; আমার উত্তর শুনিয়া বলিলেন—আপনি যদি

এখন আপনার আবাসস্থানে ফিরিয়া যাইতে চাহেন তবে আমার মোটরে যাইতে পারেন, আমি আপনাকে ধর্ম্মশালায় নামাইয়া দিয়া আমার বাড়ীতে যাইব। আমি রাজি হওয়াতে তিনি আমাকে তাঁহার মোটরে উঠাইয়া লইলেন।

মোটরে উঠিয়া তাঁহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলাম যে, তিনি জয়পুর মহারাজের নিকট-আত্মীয় ও সেখানকার একজন বড় জায়গীরদার। বৃন্দাবনের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গোপীনাথজীর মন্দির তাঁহারই। কিছুদিন হইল তিনি জয়পুর হইতে আসিয়াছেন এবং গোপীনাথজীর মন্দির-সংলগ্ন দ্বিতলবাটীতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার নাম শ্রীহরি সিং।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে হইতে মোটর ধর্ম্মশালায় আসিয়া পৌঁছিল। ধর্ম্মশালায় আমাকে নামাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আগামীকাল সকালে আপনি কোথায়ও যাইবেন কি? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, দাউজীর বাগিচায় বাবা রামকৃষ্ণ দাসের আশ্রমে যাইব—ইনিও সিদ্ধপুরুষ বলিয়া খ্যাত। তিনি বলিলেন, বেশ ভালই, আমিও যাইব; প্রাতঃকালীন পূজাদি সমাপনান্তে আমি মোটর লইয়া আসিব এবং দুজনে একসঙ্গেই যাইব।

পরদিন যথাসময়ে শ্রীহরি সিংজী আসিয়া আমাকে মোটরে উঠাইয়া লইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে দাউজীর বাগিচায় যাইয়া শুনিলাম যে, বাবাজীর সহিত এখন সাক্ষাৎ হইবে না, তিনি ধ্যানে আছেন। সেখানে বগুড়া জেলা-নিবাসী তাঁহার এক শিষ্যের সঙ্গে অনেক আলাপ হইল। সেখান হইতে উড়িয়া বাবার আশ্রম হইয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম। ধর্ম্মশালায় পৌঁছিয়া মোটরে বসিয়াই ঠাকুর হরি সিং-সাহেবের সঙ্গে বহুক্ষণ আলাপ চলিতে লাগিল; তিনি আমাকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি, কি করিয়া ভ্রমণের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, আমার জীবন-যাত্রার প্রণালী ও আমার জীবন্ত আদর্শ শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করিলেন; আমিও তাহার যথাযথ উত্তর দিলাম।

আমার সব কথা শুনিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কাহারও

বাড়ীতে থাকিতে আপনার আপত্তি আছে কি? আমি বলিলাম, আমি স্বপাকী অর্থাৎ নিজে রান্না করিয়া খাই, অন্য কাহারও হাতে খাই না, কাজেই অন্যের বাড়ীতে যাইয়া থাকা গৃহস্বামীর অসুবিধার কারণ হইতে পারে। উত্তরে তিনি বলিলেন, যদি কেহ আপনাকে একটি কি দুইটি ঘর আলাহিদা করিয়া দেয়, যাহাতে আপনি নিজের মত থাকিতে পারেন, তাহাতে আপনার আপত্তি আছে কি? বলিলাম—না, তাহাতে আমার আর আপত্তি থাকিবে কেন?

তখন তিনি আমাকে তাঁহার বাড়ীতে যাইবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। বলিলাম, অত ব্যস্ত হইতেছেন কেন? যখন কথা দিয়াছি তখন যাইবই, তবে ২।৪ দিন পরে গেলে ক্ষতি কি? তিনি আর কোন কথা না বলিয়া আমাকে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

সেদিন প্রকৃতপক্ষে আমার আর্থিক সম্বল প্রায় কিছুই ছিল না অথচ ঠাকুর-সাহেবের সাদর আহ্বান সেদিনকার মত প্রত্যাখ্যান করিলাম—এই ভাবিয়া যে, ধনী ও প্রতিপত্তিশালী লোক অর্থার্থীদিগকে সাধারণতঃ কৃপার চক্ষেই দেখিয়া থাকে, শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না। গৈরিক-বসন-পরিহিত সন্ন্যাসীর প্রতি অনেকের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে। আমি নিজে সন্ন্যাসীর বেশধারী নহি, সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বেশে সজ্জিত; প্রস্তাব করিবা-মাত্রই তাঁহার বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলে তিনি আমার প্রতি ততটা শ্রদ্ধার ভাব পোষণ নাও করিতে পারেন। তাই আমাকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার আগ্রহ ও আমার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার ভাব কতটুকু তাহা বুঝিয়া লইবার জন্যই সেদিন তাঁহার সহিত গেলাম না। যদিও আমার অবস্থা কতটা সঙ্গীন তাহা ভুক্তভোগীমাত্রই বুঝিতে পারিবেন।

পরদিন প্রাতে বেলা ৮টার সময় ঠাকুর-সাহেব মোটর লইয়া ধর্ম্মশালায় আসিয়া হাজির। আমাকে বলিলেন—আপনার কোন কথা আর শুনিব না—এই বলিয়া ড্রাইভারকে আমার বিছানা, সুটকেস্, কুকার প্রভৃতি মোটরে উঠাইয়া লইতে বলিলেন।

শ্রীগোপীনাথজীর মন্দির-সংলগ্ন তাঁহার সুবৃহৎ বাটীর দ্বিতলের দুইখানি ঘর আমার জন্য ছাড়িয়া দিলেন এবং একজন বালক-ভৃত্যকে আমার পরিচর্য্যার জন্য দিয়া বলিলেন, আপনার যখন যাহা প্রয়োজন হইবে ভৃত্যকে বলিলেই সে আনিয়া দিবে এবং কেন জানি না, নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই দশটি টাকা আমাকে দিয়া বলিলেন—আপনার প্রাত্যহিক খরচের প্রয়োজন হইতে পারে মনে করিয়াই দিতেছি।

বৃন্দাবনে ঠাকুর-সাহেবের গৃহে অবস্থানকালে প্রত্যহ বৈকালে তাঁহার সহিত ভ্রমণে বাহির হইতাম—কোন দিন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ-প্রতিষ্ঠিত প্রেম-মহাবিদ্যালয়, কোন দিন গুরুকুল-বিদ্যালয়, কোন দিন কেশবানন্দের আশ্রম, শেঠজীর মন্দির, লছমীনারায়ণ-মন্দির প্রভৃতি দেখিয়া বেড়াইতাম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত আলাপ-পরিচয়ও হইত, কিন্তু যাহার জন্য এখানে আসিলাম সেই জাতিস্মরের কোন সন্ধান মিলিল না।

রাত্রে ঠাকুর-সাহেবের সঙ্গে বহু বিষয়ে আলোচনা হইত। এইরূপ আলোচনা-প্রসঙ্গে একদিন পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের কথা উঠিতেই তিনি বলিলেন—স্বামীজী ভারত পরিভ্রমণকালে জয়পুরে আমার বাটীতে অনেকদিন ছিলেন; পরে পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও তাঁহার পাশ্চাত্য-দেশীয় শিষ্য ও শিষ্যাসহ জয়পুর ভ্রমণে আসিয়া আমারই বাটীতে ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ ও অখণ্ডানন্দও আসিয়াছিলেন। স্বামীজী জয়পুরে অবস্থানকালে প্রায় প্রত্যহ ঘোড়ায় চড়িয়া আমার সঙ্গে পাল্লা দিতেন। প্রত্যেক দিন প্রভাতে উঠিয়া তিনি ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে ধ্রুপদ সঙ্গীত গান করিতেন; নানা বিষয় লইয়া আলোচনাকালে তাঁহার সহিত আমার কোন কোন দিন ভীষণ তর্কযুদ্ধ চলিত। বলিলেন, বিবেকানন্দের মত লোক আর হয় না—তিনি যেন মানুষকে গলাইয়া দিতে পারিতেন। একটা সাধারণ কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইলে যেন একটা শক্তি লইয়া বাহির হইত—এইরূপ স্বামীজী সম্বন্ধে বহু কথাই হইল। সেই সঙ্গে বলিলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের সংবাদ তিনি লণ্ডনে

'ইণ্ডিয়া হাউসে' বসিয়া জানিতে পারেন। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট কেবল্ (cable) করিয়া বিবেকানন্দের মৃত্যু-সংবাদ 'ইণ্ডিয়া হাউসে' জানান, সেই সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

একদিন ঠাকুর-সাহেবের পাণ্ডা, নাম বোধ হয় দীনবন্ধু ব্রজবাসী হইবে, ঠাকুর-সাহেবকে আসিয়া খবর দিল যে, একটি আট বৎসরের বালিকা বৃন্দাবনে আসিয়াছে—তাহার বক্তৃতা দিবার শক্তি অসাধারণ ও সে জাতিস্মর। বালিকাটি তাহার পিতামাতাসহ পাথরপুরা ধর্ম্মশালাতে আছে। সংবাদ শুনিয়াই আমি ঠাকুর-সাহেবকে বলিলাম যে, বালিকাটিকে আমি জানি, তাহার নাম রামদেবী।

ঠাকুর-সাহেব বালিকাটি সম্বন্ধে তথ্য জানিবার জন্য ও তাহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমাকে বলিলেন, আপনি বালিকার পিতার সঙ্গে দেখা করিয়া আজই বৈকালে শ্রীগোপীনাথজীর মন্দিরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া ফেলুন। বক্তৃতার ব্যবস্থা ঠিক করিয়া আসিয়া আমাকে জানাইলে আমি ঢোল-সহরত যোগে উহা ঘোষণা করিবার ব্যবস্থা করিব।

তদনুসারে পাথরপুরা ধর্ম্মশালায় গেলে বালিকা রামদেবীর সহিত দেখা হইল। সে আমাকে দেখিয়াই নমস্কার জানাইয়া "আইয়ে বাবুজী" বলিয়া সম্বোধন করিয়া আমার হাত ধরিয়া তাহাদের নির্দ্দিষ্ট গৃহে লইয়া গেল। সেখানে তাহার পিতা শ্যামল সিংহজীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্যামল সিংহজীকে ঠাকুর-সাহেবের ইচ্ছা জ্ঞাপন করাতে তিনি নিজেই আসিয়া ঠাকুর-সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া বৈকাল ৬টায় বক্তৃতা হইবে বলিয়া স্থির করিয়া গেলেন। বক্তৃতার বিষয় কি থাকিবে শ্যামল সিংহজী জিজ্ঞাসা করাতে ঠাকুর-সাহেব বলিলেন—উহা বক্তৃতা দিবার সময় স্থির হইবে। শ্যামলজী চলিয়া গেলে ঠাকুর-সাহেব আমাকে বলিলেন—বক্তৃতার বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিলাম না এই ভাবিয়া যে, তাহা হইলে হয়তো বালিকাটি প্রস্তুত হইয়া আসিত পারে।

বৈকালে মন্দির-প্রাঙ্গণে সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সভাস্থল আগ্রহাকুল নরনারীতে পূর্ণ হইয়া গেল। ঠিক ৬টায় সভা আরম্ভ হইল। বালিকা রামদেবীকে সভার একপার্শ্বে একটি টেবিলের উপর দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল। বালিকার পিতা শ্যামল সিংহজী কোন্ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হইবে জানিতে চাহিলেন, তখন ঠাকুর-সাহেব উহা আমাকে জানাইয়া দিতে বলিলেন। আমি তখন শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম যে, বালিকা রামদেবী আজ আপনাদের নিকট "ভারতীয় আর্য্যকৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও নারীধর্ম্ম" সম্বন্ধে কিছু বলিবেন, এখানে বহু মায়েরা উপস্থিত আছেন, তাহাদের জন্য নারীধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলা সময়োপযোগী হইবে।

আমার কথা শেষ হইবামাত্র শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বেদের একটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া রামদেবী সরল হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিল। বৈদিক ধর্ম্মের মূল হইতেছে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ঋষির আবির্ভাব, তাঁহাদের বাণীসমূহের সমন্বয়—বৈদিক ধর্ম্ম প্রথমে যজ্ঞময়, তৎপর জ্ঞানময়, দ্রব্যময় যজ্ঞাপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ঞের উৎকর্ষতা, তৎপর জ্ঞান ও কর্ম্ম সমুচ্চয় মার্গ, সর্ব্বশেষে জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির সমন্বয়—বৈদিক যুগ, ঔপনিষদিক যুগ, রামায়ণ-মহাভারতের যুগ এবং স্মৃতির যুগ সম্বন্ধে বলিয়া বর্ণাশ্রমই যে ভারতীয় আর্য্যকৃষ্টির বৈশিষ্ট্য—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে বলিয়া তাহার ভাষণ শেষ করিল। বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করিবার জন্য বেদ, উপনিষদ্, ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে অসংখ্য শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিল। ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য শেষ করিয়া পরে বৈদিক যুগে নারীধর্ম্ম কিরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া স্মৃতির যুগে নারীর স্থান সম্বন্ধে বলিয়া নারীধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিল। বলা বাহুল্য, নারীধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাকালেও বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে অজস্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার বক্তব্য সে বলিয়া গেল। তাহার বক্তৃতা শেষ হইতে দেড়ঘণ্টা লাগিল।

বক্তৃতাকালে সেই অসংখ্য শ্রোতৃমণ্ডলী চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্তব্ধ ছিল—সকলেই অবাক্ বিস্ময়ে বালিকার দিকে চাহিয়াছিল। বালিকার বলিবার ভঙ্গীও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র অসংখ্য করতালিধ্বনি হইতে লাগিল। ধ্বনি মন্দীভূত হইয়া আসিলে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য হইতে একজন উঠিয়া বলিলেন—অষ্টম বর্ষের একটি বালিকা বক্তৃতা দিবে শুনিয়া প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, বোধ হয় কোন বিষয় মুখস্থ করিয়া বক্তৃতা দেওয়ানো হইবে, সেইজন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াই বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু বালিকার বক্তৃতা শুনিয়া আমার সে ভ্রম দূর হইয়াছে; বালিকার বাগ্মিতা, ততোধিক অদ্ভুত তাহার অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—তাহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি—একথা বলিয়া আমার মনের ভাব কিন্তু ঠিক ঠিক আমি প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। নিজের বক্তব্য বিষয় প্রতিপাদনার্থ বক্তা যেরূপ বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সর্ব্ব শাস্ত্রের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়া একটি সিদ্ধান্তে আসিলেন তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। মুখস্থ বিদ্যার দ্বারা এরূপ বক্তৃতা কখনও সম্ভব নহে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, আমি শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়াছি, বালিকা যাহা বলিয়াছে তাহা আমার মোটের উপর জানা আছে, কিন্তু আমাকে হঠাৎ যদি এই বিষয়ে বলিতে অনুরোধ করা হইত তাহা হইলে আমি সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিয়া এমন একটা ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত সুষ্ঠু সিদ্ধান্তে আসিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। বালিকার বক্তৃতাদানকালে আমি কেবল ইহাই চিন্তা করিতেছিলাম যে, এরূপ অল্পবয়স্কা বালিকার পক্ষে সমস্ত শাস্ত্র পাঠ করা, বা শুধু পাঠ করা নয়, তাহার মর্ম্মার্থ অনুধাবন করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কিরূপে সম্ভব? প্রাচীন যুগে গার্গী, মৈত্রেয়ীর কথা আমরা শুনিয়াছি, এ যুগেও কি তাহার পুনরাবর্ত্তন সম্ভব? ইহা আমার কল্পনাকেও পরাভূত করিয়াছে।

বালিকাটি কোথা হইতে আসিয়াছে, কিরূপে ইনি এই অসামান্য

প্রতিভার অধিকারিণী হইলেন ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য আমার ও শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ কৌতূহল জন্মিয়াছে। মন্দিরের কর্তৃপক্ষকে, যাঁহারা অদ্য এই সভার আয়োজন করিয়াছেন, শ্রোতাদের পক্ষ হইতে আমি অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা বালিকাটির সম্যক্ পরিচয় দিয়া আমাদের ঔৎসুক্য দূর করুন। তখন গোপীনাথজীর মন্দিরের মালিক ঠাকুর-সাহেব আমাকে বালিকাটির পরিচয় জানাইয়া দিতে বলিলেন। আমি তখন বলিতে উঠিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম যে, আমার হিন্দী ভাষায় তেমন অধিকার নাই বা হিন্দী ভাষা বলিতে আমি অভ্যস্ত নহি, কাজেই ভাষার অশুদ্ধির জন্য তাঁহারা যেন আমাকে ক্ষমা করেন, এই বলিয়া সংক্ষেপে বালিকাটির পরিচয় জ্ঞাপন করিলাম এবং সেই অধ্যাপক-মহোদয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম যে, বালিকার এই অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান এ-জীবনে অধীত শাস্ত্রাদির দ্বারা সম্ভব হয় নাই; মহাকবি কালিদাসের ভাষায় বলিতে হয়, "প্রবোদিরে প্রাক্তনঃ জন্মবিদ্যা"। অতঃপর সভা ভঙ্গ হইল।

দিল্লীর সেই ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া একটি জাতিস্মরের সন্ধান পাইব মনে করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছিলাম কিন্তু তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। আমার মনে হইল, সেই ভদ্রলোকটি রামদেবীর কথা শুনিয়াই আমাকে ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে আর বসিয়া না থাকিয়া শ্রীনগর (কাশ্মীর)-এ একটি জাতিস্মর বালক আছে জানিতে পারিয়া ঠাকুর-সাহেবের কাছে বিদায় লইয়া পরের দিনই শ্রীনগর-অভিমুখে রওনা হইলাম। বলা বাহুল্য, ঠাকুর-সাহেবই আমার পাথেয়র ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

যাইবার সময় তাঁহাকে জানাইয়া গেলাম যে, ঐ অঞ্চল হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বৃন্দাবনে পুনরায় তাঁহার সহিত দেখা করিব এবং তাঁহার সহিত জয়পুর যাইব।

॥ দুই ॥

শ্রীনগরে যাইবার দুইটি পথ—একটি রাওয়লপিণ্ডি, অপরটি জম্মু হইয়া। স্থির করিলাম, যাইবার সময় রাওয়লপিণ্ডি হইয়া যাইব এবং জম্মু হইয়া ফিরিব। শ্রীনগরে পৌঁছিয়া মঘরমলবাগ মহল্লার অধিবাসী লালা দাসরাম মালিক এম-এ, বি-টি মহাশয়ের বাটীতে অতিথি হইলাম। ইনি তখন ইনস্‌পেক্টর অফ স্কুলস্‌ ছিলেন। তাঁহার তিন কন্যা ও দুই পুত্র। কন্যা তিনিটিই বড়—বড় মেয়েটি দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পড়িত; ২য়া ও ৩য়া কন্যা বি-এ পড়িত।

আমি জাতিস্মর সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানে এখানে আসিয়াছি জানিতে পারিয়া বড় মেয়েটি আমাকে একদিন বলিল যে, শ্রীনগরে একটি জাতিস্মর বালকের সন্ধান আপনাকে দিতে পারি। পূর্ব্বজন্মে বালকটি নাকি রাওয়ল-পিণ্ডি শহরের একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। বর্ত্তমান জীবনে সে শ্রীনগরের আমিরা কাদলের গ্রামোফোন-ব্যবসায়ী রাজপাল কোম্পানীর স্বত্বাধিকারীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া আহারান্তে বিশ্রাম করিবার পর উক্ত রাজপাল কোম্পানীতে গেলাম; সেখানে কোম্পানীর মালিক বাবু বাসুদেব বর্ম্মা বি-এ মহোদয়ের সঙ্গে দেখা হইল। দোকানে প্রবেশ করিতেই আমাকে একজন খরিদ্দার মনে করিয়া বলিলেন—আপনি কিরকম গ্রামোফোন চান এবং কত দামের মধ্যে? আমি হাসিয়া বলিলাম—সেজন্য আমি আসি নাই। এই বলিয়া তাঁহার নিকট আমার আগমনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলাম। তখন নানা কুশল প্রশ্নাদির পর তিনি বলিলেন,—"আমরা সীমান্ত প্রদেশের ডেরাগাজীখাঁর অধিবাসী ছিলাম, কিন্তু বর্ত্তমানে রাওয়লপিণ্ডিতে আসিয়া বাস করিতেছি। আমি ১৯৩২ সাল হইতে শ্রীনগরে এই কারবার করিতেছি। আমার যে পুত্রটি জাতিস্মর তার নাম ব্যাসমুনি। তাহার বর্ত্তমান বয়স সাত বৎসর। বালকটি একটু বেশী বয়সে কথা বলিতে আরম্ভ করে।

সাড়ে তিন বৎসর বয়সে প্রথম তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়; কথা ভালরূপে যখন সে বলিতে আরম্ভ করিল তখন সর্ব্বপ্রথমে একদিন তার মাকে বলিল যে, সে একজন ডাক্তার ছিল। তাহার পর একদিন বলিল যে, সে রাওয়ল-পিণ্ডিতে ছিল।

ছেলেবেলায় খেলাধূলা করিবার সময় সে প্রায়ই ডাক্তারি-খেলাই করিত অর্থাৎ সে যেন ডাক্তার হইয়াছে, কাহাকেও কম্পাউণ্ডার বানাইয়াছে, নিজে ডাক্তার হইয়া রোগী পরীক্ষা করিতেছে, ঔষধ ব্যবস্থা করিতেছে ইত্যাদি। যে পরিবেশের মধ্যে তাহার জন্ম হইয়াছিল, তাহাতে তাহার মস্তিষ্কে এরূপ সংস্কারের ছাপ পড়িবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কারণ, আমার পরিবারের কেহই ডাক্তার ছিল না বা আমার বাড়ীর আশেপাশেও কোন ডাক্তারের বাড়ী ছিল না, যাহা হইতে তাহার উপর এরূপ সংস্কারের ছাপ পড়িতে পারে।

একদিন সে আমাকেও বলিল—পূর্ব্বে সে একজন ডাক্তার ছিল, এবারেও সে ডাক্তার হইবে।

বর্ত্তমানে "গোণ্ডা সিং বিল্ডিং" নামে যে বাড়ী আমি ভাড়া লইয়াছি, তাহার দোতলায় দুইখানি ঘর আছে। একদিন খেলা করিতে করিতে বালকটি আমাকে ও তাহার মাতাকে ডাকিয়া বলিল. "পূর্ব্বে একবার এখানে অর্থাৎ শ্রীনগরে আসিয়া আমি এই বাড়ীতে ছিলাম।" ঘর দুইখানির একখানা ঘর দেখাইয়া বলে যে, "এই ঘরে আমি থাকিতাম" ও তার পাশের ঘর দেখাইয়া বলে যে, "এই ঘরে আমার স্ত্রী পুত্রসহ থাকিত।" তার পরদিন আবার আমাকে বলিল, "এই বাড়ীর মালিককে আমি জানি, সে আমার বিশেষ বন্ধু।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বন্ধুটি, যিনি এই বাড়ীর মালিক, তাঁহার নামটা কি বলিতে পার কি?" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"হ্যাঁ, বলিতে পারি, তাঁহার নাম সরদার মল সিং।" বালকটির উত্তর শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম; সত্যই তো, তাহার পক্ষে এ-বাড়ীর মালিকের নাম জানা কোন প্রকারেই তো সম্ভব না! তবে কি সত্যই সে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি হইতেই

এরূপ বলিতেছে ? একদিন ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি তো বলিতেছ, পূর্ব্বজন্মে ডাক্তার ছিলে এবং রাওয়লপিণ্ডিতে ছিলে, তোমার কি নাম ছিল বলিতে পার কি ?" ব্যাসমুনি উত্তর দিল যে, তাহার নাম ছিল ডাঃ সন্ত সিং ভুগল।

বালকের উত্তর শুনিয়া প্রথমে হতভম্ব হইয়া গেলাম, কারণ ক্যাপ্টেন সন্ত সিং ভুগল এম-বি, বি-এস আমার নিকট-আত্মীয় ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্বও ছিল। ১৯৩২ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখে রাওয়লপিণ্ডিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। মনে হইল, সত্যই কি ডাঃ সন্ত সিং নব কলেবরে আমার গৃহে আসিলেন ? মনে মনে স্থির করিলাম, রাওয়লপিণ্ডিতে যাইয়া ইহার প্রকৃত তথ্য নিরুপণ করিবার পূর্ব্বে গোণ্ডা সিং বিল্ডিং-এর স্বত্বাধিকারী সরদার মল সিংকে একদিন গোপনে ডাকিয়া আনিয়া দেখিব যে পুত্রটি তাহাকে চিনিতে পারে কিনা। সরদার মল সিংকে আমার ছেলের সম্বন্ধে কোন কথা না জানাইয়া একদিন তাঁহাকে গিয়া বলিলাম যে, আমার আপনাকে বিশেষ প্রয়োজন আছে, দয়া করিয়া আমার বাসায় একবার আপনাকে যাইতে হইবে। তিনি রাজি হইলেন—তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাসায় আসিলাম। তাঁহাকে একটি ঘরে বসাইয়া আমার ছেলে ব্যাসমুনিকে লইয়া আসিলাম। বালকটি গৃহে প্রবেশ করিয়া সরদারজীকে দেখিবামাত্র দৌড়াইয়া গিয়া 'বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করিয়া সরদারজীর হাত ধরিল। আমি ও সরদারজী উভয়েই বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িলাম।

আমিই প্রথমে বালকটিকে প্রশ্ন করিলাম, "তুমি যাঁহাকে বন্ধু বলিয়া বলিতেছ, তিনি কে বলিতে পার ?" উত্তর হইল, "মল সিংজী।" সরদারজীর বিস্ময় তখন আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি, আমি তো কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না ?"

তখন সরদারজীকে বালকটির পূর্ব্বজীবনের স্মৃতি সম্বন্ধে সব বিষয় বলিলাম। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ডাক্তার সন্ত সিং ভুগল আমার

বিশেষ বন্ধু ছিলেন।" মল সিং-এর সঙ্গে আমার পুত্র ব্যাসমুনির যখন এই প্রথম দেখা হয় তখন সরদারজীর বয়স ৪৫ বৎসর। সেই প্রথম দর্শন হইতেই বালকটি সরদারজীকে বন্ধু বলিয়া ডাকে এবং এখনও বন্ধুই বলে।

মল সিংজী বলিলেন, "হ্যাঁ, ডাঃ সন্ত সিং একবার তাঁহার স্ত্রীপুত্র সহ আসিয়া আমার এই বাড়ীতেই ছিলেন।"

আমি তখন বাবু বাসুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রথমে যেদিন সরদার মল সিং আপনার ছেলেকে দেখিলেন এবং জানিতে পারিলেন যে, পূর্ব্বজন্মে এই বালক তাঁহার বন্ধু ডাঃ সন্ত সিং ছিলেন, তখন তিনি বালকটির পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি পরীক্ষার জন্য আর কোন প্রশ্ন করেন নাই কি?"

বাসুদেবজী বলিলেন—"হ্যাঁ, তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটির উত্তর ব্যাসমুনি যথাযথ দিতে পারিয়াছিল, আবার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল, উহা তাহার ঠিক স্মরণে নাই।" আমি পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, "বালকটির স্মৃতিশক্তি কি খুব তীক্ষ্ণ বলিয়া মনে করেন?" তিনি উত্তরে বলিলেন—"হ্যাঁ, এবং ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান। সে এখনই স্কুল হইতে আসিবে, তাহাকে দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।"

কিছুক্ষণ পরেই ছেলেটি স্কুল হইতে আসিল, তাহাকে দেখিয়া বেশ বুদ্ধিমান্ বলিয়াই মনে হইল। তাঁহাকে দেখিয়া তাহার বয়স ৭।৮ বৎসর হইবে বলিয়া মনে হইল; তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, সাত উত্তীর্ণ হইয়া আটে পড়িয়াছে।

ব্যাসমুনিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার পূর্ব্বজীবনের কথা এখনও মনে আছে কি?" উত্তর করিল—"আগে কিছু কিছু মনে ছিল, এখন আর কিছু মনে পড়ে না।"

অনুমানে বুঝিলাম যে, বালকটির পূর্ব্বজীবনের স্মৃতি তেমন তীক্ষ্ণ ছিল না, তাই অল্প সময়ের মধ্যেই বিস্মৃতি আসিয়াছে।

এইরূপ জাতিস্মর বালক-বালিকার তথ্যানুসন্ধান করিয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, সাধারণতঃ প্রথমে কথা বলিতে আরম্ভ করিবার সময়

পূর্ব্বজীবনের স্মৃতি থাকে, পরে বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বস্মৃতি ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসে। অবশ্য এরূপ দৃষ্টান্তও দেখিয়াছি যে, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পূর্ব্বজীবনের স্মৃতি অম্লানই রহিয়াছে, ইহাকে ব্যতিক্রম বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে।

পুনরায় বালকের পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বালকটি প্রথম যখন পূর্ব্বজীবনের কথা বলিতে আরম্ভ করে তখন কোনদিন কি তাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, কি ভাবে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল এবং কিরূপেই বা সে এখানে আসিল? উত্তরে তিনি বলিলেন—"হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বালক শুধু এইমাত্রই বলিয়াছিল যে, সে খুব অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পর এখানে চলিয়া আসে, ইহার বেশী সে আর কিছুই বলিতে পারে নাই।"

প্রশ্ন। রাওয়লপিণ্ডি শ্রীনগর হইতে তো বহুদূরে নহে। পরলোকগত ডাঃ সন্ত সিং ডুগলের পরিবারবর্গকে কি এই বালকের সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল?

উঃ। হ্যাঁ, ডাঃ সন্ত সিং ডুগলের ছেলেরা এই সংবাদ জানিতে পারিয়া ছেলেটিকে দেখিতে আসে।

প্রঃ। বালকটি তাহাদের চিনিতে পারে কি?

উঃ। বালক তাহাদের দেখিবামাত্রই চিনিতে পারে এবং তাহাদের কোলে যাইয়া বসে।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর সরদার মল সিং-এর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহার ঠিকানা আমাকে দিলেন।

জাতিস্মরদের তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া একটি কথা সর্ব্বদাই মনে হইত। তাহা এই যে, যাহাদের পূর্ব্বজীবনের স্মৃতি থাকে, তাহারা কি কারণে এই স্মৃতির অধিকারী হয়? যাহাদের পূর্ব্বজীবনের স্মৃতি আছে এরূপ বালক-বালিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার কোন সদুত্তর পাই নাই।

স্মৃতিবাহীচেতনার অধিকারী বালক-বালিকাদের পিতামাতাকেও এ-

বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছি, তাঁহাদের নিকট হইতেও এ বিষয়ের কোন সমাধান পাই নাই। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এরূপ সন্তানদের জন্মদান সময়ে কোন বিশেষ চিন্তা তাঁহাদের মনকে অধিকার করিয়াছিল কিনা, তাহারও কোন সদুত্তর কেহ দিতে পারে নাই।

এই সব জাতিস্মরদের প্রদত্ত উত্তরের যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে যতটা সম্ভব কোন বিশেষ মতবাদের দিকে না ঝুঁকিয়া উহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি ;—কিন্তু এমন কতকগুলি তথ্যের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে যাহা 'জন্মান্তরবাদ' ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ব্যাখ্যাত হইতে পারে না।

'জন্মান্তরবাদ' যদি মানিয়া লইতে হয় তবে এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে—জীবের কিরূপেই বা দেহাবসান হয় এবং কিরূপেই বা পুনরায় পিতামাতার ভিতর দিয়া সেই মৃত শরীরীর এই জগতে আসা সম্ভব হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে শুনিয়াছি, মৃত্যুসময়ে মানুষ যেভাব আশ্রয় করিয়া গত হয়, মৃত্যুর পরে সেই গতশরীরী সেই ভাবভূমিতে বিচরণ করে। সে পুনরায় জন্মিবে সেইখানেই—যেখানে কোন মানুষ ঐ সমজাতীয় ভাবতরঙ্গের দ্বারা আলোড়িত-মস্তিষ্ক হইয়া উপগত হইয়াছে। বিদেহী জীবের পুনরায় পিণ্ডধারণের জন্য আমাদের সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। শ্রাদ্ধে আমরা পারিপার্শ্বিককে খাওয়াই ; তাহার অর্থ, যাহাদের ভিতর দিয়া সে পিণ্ডধারণ করিবে তাহারা যাহাতে সুস্থ, স্বস্থ ও তাহারই (অর্থাৎ যে বা যিনি গত হইয়াছেন তাঁহার) ভাবে অনুপ্রাণিত হয় অর্থাৎ ঠিক যাহাতে রেডিও-রিসিভারের মত কাজ করিতে পারে।

এইজন্য শাস্ত্রমতে শ্রাদ্ধাদিতে বহুলোক ভোজন করান অবিধি ; কারণ, বড় ভোজে এই অনুপ্রাণতার অভাব ঘটিয়া থাকে। শ্রাদ্ধে বহু লোককে না খাওয়াইয়া পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে খাওয়াইলে ফল বেশী।

যে অল্প কয়েকজনকে শ্রদ্ধার সহিত ভোজনে প্রীত করাইয়া মৃত ব্যক্তির ভাবে অনুপ্রাণিত করা হইল, তাহারা বাড়ীতে গিয়া স্ত্রীপুরুষে

মিলিয়া মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে উপযুক্তভাবে মিলিত হইলে, সেই গতশরীরীর সেখানে প্রবেশলাভ সম্ভব হয়।

এইরূপভাবে স্ত্রীপুরুষের মিলনের ফলে বিগত আত্মার পুনরাবির্ভাব বাস্তবক্ষেত্রে প্রমাণসিদ্ধ কিনা—তাহাই ছিল আমার একটি অনুসন্ধানের বিষয়। বহু অনুসন্ধানের পর এই একটিমাত্র ক্ষেত্রেই শ্রীনগরের এই জাতিস্মর বালকের পিতার নিকট হইতেই নিঃসংশয়ভাবে ইহার উত্তর পাইয়াছি।

জাতিস্মর বালক ব্যাসমুনির পিতা বাবু বাসুদেব বর্ম্মাকে প্রশ্ন করিলাম—"বালকের জন্মদানসময়ে কিরূপ চিন্তা আপনার বা আপনার স্ত্রীর মনে উদয় হইয়াছিল তাহা বলিতে পারেন কি?"

উত্তরে তিনি বলিলেন—"হ্যাঁ, বলিতে পারি। ডাঃ সন্ত সিং আমার নিকট-আত্মীয় ও বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ১৯৩২ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখ প্রাতে রাওয়লপিণ্ডিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেইদিন বৈকালে বেলা চার ঘটিকার সময় আমি শ্রীনগর হইতে রাওয়লপিণ্ডি পৌঁছি। আমি যখন রাওয়লপিণ্ডিতে পৌঁছিলাম ঠিক সেই সময়েই আমার ভায়রা-ভাই ডাঃ সন্ত সিং ডুগলের শবদাহক্রিয়া সমাধান করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। আমার স্ত্রী তখন আমার রাওয়লপিণ্ডির বাড়ীতেই ছিলেন।

রাত্রে আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আহারান্তে পরলোকগত ডাক্তার সন্ত সিং-এর সম্বন্ধে তাঁহার চিকিৎসা-বিদ্যার অসামান্য পারদর্শিতা, উদারতা, জনপ্রিয়তা ইত্যাদি গুণাবলীর আলোচনা অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত করিতে থাকি এবং এইরূপ আলোচনায় ব্যাপৃত থাকাকালেই স্বামী-স্ত্রীতে মিলিত হই। সেই দিনই আমার স্ত্রীর গর্ভ-সঞ্চার হয়। তাহার পর দিন প্রাতে অর্থাৎ ১১ই নবেম্বর প্রাতে আমি রাওয়লপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর অভিমুখে রওনা হই এবং আর ছয় মাসের মধ্যে আমার রাওয়লপিণ্ডি যাওয়া বা আমার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় নাই।

প্রশ্ন। বালকটির জন্মসময় ও তারিখ আপনার মনে আছে কি?

উঃ। হ্যাঁ, ছেলেটির জন্ম হয় রাওয়লপিণ্ডিতে ২৪শে জুলাই, ১৯৩৩ সালে, প্রাতঃকাল ৮টা ৪৫ মিনিটের সময়।

প্রঃ। ছেলেটি তাহা হইলে নয় মাস পড়িতেই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল কি ?

উঃ। হ্যাঁ, নয় মাস পড়িতেই জন্ম হইয়াছিল। আমার স্ত্রীর সব ছেলে-মেয়েই নয় মাস পড়িতেই জন্ম হইয়াছে।

প্রঃ। আপনার স্ত্রী জীবিত আছেন কি ?

উঃ। না, তিনি একটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া মারা গিয়াছেন।

প্রঃ। পরলোকগত ডাঃ সন্ত সিং ডুগলের ছেলেদের নাম বলিতে পারেন কি ?

উঃ। না, ছেলেদের নাম মনে নাই, তবে তাঁহাদের Messrs G. S. Dugal & Sons, Chemists & Druggists, Lunda Bazar, Rawalpindi—এই নামে দোকান আছে। তাঁহার ভাগের নামে সরদার উত্তম সিং। তিনি রাওয়লপিণ্ডিতে ডালহৌসি রোডে থাকেন।

এইসব কথাবার্ত্তা হইবার পর সেই দিন বাবু বাসুদেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতে সরদার মল সিং-এর নিকট যাইয়া বাবু বাসুদেব বর্ম্মার পুত্র ব্যাসমুনির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, বালকটি প্রথম দর্শনেই আমাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল এবং আমার নাম যে সরদার মল সিং তাহাও বলিয়াছিল এবং এখনও সে আমাকে বন্ধু বলিয়া ডাকে। পরলোকগত ডাঃ সন্ত সিং আমার বন্ধু ছিল এবং একবার স্ত্রী-পুত্র সহ শ্রীনগরে আসিয়া আমার ঐ বাড়ীতে "গোণ্ডা সিং বিল্ডিং"-এ ছিল।

সেবারের মত শ্রীনগরের কার্য্য সমাধা করিয়া জম্মুতে চলিয়া আসিলাম। জম্মুতে অবস্থানকালে একজন শিক্ষিত মুসলমান-ভদ্রলোকের

সহিত পরিচয় হয়। তাঁহার নিকট হইতে পেশোয়ারে একটি জাতিস্মর মুসলমান-বালিকার সন্ধান পাই।

মুসলমান ও খৃষ্টীয় সম্প্রদায় সাধারণতঃ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী নয়—যদিও তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে—বিশেষ করিয়া বাইবেলে এ-বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। তাই জাতিস্মরদের সন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল যে, মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ জাতিস্মর বালক বা বালিকার সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। তাই তাঁহার নিকট হইতে সংবাদ পাইবা-মাত্র পেশোয়ারে যাইবার সিদ্ধান্ত করিলাম এবং তাঁহাকে এ-সম্বন্ধে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "আমি আজ একমাস হইল পেশোয়ার হইতে আসিয়াছি। পেশোয়ার শহরের টাওয়ারের নিকট এক মুসাফিরখানায় পাঁচবৎসর বয়স্কা একটি মুসলমান-বালিকাকে দেখিয়াছি, সমগ্র কোরাণ তাহার কণ্ঠস্থ, কোরাণের যে-কোন সুরার উল্লেখ করিলে সে তৎক্ষণাৎ তাহা আবৃত্তি করিতে পারে। বালিকাটি তাহার পিতা সহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এক গ্রাম হইতে পেশোয়ার শহরে আসিয়াছে। বালিকাটি বলে যে, সে পূর্ব্বজন্মে কোরাণ খুব ভালরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিল, তাই তাহার স্মরণে আছে এবং পূর্ব্বজন্মে কোন্ গ্রামে, কোন্ বংশে জন্মিয়াছিল তাহাও সে প্রকাশ করিয়াছে। আমি বালিকাটিকে নিজে দেখিয়াছি, কিন্তু জানেনই তো, আমরা জন্মান্তরে বিশ্বাসী নই। স্থানীয় মুসলমানগণ বালিকার পিতাকে শাসাইয়াছে যে, তাহাদের পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী কোন কথা বলিলে তাহারা সহ্য করিবে না।

"আমি বালিকাটিকে নিজে দেখিয়াছি ও পবিত্র কোরাণ শরিফের কয়েকটি সুরা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া যথাযথ উত্তর পাইয়াছি। ভাবিয়াছি, পাঁচ বৎসরের একটি বালিকার পক্ষে এরূপ অত্যাশ্চর্য্য শক্তির অধিকারিণী হওয়া কিরূপে সম্ভব? পূর্ব্বজন্মে বিশ্বাসী না বলিয়া বালিকার কথা যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই, যদিও যুক্তির দিক্ দিয়া বুঝি যে, সম্পূর্ণ আক্ষরিক জ্ঞানহীনা পঞ্চবর্ষীয়া একটি গ্রাম্য বালিকার পক্ষে

এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারিণী হওয়ার ব্যাপার জন্মান্তরবাদ ছাড়া আর কোন উপায়েই সমাধান করা সম্ভবে না। বালিকাটিকে দেখা অবধি আমার মনের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন সমাধান পাইতেছি না।”

আমাকে বলিলেন—“আপনার যখন এই ব্যাপারে ঔৎসুক্য আছে, আপনি নিজে যাইয়া এ বিষয়ের সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া আসিতে পারেন।” তিনি তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে নিষেধ করায় তাহা জানান সম্ভব হইল না।

পেশোয়ারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। মনে ভাবিলাম, শ্রীনগরে থাকিতে যে জাতিস্মর বালকটির সন্ধান পাইয়াছিলাম, পূর্ব্বজীবনে সে রাওয়লপিণ্ডির অধিবাসী ছিল। পেশোয়ার যাইবার পথে রাওয়লপিণ্ডিতে নামিয়া সেই বালকটির পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধীয় তথ্যাদি অনুসন্ধান করিয়া যাইব। একটা সুযোগও আসিয়া উপস্থিত হইল।

জম্মু থাকাকালে Linguistic Society of India-র প্রেসিডেন্ট, বহুভাষাবিদ্ ডাঃ সিদ্ধেশ্বর বর্ম্মা ডি-লিট (লণ্ডন)-এর সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। আমি প্রসিদ্ধ প্রাচীন জ্যোতিষগ্রন্থ “ভৃগু-সংহিতা” সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি জানিয়া তিনি একদিন আমাকে বলিলেন, “রাওয়লপিণ্ডিতে সজ্জিমণ্ডী মহল্লায় জ্যোতিষী হ্যাভেলিরাম আছেন, তাঁহার নিকট “অরুণ-সংহিতা” নামে জ্যোতিষের হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি আছে। তাঁহার গণনা আশ্চর্য্য রকম মেলে। একজন রাশিয়ান ভদ্রলোক হ্যাভেলিরামের নিকট হইতে “অরুণ-সংহিতা”র কোষ্ঠী আনাইয়া আমাকে রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করিতে দিয়াছিলেন। সেই রাশিয়ান ভদ্রলোকের নিকট হইতে তখন জানিতে পারি যে, তাঁহার অতীত জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা আশ্চর্য্য রকমে মিলিয়াছে। ইহার অনেক বৎসর পরে আবার সেই রুশ-ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হওয়াতে তিনি বলেন যে, তাঁহার ভবিষ্যৎ ঘটনাও আশ্চর্য্য রকমে মিলিয়াছে।”

আমার নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত ‘অরুণ-সংহিতা’র কথা শুনিয়া জম্মু

কলেজে ...বিদ্যার অধ্যাপক বীরেন্দ্রকুমার বসুমহাশয় রাওয়লপিণ্ডির জ্যোতিষী হ্যাভেলিরামের নিকট হইতে তাঁহার নিজের কোষ্ঠী আনিয়া দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন এবং বলিলেন যে, "আপনার পেশোয়ারে যাতায়াতের সমস্ত ব্যয়ভার আমি সানন্দচিত্তে বহন করিব।"

এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে পাথেয়র সংস্থান হইয়া গেল দেখিয়া বীরেন-বাবুর সহিত উক্তরূপ কথা হইবার পরদিনই সন্ধ্যার ট্রেনে জম্মু হইতে রওনা হইলাম। সেদিন গাড়ীতে অসম্ভব ভীড় ছিল। শিয়ালকোটে আসিয়া গাড়ী অনেকটা খালি হইয়া গেল। ওয়াজিরাবাদে গাড়ী বদল করিয়া সকাল ৭টায় রাওয়লপিণ্ডি পৌঁছিলাম।

রাওয়লপিণ্ডি ষ্টেশনে নামিয়া নিকটস্থ মূলরাজ ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। স্থির করিলাম যে, হ্যাভেলিরাম-এর সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া ও জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় সব কাজ মিটাইয়া পরে ডাঃ সন্ত সিং-এর বাড়ী যাইব।

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে সব্জিমণ্ডীতে হ্যাভেলিরামের ওখানে গেলাম। তাঁহার সহিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা হইল। সেখানে কাশ্মীরের ইনস্পেক্টর-জেনারেল-অব-কাষ্টমস্ ক্যাপ্টেন হীরা সিং-এর সঙ্গে পরিচয় হইল। তিনিও বলিলেন যে, হ্যাভেলিরামের নিকট হইতে তিনি যে কোষ্ঠী লইয়াছেন তাহা অদ্ভুত রকমে মিলিয়াছে।

যাহা হউক, জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় কাজ শেষ করিয়া ক্যান্টনমেণ্টের দিকে পরলোকগত ডাঃ সন্ত সিং ডুগলের বাড়ীতে গেলাম। সেই সময়ে সন্ত সিং-এর ছেলেরা কেহ বাড়ী ছিল না। তাঁহার পত্নী ও কন্যাদের সঙ্গে পরিচয় হইল।

ডাঃ সন্ত সিং-এর পত্নী বলিলেন যে, তিনি নিজে ছেলেটিকে দেখেন নাই, তাঁহার দুই পুত্র ছেলেটিকে দেখিবার জন্য শ্রীনগরে গিয়াছিল; ছোট ছেলেটি ডাক্তারী পড়ে, সে এখানে নাই। আমার যে ছেলেটি আমাদের ঔষধের দোকান দেখাশুনা করে—তাহার নাম সরদার হরভজন সিং—সে কিছুক্ষণ পরেই আসিবে, তাহার নিকট সব জানিতে পারিবেন।

আহারান্তে বিশ্রামের পর সরদার হরভজন সিং-এর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইল এবং নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা হইল—

প্রঃ। আপনি কি শ্রীনগরে জাতিস্মর বালকটির বিষয় অবগত আছেন ?

উঃ। হ্যাঁ, ছেলেটির সংবাদ প্রথমে আমরা আমাদেরই এক আত্মীয়ের নিকট হইতে জানিতে পারি। এ-সব বিষয়ে আমার তেমন আস্থা ছিল না, তাই এ-সম্বন্ধে বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করি নাই। আমার মার কানে যখন এ সংবাদ পৌঁছিল তখন তিনি আমাদের দুই ভাইকে বলিলেন—তোমরা একবার গিয়া ছেলেটিকে দেখিয়া আইস। মায়ের বিশেষ অনুরোধেই ছেলেটিকে দেখিতে শ্রীনগর গিয়াছিলাম।

প্রঃ। বালকটি প্রথমে যখন আপনাদিগকে দেখিল, তখনই কি আপনারা কে তাহা বলিতে পারিয়াছিল ?

উঃ। আমরা কাহাকেও কিছু না জানাইয়া হঠাৎই বালকটির সম্মুখে উপস্থিত হই। বালকটি আমাদের দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে প্রথমে আমার ক্রোড়ে তারপরে আমার ছোট ভাই-এর ক্রোড়ে যাইয়া বসে।

প্রঃ। আপনারা কে তাহার পরিচয় বালকটির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি ?

উঃ। হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। প্রথমে বালকটি বলে, তাহারা কে তাহা সে জানে। তাহার পর বলে যে, তাহারা তাহার পুত্র এবং রাওয়লপিণ্ডি হইতে আসিয়াছে।

প্রঃ। পূর্ব্বজীবনে বালকটির কী নাম ছিল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি ?

উঃ। জিজ্ঞাসা করাতে বালক বলিল যে, তাহার নাম ডাঃ সন্ত সিং ডুগল ছিল।

প্রঃ। আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি ?

উঃ। হ্যাঁ, আমাদের পারিবারিক ঘটনা সম্বন্ধে অনেক কথা

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহার কোনটার জবাব দেয় নাই আবার কোনটা সম্বন্ধে বলিয়াছে, তাহার মনে নাই, আবার কোনটা সম্বন্ধে জবাব ঠিকই দিয়াছিল ; কাজেই বালকটিকে দেখিয়া আমরা সে-ই যে পূর্ব্বজীবনে আমাদের পিতা ডাঃ সন্ত সিং ছিল তাহা ধারণা করিতে পারি নাই।

তখন আমি বলিলাম, 'এই জাতীয় বালক-বালিকাদের প্রত্যেকেরই পূর্ব্ব-স্মৃতি সমান তীব্র বা তীক্ষ্ণ থাকে না। কাহারও হয়তো পূর্ব্বজীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা মনে থাকে, কাহারও হয়তো অনেকগুলি ঘটনা মনে আছে আবার অনেকগুলি মনে নাই, কাহারও আবার পূর্ব্বজীবনের মাত্র ২।৪টি ঘটনাই মনে আছে আর কিছুই মনে নাই। যাহারা জাতিস্মর নহে এরূপ সাধারণ বালক-বালিকাদের মধ্যে যেমন দেখা যায় যে, জন্ম হইতেই কাহারও স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর, কাহারও মাঝামাঝি, কাহারও বা অত্যন্ত ক্ষীণ—প্রায় কিছুই স্মরণে রাখিতে পারে না ; পূর্ব্বজীবনের স্মৃতি যাহাদের আছে এরূপ শিশুদের পূর্ব্বস্মৃতি সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য। তবে দেখিতে হইবে, যে দুই-চারিটি ঘটনা তাহাদের স্মৃতিতে আছে তাহা যথার্থ কিনা। বালকটির পূর্ব্বস্মৃতি তেমন তীক্ষ্ণ না হইতে পারে কিন্তু সে পূর্ব্বজীবনের যে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছে তাহা বাস্তব ঘটনার সহিত মিলিতেছে কিনা তাহাই দেখিতে হইবে ; তাহা যদি ঠিক হয়, তবে তাহার জাতিস্মরত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই।'

তখন সরদার হরভজন সিং বলিলেন, "সেদিক্ দিয়া ভাবিয়া দেখিতে গেলে আপনার কথা স্বীকার না করিবার উপায় নাই। বালকের নিকট হইতে আমাদের সবগুলি প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব না পাওয়াতে আমরা একটু দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছিলাম ; আপনার যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া আমার মনের দ্বন্দ্ব দূরীভূত হইল।"

তাঁহার সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর তিনি লোণ্ডা বাজারের দিকে গেলেন, আমিও স্থানীয় বাঙ্গালী কালীবাড়ী দেখিবার জন্য রওনা হইলাম।

অভাবের তাড়নায় বা উন্নতির কামনায় বাংলার স্নেহশীতল ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে-সব বাঙ্গালী বাঙ্গলা ছাড়িয়াছিল, তাহারা যাইবার সময় বাঙ্গালী জাতির বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কার, সামাজিক ও ধর্ম্ম-জীবনের চিরাচরিত স্বাতন্ত্র্যটুকু সঙ্গে লইয়া যাইত এবং সুযোগমত ভিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে তাহাদের স্বীয় ভাবধারাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিত। ইহারই নিদর্শন-স্বরূপ আমরা শিমলা, দিল্লী, আগ্রা, আম্বালা, মিরাট, মুলতান, ফিরোজপুর, জলন্ধর, লাহোর, রাওয়লপিণ্ডি, পেশোয়ার, এমন কি আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুলেও বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কালীবাড়ীগুলি দেখিতে পাই। বাঙ্গলাদেশ হইতে ভ্রমণোদ্দেশ্যে নবাগত বাঙ্গালীকে যাহাতে বাঙ্গালী পরিবেশের মধ্যে আশ্রয় দান করা যাইতে পারে তাহাও এই প্রতিষ্ঠানের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের এইসব কালীবাড়ীর স্থাপয়িতা রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী নামে একজন বাঙ্গালী পরিব্রাজক। কালীবাড়ীতে গেলে স্থানীয় প্রায় সকল বাঙ্গালী-ভাইদের সঙ্গে পরিচয় হইল।

রাওয়লপিণ্ডি কালীবাড়ী-প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ডাঃ কমলকৃষ্ণ বসু এম-বি-মহাশয়ের সহিতও আলাপ হইল। আমি পেশোয়ার যাইব শুনিয়া তিনি আমাকে সেখানকার কালীবাড়ীতে যাইয়া উঠিতে বলিলেন। পাকিস্তান হওয়াতে বাঙ্গালীর এই প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্ব আছে কিনা জানি না।

ওখানকার বাঙ্গালী-ভাইদের সহিত আলাপ-পরিচয়ে ও তাঁহাদের সহৃদয় ব্যবহারে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও ভুলিয়া গেলাম যে আমি বাঙ্গলার বাহিরে আসিয়াছি। তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিলাম। রাওয়লপিণ্ডির মূলরাজ ধর্ম্মশালায় কয়দিন অবস্থানকালে দিল্লীর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বাবু গোপীনাথ ভার্গবের সহিত পরিচয় হইল। ইনি দিল্লীতে টিটাগড় পেপার মিলের এজেন্ট। ইঁহারই নিকট জানিতে পারিলাম যে, শান্তি দেবী নামে একজন জাতিস্মর বালিকা আছে। তাহার

নিবাস দিল্লীর চিরাখানা মহল্লায়। তাঁহার নিকট এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে বলিলাম যে, তাহা হইলে পেশোয়ার হইতে ফিরিয়া বরাবর দিল্লী যাইব। তখন ভার্গব-মহাশয় দিল্লীতে গেলে তাঁহার বাটীতে উঠিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন ও বলিলেন যে, দিল্লী ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের পিছনেই তাঁহার বাড়ী। দিল্লী পৌঁছিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে একখানা কার্ড লিখিয়া দিলে তিনি মোটর লইয়া উপস্থিত থাকিবেন।

পরদিন প্রাতে পেশোয়ার-অভিমুখে রওনা হইলাম। পথে তক্ষশিলা মিউজিয়ম দেখিবার জন্য তক্ষশিলা ষ্টেশনে নামিলাম। মিউজিয়মের কর্ম্মাধ্যক্ষ মণীন্দ্র গুপ্ত-মহাশয় পরমাত্মীয়ের ন্যায় আমাকে গ্রহণ করিলেন এবং ২।৪ দিনের জন্য থাকিয়া যাইতে অনুরোধ জানাইলেন। সঙ্গে করিয়া মিউজিয়মের সমস্ত অংশ দেখাইলেন এবং যে স্তূপসকল খনিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহাও দেখিলাম। মণীন্দ্রবাবুর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সেদিনকার মত তক্ষশিলায় রহিয়া গেলাম। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রাচীন তক্ষশিলার ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা হইল। পরদিন প্রাতে তক্ষশীলা হইতে রওনা হইয়া বৈকালে পেশোয়ার শহরে আসিয়া পৌঁছিলাম ও ক্যাণ্টনমেণ্ট অঞ্চলে অবস্থিত বাঙ্গালী কালীবাড়ীতে আশ্রয় লইলাম।

পেশোয়ার ক্যাণ্টনমেণ্টের রাস্তা-ঘাট ছবির ন্যায় চমৎকার। হাট-বাজারে নানাজাতীয় লোকের সমাগম ও নানাপ্রকার মেওয়া-ফলের দোকান দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাবুল নদ হইতে আনীত নহর ও বানাহিমার নামক প্রকাণ্ড দুর্গটি নগরপ্রান্তের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

পেশোয়ার অতি প্রাচীন শহর। প্রাচীনকালে ইহা গান্ধার প্রদেশের প্রধান শহর পুষ্কলাবতীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, পরে বৌদ্ধযুগে ইহা পুরুষপুর নামে খ্যাতি লাভ করে। ইহা এককালে কণিষ্কের রাজধানী ছিল। প্রাচীনকালে এখান হইতে একটি বিশাল রাজকীয় বর্ত্ম গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত তমলুক বা তাম্রলিপ্ত পর্য্যন্ত

বিস্তৃত ছিল। এই রাস্তা তখন আটটি অংশে বিভক্ত ছিল। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস ভারতে প্রবেশ করিবার পর সর্ব্বপ্রথম এই বিশাল বর্ত্ম তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই পথ বাহিয়াই তিনি ভারতের পশ্চিম-সীমা হইতে পাটলিপুত্র (বর্ত্তমান পাটনা)-নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহাই বর্ত্তমানকালে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নামে প্রসিদ্ধ।

কালীবাড়ীর পুরোহিত-মহাশয়ের নিকট আমার আগমনের উদ্দেশ্য বলিলাম। তিনি বলিলেন, আমিও এইরূপ একটি কথা শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এ বিষয়ের সঠিক খবর আপনি আমাদের কালীবাড়ীর প্রেসিডেণ্ট ও এখানকার আইন-পরিষদের সভ্য ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ-মহাশয়ের সহিত আলাপ করিলে জানিতে পারিবেন হয়তো। তিনি পেশোয়ার-শহরের ক্লক-টাওয়ারের কাছেই থাকেন,—যে-কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিবে।

পরদিন প্রাতে প্রাচীর-বেষ্টিত পেশোয়ার-শহরের মধ্যস্থানে অবস্থিত ঘণ্টাঘরের নিকট চারুবাবুর বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন সবেমাত্র রোগী দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন; আমাকে ইসারায় চেয়ারে বসিতে বলিয়া রোগী দেখা শেষ করিয়া আমার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই অনুযোগ করিলেন, "আমার বাড়ী থাকিতে আপনি কালীবাড়ীতে উঠিলেন কেন?" আমি বলিলাম, "আমার আহারাদি সম্বন্ধে অনেক হাঙ্গামা আছে, আমি স্বপাকী।" তাহা শুনিয়া বলিলেন, "আপনার মত লোককে তো আদর-আপ্যায়ন করাই মুস্কিল, কিছুই খাবেন না, কারও হাতেও খাবেন না, আপনার মত লোককে তো বাড়ী রেখে আরও মুস্কিল—আমরা সবই খাবো আর আপনি সিদ্ধভাত খাবেন—তাহ'লে আপনার পক্ষে কালীবাড়ী থাকাই ভাল।" তারপর বলিলেন, "ফল খেতে তো আপত্তি নেই? যে কয়দিন থাকবেন, আমি ফল পাঠিয়ে দেব।" প্রত্যহ তিনি লোক দ্বারা যথেষ্ট ফল পাঠাইয়া দিতেন।

তিনি অত্যন্ত হৃদয়বান্ লোক ছিলেন। সীমান্তের দুর্দ্ধর্ষ আফ্রিদি, মাসুদ প্রভৃতি উপজাতীয় লোকেরা তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিত। আমি তাঁহাকে আমার পেশোয়ারে আগমনের উদ্দেশ্য বলিলাম; শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমি এখানকার ইনস্‌পেক্টর অব পুলিশ প্রভাতের (মুখার্জি) নিকট হইতে বালিকাটির কথা শুনিয়াছি, সে নিজে বালিকাটিকে দেখিয়াছে। আমি আজই প্রভাতকে খবর দিতেছি, সে আপনার সঙ্গে কালীবাড়ীতে যাইয়া দেখা করিবে।" পরে বলিলেন, "সুবিধা হইলে আজ সন্ধ্যার পরে আমিও কালীবাড়ীতে যাইয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিব।"

মধ্যাহ্ন আহারের পর কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া উঠিয়া ভাবিতেছি, ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে বেড়াইতে যাইব, এমন সময় এতদ্দেশীয় পোষাক-পরিহিত একজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন—তাঁহার সুঠাম বলিষ্ঠ দেহ, বিশাল বক্ষ ও সুদীর্ঘ বপু দেখিয়া প্রথমে তাঁহাকে আমি সীমান্তেরই কোন অধিবাসী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথমেই তিনি বাংলা ভাষায় আমাকে সম্ভাষণ করায় আমার সে ভ্রম দূর হইল এবং মনে হইল, ইনিই হয়তো প্রভাতবাবু হইবেন।

তিনি বলিলেন, "আমি চারুবাবুর নিকট হইতে আপনার কথা শুনিয়াছি; আমি বালিকাটিকে টাওয়ারের নিকটস্থ মুসাফিরখানায় দেখিয়াছিলাম। তাহার বয়স অনুমান পাঁচ বৎসর হইবে। সমগ্র কোরাণ তাহার কণ্ঠস্থ, যে-কোন সুরার উল্লেখ করিলে তাহার শ্লোক সে আবৃত্তি করিতে পারে। বালিকাটি তাহার পিতার সঙ্গে আসিয়াছিল।

"আমি ইহাও জানি যে, তাহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহার পিতাকে স্থান ত্যাগ করিবাব জন্য শাসাইয়াছিল। কারণ, তাহারা যাহা প্রচার করিতেছে, তাহা তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী। বালিকাটি এখন আর সেখানে নাই, কোথায় গিয়াছে বলিতে পারি না।"

আমি বলিলাম, "আমি এই জন্যই এত কষ্ট স্বীকার করিয়া পেশোয়ারে আসিয়াছি। যদি কোন রকমে বালিকাটির সন্ধান দিতে পারেন—

কোন্ গ্রামে তাহার বসতি—তাহা হইলে সেই গ্রামে যাইয়াই আমি বালিকাটিকে দেখিয়া আসিব।" তিনি বলিলেন, "ইহার জবাব আপনাকে এখনই দিতে পারিব না, আমাকে কয়েকদিন সময় দিতে হইবে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া পরে জানাইব। আপনি ইতিমধ্যে 'খাইবার পাশ' দেখিয়া আসিতে পারেন; এখন তো কাহাকেও ও-অঞ্চলে যাইতে দেওয়া হয় না, তবে চারুবাবু চেষ্টা করিলে আপনার জন্য বিশেষ অনুমতি আনাইয়া দিতে পারেন।"

চারুবাবুর চেষ্টায় খাইবার পাশ দেখা সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বিবরণের স্থান ইহা নহে। আফ্রিদিদের গ্রামেও গিয়াছি—ইহাদের গ্রামগুলি ছোট এবং মৃৎপ্রস্তরে নির্মিত, গৃহগুলি বুরুজবিশিষ্ট—ছোট বা ক্রীড়নক দুর্গবিশেষ। গ্রামেই ইহারা বন্দুক-রাইফেল তৈয়ারী করে। ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি, ইহারা খুব সরল ও অকপট, স্পষ্টবাদী ও নির্ভীক—বন্দুক ও রাইফেল উহাদের জীবনের সঙ্গিস্বরূপ।

পেশোয়ারে সাত দিন ছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে জন্য গেলাম সেই বালিকাটির সন্ধান মিলিল না। চার দিন পরে প্রভাতবাবু জানাইলেন যে, অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তিনি বালিকার আবাসস্থলের কোন সন্ধান পান নাই। তাই পূর্ব্বোল্লিখিত মুসলমান-ভদ্রলোকটির ও প্রভাতবাবুর কথা সম্বল করিয়াই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পেশোয়ার হইতে ফিরিলাম।

॥ তিন ॥

পেশোয়ার হইতে বরাবর দিল্লী রওনা হইলাম। রওনা হইবার পূর্ব্বে দিল্লীতে শ্রীযুক্ত ভার্গবের নিকট একখানি কার্ড লিখিয়া দিলাম। দিল্লী ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি যে, শ্রীযুক্ত ভার্গব ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোটর লইয়া আমার

জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত আছেন। সেবারও তাঁহাদেরই অতিথি হইলাম। যে কয়দিন তাঁহাদের ওখানে ছিলাম, পরমাত্মীয়ের ন্যায় তাঁহাদের বাড়ীর প্রত্যেকের আদর-যত্ন আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

২৫শে জুলাই, বৃহস্পতিবার দিন প্রাতে উঠিয়া স্নানাদি সমাপনান্তে শ্রীযুক্ত ভার্গবের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সম্মুখস্থ চাঁদনী চকের রাস্তা ধরিয়া ঘণ্টাঘর পর্য্যন্ত যাইয়া মোড় ঘুরিয়া নয়া সড়কে পড়িলাম।

অনুসন্ধান করিতে করিতে ৫৬৫নং (বর্ত্তমান নং ১৭৪৭) চিরাখানা মহল্লায় শান্তি দেবীর পিতা রং বাহাদুরের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। ত্রিতল বাটী, সংবাদ দিতেই তিনি নীচে নামিয়া সহাস্যমুখে আমাকে অভিবাদন জানাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, বেশ ভাল লোক বলিয়াই মনে হইল। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া দোতলায় লইয়া গিয়া একটি ঘরে বসাইলেন। তাঁহাকে আমার আগমনের কারণ বলিলাম এবং নানাপ্রকার কুশল প্রশ্নাদির পর তাঁহার কন্যা শান্তি দেবী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা হইল।

প্রঃ। আপনার কনিষ্ঠা কন্যা শান্তি দেবীই কি জাতিস্মর ?

উঃ। হ্যাঁ।

প্রঃ। তাহার বয়স কত ?

উঃ। তের বৎসরে পড়িয়াছে। তাহার জন্ম হয় ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯২৬ সালে।

প্রঃ। শান্তির জ্ঞানোন্মেষ কি আপনার অন্যান্য সন্তান অপেক্ষা পূর্ব্বেই হইয়াছিল ?

উঃ। না, বরং অন্যান্য সন্তান অপেক্ষা অনেক পরেই সে কথা বলিতে আরম্ভ করে। তিন বৎসর বয়সে সে প্রথম কথা বলিতে আরম্ভ করে।

প্রঃ। অন্যান্য সন্তান অপেক্ষা আপনার এই সন্তানটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি ?

উঃ। আর তো বিশেষ কিছু বুঝিতে পারি না, তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে মেয়েটি খুব considerate ও শান্ত। ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেহ কোন গোলমাল বা অন্যায় করিলে ধীরভাবে তাহা মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করে। আর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য তো লক্ষ্য করি না।

প্রঃ। প্রথমে কখন হইতে সে পূর্ব্বজীবনের ঘটনা বলিতে আরম্ভ করে এবং কি কি বলিয়াছিল, বা এ সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করা হইয়াছিল কি না ইত্যাদি সংক্ষেপে জানাবেন কি?

উঃ। যখন হইতে তাহার কথা ফোটে, সেই সময় হইতেই সে কিছু কিছু বলিতে আরম্ভ করে। খাওয়া ও পরার ব্যাপার লইয়া প্রথমে সে পূর্ব্বজীবনের কথা বলিতে আরম্ভ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যখন তাহার মাতা তাহাকে খাবার দিত তখন সে বলিত—"মা, আমি আমার বাড়ী মথুরাতে এইসব খাবার খাইতাম।" যখন তাহার মাতা তাহাকে পোষাক পরাইয়া দিত তখন সে পূর্ব্বে মথুরাতে যে কিরূপ পোষাক পরিত তাহার বর্ণনা দিত। কখনও সে তাহার মথুরার বাড়ীর বর্ণনা দিত, বলিত যে, তাহার বাড়ী হলুদ রং-এর এবং বাড়ীর নিকটে তাহাদের কাপড়ের দোকান আছে।

প্রথমে আমরা বালিকার এইসব কথায় তেমন মনোযোগ দিই নাই বা উহার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করি নাই। কিন্তু বালিকা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই বলিত যে, সে মথুরাতে ছিল ও মথুরার নানাস্থানের তাহার পূর্ব্বজীবনের আত্মীয়স্বজনের কথা বলিত। আমরা তখন ভাবিতাম যে, কিছু বয়স বেশী হইলেই সে এইসব বিস্মৃত হইবে এবং তাহাকে এইসব কথা বলিতে নিষেধ করিতাম। কারণ, আমাদের দেশে এরূপ সংস্কার আছে যে, যে-সব ছেলেমেয়ে এইরূপ পূর্ব্বজন্মের কথা বলে এবং তাহা যদি সত্য হয় তবে সেই সন্তান দীর্ঘজীবী হয় না। কিন্তু বালিকা আমাদের কথায় বা উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া নিজের খেয়ালখুশি মত সময়ে সময়ে তাহার পূর্ব্বজীবনের কথা বলিয়া যাইত।

মধ্যে মধ্যে আমাদের নিকট সে মথুরা যাইবার কথা বলিত, এবং পাড়া-পড়শীরা আমাদের বাড়ীতে আসিলে তাহাদের নিকটেও এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিত।

আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালিকা শান্তি তাহার পূর্ব্বজীবনের স্বামীর নাম আমাদের নিকট প্রকাশ করে নাই। তাহার পূর্ব্বজীবনের স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার নাম উচ্চারণ না করিয়া বলিত যে, তাঁহাকে দেখিলেই সে চিনিতে পারিবে। অবশ্য স্বামীর নাম মুখে প্রকাশ না করাই সাধারণতঃ হিন্দুসমাজের রীতি।

শান্তির বয়স যখন অনুমান সাড়ে আট বৎসর হইল, সেই সময় আমাদের নিকট-আত্মীয় দিল্লী দারাগঞ্জের রামজাস্ স্কুলের শিক্ষক বাবু বিশন চাঁদ বালিকাটির পূর্ব্বজীবনের স্মৃতি আছে এই কথা লোকমুখে অবগত হইয়া শান্তিকে দেখিবার জন্য আমাদের বাড়ীতে আসেন এবং তাহাকে বলেন যে, যদি সে তাহাকে তাহার পূর্ব্বজীবনের স্বামীর নাম জানায় তাহা হইলে তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া মথুরায় লইয়া যাইবেন। শান্তি তখন বাবু বিশন চাঁদের কানে কানে বলে যে, তাহার পূর্ব্বজীবনের স্বামীর নাম "পণ্ডিত কেদারনাথ চৌবে"। বাবু বিশন্ চাঁদ সেদিন বিদায় লইবার প্রাক্কালে বালিকাকে বলিয়া আসেন যে, তাহাকে মথুরা লইয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি এ বিষয় অনুসন্ধান করিয়া পরে তাহাকে লইয়া যাইবেন। ইহার পরে বাবু বিশন চাঁদ যখনই আমাদের বাড়ী আসিতেন, তাঁহার অনুসন্ধানের ফল কি হইল তাহা জানিবার জন্য শান্তি খুব আগ্রহ প্রকাশ করিত। কিন্তু আমাদের বা বাবু বিশন চাঁদের বালিকার পূর্ব্ব-জীবনের স্বামীর বা তাঁহার গৃহাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার কোন ঔৎসুক্যই ছিল না, আমরা বালিকাকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে-ছিলাম মাত্র।

ইং ১৯৩৬ সালের দশহরার দিন বাবু বিশন চাঁদ বালিকার সম্বন্ধে ৮নং দারাগঞ্জ (দিল্লী)-নিবাসী বেরেলী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল

লালা কিষণ চাঁদ এম-এ-মহোদয়কে বলেন। তিনি বালিকাটিকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং বাবু বিশন চাঁদ সহ বালিকাটিকে দেখিতে আসেন।

অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল লালা কিষণ চাঁদ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বালিকা তাহার পূর্ব্বজীবনের স্বামীর নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দেয়। সেই সময় বালিকার বয়স ৯ বৎসর; তখন সে লিখিতে শিখিয়াছে। লালা কিষণলালের নিকট বালিকা তাহার পূর্ব্বজীবনের মথুরার বাড়ীর বর্ণনাও দেয়।

লালা কিষণ চাঁদ বালিকার প্রদত্ত ঠিকানায়, পণ্ডিত কেদারনাথ চৌবেকে পত্র লিখিয়া বালিকা সম্বন্ধে ও তাঁহাদের মথুরার বাড়ীর ও দোকানের যে বর্ণনা দিয়াছে তাহা জানান। পরমাশ্চর্য্যের বিষয়, কিছুদিন পরেই পণ্ডিত কেদারনাথ চৌবে পত্রোত্তরে লালা কিষণ চাঁদকে জানান যে, তাঁহার পত্রের লিখিত বর্ণনা সবই সত্য। চৌবেজী পণ্ডিত কাঞ্জিমল নামে তাঁহার একজন জ্ঞাতিভ্রাতাকে (যিনি দিল্লীর বিখ্যাত ব্যবসায়ী ভানামল গুলজারীমল-এর ফার্ম-এ কাজ করিতেন) বালিকাকে দেখিয়া তাঁহার মতামত জানাইবার জন্য পত্র দেন। পণ্ডিত কাঞ্জিমল মথুরার চৌবেজীর পত্র পাইয়া বালিকাটিকে দেখিতে আসেন। বালিকা তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারে এবং সকলের সমক্ষে প্রকাশ করে যে, ইনি আমার পূর্ব্বজন্মের পতি চৌবেজীর জ্ঞাতিভ্রাতা এবং সম্পর্কে আমার দেবর হন। কাঞ্জিমলজী শান্তিকে তাহাদের পারিবারিক ঘটনা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করেন, সে তাহার যথাযথ উত্তর দেয়। বালিকা কাঞ্জিমলজীকে তাহার পুত্র কেমন আছে জিজ্ঞাসা করে এবং নিজের বাড়ী ও দ্বারিকাধীশের মন্দিরের সম্মুখে যে তাহাদের কাপড়ের দোকান আছে তাহার কথাও বলে। বালিকার কথা শুনিয়া কাঞ্জিমলজীর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রহিল না যে, এই বালিকাই পূর্ব্বজন্মে তাঁহার বৌদি ছিলেন—যাঁহার নাম লুগদী দেবী ছিল। তিনি বালিকার কথা শুনিয়া এতদূর অভিভূত হইয়া-

ছিলেন যে, তিনি ভ্রাতাকে পত্রদ্বারা সব বিষয় না জানাইয়া সমস্ত সংবাদ নিজে যাইয়া ভ্রাতাকে জ্ঞাপন করিবার জন্য মথুরা অভিমুখে রওনা হইলেন। মথুরায় পৌঁছিয়া কাঞ্জিমলজী পণ্ডিত কেদারনাথ চৌবেকে সমস্ত বিষয় জানাইলেন এবং তাঁহাকে নিজে যাইয়া একবার বালিকাটিকে দেখিয়া আসিতে বলিলেন। তদনুসারে ১২ই নবেম্বর, ১৯৩৫ সালে পণ্ডিত কেদার-নাথ চৌবে আপনার স্ত্রী (লুগদী দেবীর মৃত্যুর পর ইহাকে তৃতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন। চৌবেজী তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পব ২য় বার লুগদী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন) এবং ২য়া স্ত্রী লুগদী দেবীর গর্ভ-জাত একমাত্র সন্তান নবনীতলালকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীতে আসেন। চৌবেজী স্ত্রীপুত্রসহ দিল্লীতে আসিয়া প্রথমে কাঞ্জিমলজীর বাসায় উঠেন। পরদিন সকালে পণ্ডিত কেদারনাথ চৌবে স্ত্রীপুত্র ও কাঞ্জিমলজীকে সঙ্গে করিয়া ৫৬৫ নং চিরাখানা মহল্লায় বাবু রং বাহাদুর মাথুরের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। শান্তি সে সময় বাড়ীতে ছিল না, স্কুলে গিয়াছিল। কাঞ্জি-মলজী প্রকাশ করিলেন যে, পণ্ডিত কেদারনাথ চৌবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা পণ্ডিত বাবুরামজী বালিকাটিকে দেখিতে আসিয়াছেন।

শান্তিকে স্কুল হইতে আনিবার জন্য লোক পাঠান হইল, সংবাদ পাইবামাত্র সে স্কুল হইতে ছুটি লইয়া বাড়ীতে আসিল। ইতিমধ্যে সংবাদটি নানাভাবে প্রচারিত হওয়াতে সমগ্র মহল্লাটি লোকারণ্যে পরিণত হইল।

বালিকা স্কুল হইতে বাড়ীতে আসিয়া পণ্ডিত কেদারনাথ চৌবেকে দেখিয়া লজ্জায় মাথা নত করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। শান্তির বয়স তখন নয় বৎসর মাত্র; পতিপত্নীর সম্বন্ধ তাহার অনুভবে আসা সম্ভব কি? তথাপি তাহার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সকলে বলিতে লাগিল, ইনি তোমার জেঠ অর্থাৎ ভাশুর হন, ইহাকে দেখিয়া তুমি এরূপ করিয়া রহিলে কেন? উত্তরে বালিকা ধীরে বলিল—ইনি আমার ভাশুর নন, ইনি আমার স্বামী, ইহার কথাই আমি অনেকবার আপনাদের বলিয়াছি—

এই বলিয়া নিজের পকেট হইতে পয়সা বাহির করিয়া চাকরকে ডাকিয়া পান আনিতে বলিল এবং চাকরটি পান লইয়া আসিলে একটি পান পণ্ডিত কেদারনাথ চৌবেকে দিল এবং আর একটি পান ভিড়ের মধ্য হইতে তাহার পুত্রকে চিনিয়া লইয়া তাহাকে দিল।

শান্তি তাহার জননীকে ইহাদের জন্য খাবার তৈয়ারী করিতে বলিল। কি কি খাবার বানান হইবে জিজ্ঞাসা করাতে বালিকা বলিল যে, ইনি আলুর তরকারি (ভরে), কাশীফলের শাক ও পরেটা খুব পছন্দ করেন। বালিকার কথা অনুসারে তাহার মাতা তাঁহাদের জন্য উক্ত খাদ্যাদি তৈয়ারী করিয়া তাঁহাদিগকে খাইতে দিলেন। বাবু কেদারনাথ চৌবে খাইতে বসিয়া শান্তির মাতা রামপ্যারী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি এইসব খাদ্য তৈয়ারী করিলেন কেন ? উত্তরে তিনি জানাইলেন যে, শান্তি তাহাকে বলিয়াছে যে, তিনি এইসব খাদ্য খুব পছন্দ করেন। চৌবেজী এই কথা শুনিয়া খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কারণ বাস্তবিকই এইসব খাদ্য তাঁহার অতি প্রিয়।

একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—শান্তি তাহার পূর্ব্বজন্মের পুত্র নবনীতলালকে প্রথমে দেখিয়াই ভীষণ অভিভূত হইয়া পড়ে। তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরে ও বহুক্ষণ ধরিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে। শান্তি তাহার স্বীয় জননীকে বালকের জন্য তাহার সব খেলনা আনিয়া দিতে বলে এবং বালককে ঐসব খেলনা দিবার জন্য এতদূর চঞ্চল হইয়া পড়ে যে, মাতার আনিবার অপেক্ষা না করিয়াই নিজেই দৌড়াইয়া গিয়া নিজের সব খেলনা আনিয়া বালককে দিল।

চৌবেজীর নিকট শান্তি মথুরার বাড়ীর বর্ণনা দেয় এবং জানায় যে, বাড়ীর একস্থানে তাহার কিছু টাকা পোতা আছে। চৌবেজী তখন শান্তিকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন।

প্রঃ। তুমি মথুরার বাড়ীর এমন কোন বর্ণনা দিতে পার কিনা যাহাতে আমি বুঝিতে পারি, তুমি সত্যই সেই বাড়ীতে ছিলে ?

উঃ। আমাদের বাড়ীর ভিতরের আঙ্গিনার এক কোণে একটি কূয়া আছে, আমি প্রায়ই সেই কূয়ার পাশে পাথরের উপর বসিয়া স্নান করিতাম।

প্রঃ। তুমি তোমার পুত্র এই বালককে কি প্রকারে চিনিলে? তোমার পূর্ব্বজীবনে মৃত্যুর সময় এই বালক দশদিনের শিশুমাত্র ছিল এবং তুমি সেই শিশুটিকে জন্মিবার পর একবারমাত্র দেখিয়াছিলে।

উঃ। ও আমার প্রাণ; প্রাণই প্রাণকে চিনিয়া লইয়াছে।

বালিকার পিতা বাবু রং বাহাদুর বলিতে লাগিলেন—শান্তি যখন সমস্ত খেলনা আনিয়া তাহার পূর্ব্বজন্মের পুত্র নবনীতলালকে (যাহার বয়স তাহাপেক্ষা বেশী) দিল, তখন তাহার চোখেমুখে এক অপূর্ব্ব বাৎসল্যভাবের প্রকাশ দেখা গেল—তাহার তখনকার ভাব দেখিয়া সে যে নয় বৎসরের বালিকা তাহা মনে হইল না। মনে হইল, সে যেন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছিয়াছে। বাৎসল্যপ্রেমে আবিষ্ট হইয়া সেই সময় সে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া সমবেত স্ত্রীপুরুষ সকলেরই ভাবাবেগে অশ্রু সম্বরণ করা কষ্টকর হইয়াছিল।

বালিকার এই অবস্থা দেখিয়া পণ্ডিত কেদারনাথ বালিকাকে শান্ত করিবার জন্য বাহিরে বেড়াইতে লইয়া যাইবার কথা বলিলেন। তদনুসারে আমি, চৌবেজী, নবনীতলাল ও শান্তি এই চারিজনে একখানা টাঙ্গায় করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিতে অনেক দেরী হইয়া গেল। ফিরিবার পথে বড় রাস্তায় নামিয়া শান্তি নবনীতলালের সঙ্গে হাত-ধরাধরি করিয়া চলিতে লাগিল, আমরা তাহাদের পিছনে পিছনে আসিতে লাগিলাম। সেদিন সন্ধ্যায় শান্তিকে খুবই হর্ষোৎফুল্ল দেখা গিয়াছিল।

বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতে অনেক দেরী হইয়াছিল, তাই শান্তি বাড়ীতে আসিয়া চৌবেজী ও তাহার পুত্রের জন্য দুধ আনাইতে বলিল।

দুধ আনা হইলে—একবাটি দুধ পণ্ডিত কেদারনাথকে ও একবাটি দুধ পুত্রকে দিল। তাহাকে দুধ খাইতে বলাতে সে বলিল—"ইঁহার সামনে এইরকমে দুধ খাইতে পারি না।" পণ্ডিত কেদারনাথ দুধ পান করিলে পর সেই পাত্রে নিজের জন্য দুধ লইয়া পান করিল।

অতঃপর চৌবেজী মথুরা ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শান্তি তাঁহাকে আরও কয়েকদিন তাহাদের বাড়ীতে থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিল। বালিকার ইচ্ছানুসারে চৌবেজী দিল্লীতে আরও দুই দিন থাকিয়া গেলেন।

সেইদিন রাত্রেই চৌবেজীর সহিত শান্তির গোপনীয় কথা হয়, তাহাতে চৌবেজী পরে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, যে-সব কথা সে আমাকে বলিয়াছে তাহা আমার পূর্ব্বের স্ত্রী ব্যতীত আর কাহারও জানা সম্ভব নয় —সুতরাং শান্তিই যে আমার পূর্ব্বস্ত্রী মৃতা লুগদী দেবী তাহাতে আমার আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

পণ্ডিত কেদারনাথ চৌবের বর্ত্তমান স্ত্রী যে-সব অলঙ্কার পরিধান করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ অলঙ্কার সে পূর্ব্বে পরিধান করিত তাহাও শান্তি দেখাইয়া দেয়।

১৫ই নবেম্বর (১৯৩৫) সন্ধ্যায় পণ্ডিত কেদারনাথ স্ত্রী-পুত্রসহ মথুরা ফিরিয়া যাইবেন কথা হইল। শান্তি তাহা শুনিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মথুরায় যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল—এবং বার বার সকলকে বলিতে লাগিল, যেন তাহাকে উঁহাদের সঙ্গে মথুরায় যাইতে দেওয়া হয়।

চৌবেজীরা রওনা হইবার সময় পাছে সে একটা কাণ্ড করিয়া বসে —এই ভাবিয়া তাহাকে ভুলাইয়া বেড়াইতে ও পরে সিনেমা দেখিতে লইয়া যাওয়া হয়।

চৌবেজী ও তাঁহার পুত্রের সহিত দেখা হইবার পূর্ব্বেই শান্তি প্রায়ই মথুরা যাইবার কথা বলিত—উঁহাদের সঙ্গে দেখা হইবার পর তাহার মথুরা যাইবার স্পৃহা আরও বলবতী হয় এবং বলিতে থাকে যে, তাহাকে মথুরা লইয়া গেলে সে রাস্তা চিনিয়া নিজের বাড়ী যাইতে পারিবে।

সে মথুরার সুপ্রসিদ্ধ বিশ্রামঘাট ও দ্বারিকাধীশের মন্দিরের বর্ণনা দেয় এবং তাহার পূর্ব্বজীবনের স্বামী পণ্ডিত কেদারনাথের বাড়ী রেল ষ্টেশনে নামিয়া যে যে রাস্তা দিয়া যাইতে হয়, তাহাও বলে—এবং মথুরার সুপ্রসিদ্ধ হোলী দরওয়াজার কথা বলে—তাহার নিকট মথুরা-শহরের বর্ণনা শুনিয়া মনে হইত যে, সে সত্য সত্যই মথুরা-শহরে ছিল, নতুবা অন্য কাহারও পক্ষে এরূপ সুন্দর বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়।

সে ইহাও বলে যে, মথুরায় দ্বারিকাধীশের মন্দিরের বিপরীত দিকেই চৌবেজীর কাপড়ের দোকান আছে। চৌবেজী দিল্লী আসিবার অনেক দিন পূর্ব্বে এবং চৌবেজী দিল্লী আসিলে তাঁহাকেও বলে যে, মথুরায় তাঁহার বাড়ীর একটি ঘরে সে কিছু টাকা প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে একশত টাকা মথুরার দ্বারিকাধীশের শ্রীবিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিবার সঙ্কল্প তাহার ছিল।

বাবু রং বাহাদুর বলিলেন—এখানে আর একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। শান্তি যখন প্রথম তাহার পূর্ব্বজীবনের স্বামীর কথা বলিতে আরম্ভ করে তখন তাহার মাতা তাহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা বেটী, তোমার স্বামী দেখিতে কেমন ও তাঁহার শরীরের কোন বিশেষ চিহ্নের কথা বলিতে পার কি? উত্তরে শান্তি বলে যে, তিনি দেখিতে গৌরবর্ণ, লেখাপড়া করিবার সময় মাঝে মাঝে চশমা ব্যবহার করেন এবং উঁহার বাঁ কানের পাশে গালের উপর একটি বড় আঁচিল আছে। চৌবেজী দিল্লীতে আসিলে তাঁহাকে দেখাইয়া শান্তি তাহার মাকে বলে—মা, আমি যে তোমাকে পূর্ব্বে তাঁহার চেহারার কথা বলিয়াছি যে, বাঁ কানের পাশে গালের উপর একটি বড় আঁচিল আছে, তাহা ঠিক কিনা এখন দেখিয়া লও।

পণ্ডিত কেদারনাথ স্ত্রী-পুত্রসহ দিল্লীতে পৌঁছিলে শহরে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শান্তি, পণ্ডিত কেদারনাথ ও তাঁহার পুত্রকে দেখিবার জন্য এত ভিড় হইতে লাগিল যে, তাহাতে বাটীস্থ সকলের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। পণ্ডিত কেদারনাথ বাড়ী হইতে বাহির হইলেই তাঁহাকে দেখিবার

জন্য ভীষণ ভিড় জমিয়া যাইত—তাহাতে তাঁহার পথ চলাই দুষ্কর হইয়া উঠিত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট লোকদের নিকট হইতে চৌবেজীর আমন্ত্রণ আসিতে লাগিল কিন্তু তিনি বিনয়ের সহিত উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি ভিড়-ভাড় পছন্দ করিতেন না।

সংবাদপত্রাদিতে শান্তির ফটো সহ বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা 'লিডারের' ১৯৩৫ সালের ২৯শে নবেম্বরের সংখ্যায় এই বালিকা সম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাহা ছাড়া, দিল্লী হইতে প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক 'হিন্দুস্থান টাইমস', 'ন্যাশনাল কল', হিন্দী দৈনিক 'অর্জ্জুন', 'নবযুগ', উর্দ্দু ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক 'তেজ' পত্রিকা, বম্বে হইতে প্রকাশিত 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া,' মথুরা হইতে প্রকাশিত 'ব্রজভূমি', এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রাদিতে শান্তির সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

বিভিন্ন পত্রিকাদিতে এই জন্মান্তরের সংবাদ প্রকাশিত হওয়াতে সেই সময়ে এই বিষয়ে—বিশেষ করিয়া দিল্লীতে—প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তখন এই সম্বন্ধে এতই আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল যে, দেশবরেণ্য নেতা মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে আকৃষ্ট হইয়া শান্তিকে নানাপ্রকার প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

দিল্লীতে এ-বিষয়ে জনমত এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, জনসাধারণের মধ্য হইতে প্রতিনিধিস্থানীয় পনর জন ব্যক্তিকে লইয়া এ বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয়ার্থ একটি অনুসন্ধান-কমিটি গঠিত হইল। এই কমিটিতে দৈনিক 'তেজ' পত্রিকার সম্পাদক ও বর্ত্তমানে ভারতীয় পার্লামেণ্টের সভ্য লালা দেশবন্ধু গুপ্ত, জাতীয় নেতা পণ্ডিত নেকীরাম শর্ম্মা, প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী লালা শ্রীরাম, বিখ্যাত এ্যাড্‌ভোকেট শ্রীতারাচাঁদ মাথুর প্রভৃতি ছিলেন। উক্ত কমিটি শান্তি দেবী সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া A Case of Re-incarnation নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। উক্ত কমিটির পক্ষ হইতে দিল্লীর মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়কে—যাঁহারা

জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী নন—বালিকাটি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে ও সম্ভব হইলে কমিটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত তথ্য বা মতামত যে মিথ্যা বা উহা অন্য কোন প্রকারেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে (that these facts can be explained away) তৎসম্বন্ধে মতামত জ্ঞাপনের সাদর আহ্বান জানান, কিন্তু দুঃখের বিষয়, উক্ত উভয় সম্প্রদায়ের কেহই কমিটির এই সাদর আহ্বানে সাড়া দেন নাই।

বাবু রং বাহাদুর বলিতে লাগিলেন—ইহার পর উক্ত অনুসন্ধান-কমিটি আমাদের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা আমার ও বালিকার মাতা সহ শান্তিকে সঙ্গে লইয়া মথুরা যাইতে চান। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চান যে, শান্তি তাহার পূর্ব্বজীবনের নিবাস-স্থল, আত্মীয়-স্বজন, রাস্তা-ঘাট, নিজেদের দোকান ও মন্দিরাদির যে বর্ণনা দিয়াছে তাহা সে নিজে সনাক্ত করিতে অর্থাৎ চিনাইয়া দিতে বা চিনিয়া লইতে পারে কিনা। শান্তির বয়স এখন নয় বৎসর মাত্র, জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতে সে কখনও দিল্লী-শহরের বাহিরে যায় নাই। সে যদি প্রথম বার মথুরা-শহরে পদার্পণ করিয়াই সেখানকার রাস্তা-ঘাট, বাড়ী ইত্যাদি নিজে চিনাইয়া দিতে পারে তাহা হইলে সে যে পূর্ব্বজীবনে সেখানে ছিল তাহা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয়। জন্মান্তরবাদে অনেকে বিশ্বাসী নন, কারণ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া দুরূহ। ইহজগতে আপাত-দৃষ্টিতে যে অসাম্য বা অসামঞ্জস্য দেখা যায়—যেমন অনেক সৎ বা পুণ্যবান্ ব্যক্তি ভীষণ কষ্টে কালাতিপাত করেন আবার পাপকর্ম্মা অনেকে সুখেই জীবন যাপন করে দেখা যায় কিম্বা কোন শিশু জন্মান্ধ বা খঞ্জ হইয়া জন্মগ্রহণ করিল—কেন এরূপ হয়? শিশুর পক্ষে কোন অন্যায়াচরণ তো সম্ভবে না, তবে তাহার এ শাস্তি কেন?—এই সব অসামঞ্জস্যকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ জন্মান্তরবাদরূপ থিয়োরী বা মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে ইহার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই—ইহাই অনেকের ধারণা। শান্তি যাহা বলিয়াছে, তাহা যদি

যথার্থ বলিয়া সকলের সমক্ষে প্রকাশিত হয়, তবে জন্মান্তরবাদ যে কেবল থিয়োরীমাত্র নহে—উহা যে বাস্তব সত্য, তাহা প্রমাণিত হইবে।

কমিটির সভ্যদের এই যুক্তি আমাদের অন্তর স্পর্শ করিল বটে কিন্তু শান্তিকে অন্য একটি বিশেষ কারণে মথুরা লইয়া যাইতে আমাদের একান্তই অনিচ্ছা ছিল। আমাদের মনে এই আশঙ্কাই জাগ্রত হইয়াছিল যে, শান্তি যদি মথুরায় গিয়া তাহার পূর্ব্বজীবনের স্বামী বা পুত্রকে ছাড়িয়া পুনরায় দিল্লীতে ফিরিয়া না আসিতে চায়, তবে মহা অনর্থ ঘটিবে। পণ্ডিত কেদারনাথ চৌবে ও তাঁহার পুত্র নবনীতলাল দিল্লীতে আসিলে তাঁহাদের প্রতি শান্তির প্রবল অনুরাগ ও তাঁহাদের সঙ্গে মথুরা যাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখিয়াই এই ধারণা আমাদের বদ্ধমূল হইয়াছে।

যাহা হউক, অবশেষে কমিটির সভ্যদের একান্ত অনুরোধ ও তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া আমরা শান্তি সহ মথুরায় যাইতে রাজী হইলাম। ১৯৩৫ সালের ২৪শে নবেম্বর কমিটির সভ্যগণসহ আমাদের মথুরা যাইবার দিন স্থির হইল।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বাবু রং বাহাদুর অনুসন্ধান-কমিটির প্রকাশিত পুস্তিকা একখণ্ড আমাকে আনিয়া দিলেন এবং আমাকে বলিলেন যে, ইহা পাঠ করিলেই আপনি সমস্ত ঘটনা জ্ঞাত হইতে পারিবেন। ঐখানে বসিয়াই উহা পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, বাবু রং বাহাদুর শান্তি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছেন তাহা সমস্তই উহাতে লিপিবদ্ধ আছে। ইহার পরের ঘটনাবলী উক্ত কমিটির প্রকাশিত পুস্তিকা হইতেই পাঠকগণকে জানাইব। তাহার পর এ বিষয়ে আমার নিজের অনুসন্ধানের কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

২৪শে নবেম্বর, ১৯৩৫ সালে শান্তি দেবী ও তাহার পিতামাতাসহ দিল্লীর দৈনিক তেজ-পত্রিকার স্বত্বাধিকারী লালা দেশবন্ধু গুপ্ত, পণ্ডিত নেকীরাম শর্ম্মা প্রভৃতি ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি মথুরা রওনা হইলেন। ফটো লইবার জন্য ফটোগ্রাফার সঙ্গে লওয়া হইল। ট্রেনে উঠিবার পর হইতেই

শান্তির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইল—তাহার মনোভাব লক্ষ্য করিবার জন্য। ট্রেনে উঠিবার পর হইতেই তাহাকে খুবই উৎফুল্ল দেখা গেল। প্রায় তিন ঘণ্টার পর ট্রেনখানি মথুরা রেলষ্টেশনের সমীপবর্ত্তী হইবার প্রাক্কালে তাহার চোখেমুখে অত্যন্ত আনন্দের ভাব প্রকটিত হইল এবং সে বলিয়া উঠিল যে, তাহারা যে-সময় মথুরা পৌঁছিবে (অর্থাৎ বেলা ১১টার পর) তখন দ্বারিকাধীশের মন্দিরের দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে—মথুরাবাসীর ভাষায় সে বলিল—"মন্দির কী পট বন্ধ্ হো যায়েঙ্গী।" তাহার এই উক্তির কারণ এই যে, তাহার মাতা রওনা হইবার সময় বলিয়াছিলেন যে, মথুরায় প্রথম পৌঁছিয়াই তিনি দ্বারিকাধীশের মন্দিরে যাইয়া প্রণামাদি সারিয়া তবে অন্যত্র যাইবেন। শান্তির এই উক্তির দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, দ্বারিকাধীশের মন্দির কখন বন্ধ হয় তাহা তাহার স্মরণে ছিল।

ট্রেনখানি মথুরা রেলষ্টেশন-প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে চারিদিকের দৃশ্য তাহার মনে বোধ হয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়া থাকিবে—তাহার মুখমণ্ডল সহসা গম্ভীরভাব ধারণ করিল এবং সে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—"মথুরা আগয়ী, মথুরা আগয়ী।"

শান্তির মথুরা-আগমনের বার্ত্তা প্রচারিত হওয়ায় ষ্টেশনে জনতা হইয়াছিল অসম্ভব, তাহার মধ্যে মথুরা-শহরের অনেক বিশিষ্ট লোকও ছিলেন। মথুরা ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্ম্মেই একটি বিশেষ ঘটনা বহু লোকের সমক্ষে সংঘটিত হয়। বালিকা শান্তি লালা দেশবন্ধু গুপ্তের ক্রোড়ে ছিল, এমন সময় প্রকাণ্ড লাঠি হস্তে, মস্তকে পাগড়ী-বাঁধা একজন ভদ্রলোক বালিকাটির সমক্ষে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তাহাকে চিনিতে পারে কিনা। তাঁহাকে দেখিয়াই শান্তি লালা দেশবন্ধু গুপ্তকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিতে বলিল এবং ক্রোড় হইতে নামিয়া সেই পাগড়ী-বাঁধা ভদ্রলোকের চরণযুগল স্পর্শ করিয়া পরম শ্রদ্ধা-ভরে প্রণাম করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল এবং লালা দেশবন্ধু গুপ্তের কানে কানে বলিল যে, ইনি আমার 'জেঠ' অর্থাৎ ভাসুর। সর্ব্বজনসমক্ষে এই ঘটনাটি হওয়াতে সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

সেই পাগড়ীধারী ভদ্রলোকের নাম ছিল "বাবুরাম চৌবে" এবং তিনি পণ্ডিত কেদারনাথ চৌবেরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আর পণ্ডিত কেদারনাথ চৌবেই শান্তির পূর্ব্বজীবনের স্বামী।

ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে বাহিরে আসিয়া লালা দেশবন্ধু গুপ্ত বালিকা শান্তিকে লইয়া একটি টাঙ্গায় উঠিলেন এবং টাঙ্গাওয়ালাকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, বালিকা যে যে রাস্তা দিয়া টাঙ্গা লইয়া যাইতে বলিবে, সেই সেই রাস্তা দিয়া যেন গাড়ী লইয়া যাওয়া হয়। ষ্টেশনে অনেকে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য মোটর লইয়া উপস্থিত ছিল এবং তাঁহাদের মোটরে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু মোটরে না যাইয়া তাঁহারা টাঙ্গায় উঠিলেন—এই কারণে যে, বালিকা দিল্লী থাকিতে প্রায়ই বলিত যে, মথুরায় গেলে পথ চিনিয়া সে আপনার পূর্ব্বজীবনের স্বামীর বাড়ীতে পৌঁছিতে পারিবে—মথুরা-শহরের হোলি দরওয়াজার কথা সে বলিত—মথুরার পথঘাট সত্যই তাহার পরিচিত কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই তাহাকে টাঙ্গা করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। শান্তির নির্দ্দেশমত টাঙ্গাওয়ালা অশ্ব চালনা করিয়া লইয়া চলিল। দূর হইতে হোলি দরওয়াজা দেখিয়া বলিল—ঐ হোলি দরওয়াজা দেখা যাইতেছে! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, দরওয়াজায় ঘড়ি লাগান আছে, ঐ দেখ ঘড়ি দেখা যাইতেছে! হোলি দরওয়াজার নিকট উপস্থিত হইয়া—কোন্ রাস্তা দিয়া তাহার বাড়ী পৌঁছিতে হইবে তাহা সে দেখাইয়া দিল। পথে যাইবার সময় বিভিন্ন অট্টালিকা ও রাস্তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে সে যথাযথ উত্তর দিয়াছিল। যেমন ষ্টেশন রোড সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে শান্তি বলিল যে, এই রাস্তা পূর্ব্বে পীচঢালা ছিল না, এখন হইয়াছে দেখিতেছি। পথপার্শ্বের কয়েকটি বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, এইসব বাড়ী পূর্ব্বে ছিল না, নূতন তৈয়ারী হইয়াছে।

হোলি দরওয়াজা পার হইয়া শান্তির প্রদর্শিত পথে টাঙ্গা চলিতে

চলিতে দুইটি গলির সংযোগস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। শান্তি এখানে সকলকে গাড়ী হইতে নামিতে বলিল। দুইটি গলির মধ্যে একটি বাজারের দিকে গিয়াছে, অপরটি তাহার পূর্ব্বজীবনের স্বামীর বাড়ীর দিকে গিয়াছে। বালিকা টাঙ্গা হইতে নামিয়া সেই গলি দিয়া পথ দেখাইয়া সকলকে লইয়া চলিল। গলি দিয়া পায়ে হাঁটিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতেই একজন ৭৫ বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে তাঁহার চরণে পরম ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিল—ইনি আমার শ্বশুর। তাহাদের আগমনবার্ত্তা পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়া চারিদিকের বাড়ীগুলি উৎসুক-আগ্রহাকুল নর-নারীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল—তাহারা ইহা দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সে তাহার বাড়ী দেখাইয়া দিল। সে দিল্লীতে প্রায়ই বলিত যে, তাহার মথুরার বাড়ী পিলা অর্থাৎ হলুদ রং-এর। বর্ত্তমান বাড়ীর রং আর হলুদ নাই, উহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ভাড়া দেওয়া হইয়াছে।

শান্তি যখন এ বাড়ীতে ছিল তখন এ বাড়ীর রং হলুদ বর্ণ ছিল, এ-বিষয় সন্দেহ নাই। শান্তি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। কোন্ ঘরে সে শয়ন করিত, কোন্ বাক্সে সে তাহার কাপড় ইত্যাদি রাখিত, রান্নাঘর ইত্যাদি সব যেন চির-পরিচিতের মত সকলকে দেখাইয়া দিল। শান্তি যখন এই বাড়ীতে যাইয়া পৌছিল তখন স্থানীয় বিশিষ্ট দুইজন ভদ্রলোক ঔৎসুক্য-বশতঃ অগ্রসর হইয়া আসিল এবং বালিকাটিকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিল, সে তাহার বাড়ীর জাজরুখানী দেখাইয়া দিতে পারে কিনা। দিল্লীবাসীদের নিকট "জাজরুখানী" শব্দটি একেবারেই গ্রীক বা ল্যাটিন অর্থাৎ সম্পূর্ণ অর্থহীন। ইহা কেবলমাত্র মথুরাবাসী চৌবে-সম্প্রদায়ের মধ্যে কথিত ব্যবহারিক শব্দ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া বালিকা প্রশ্নকারীকে বাড়ীর পায়খানা দেখাইয়া দিল। মনে হইল, যেন সে বাড়ীর প্রত্যেকটি কোণাকানাচি (creek and corner) ভালভাবেই চেনে।

পুনরায় বালিকাকে প্রশ্ন করা হইল—"কটোরা" কি বলিতে পার? "কটোরা" শব্দটিও মথুরার চৌবে-সম্প্রদায়ের মধ্যেই মাত্র প্রচলিত, এমনকি মথুরাবাসীদের মধ্যে চৌবে-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কেহও ইহার অর্থ জানে না। প্রশ্নকর্ত্তার এরূপ প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, বালিকা পূর্ব্বে কখনও মথুরায় আসে নাই বা চৌবে-পরিবারের কাহারও সহিত পরিচিত নহে, এমতাবস্থায় সে যদি চৌবে-পরিবারে প্রচলিত বিশেষ শব্দের অর্থ বলিতে পারে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে নিশ্চয়ই পূর্ব্বজীবনে চৌবে-পরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে বালিকা শান্তি বলিল যে—চৌবে-পরিবারে খাদ্যবস্তু "পরামঠে" অর্থাৎ পরেটাকে কটোরা বলে।

জনতার ভীড়ে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল বলিয়া বিশ্রামের জন্য শান্তিকে জব্বলপুরওয়ালী ধর্ম্মশালায় আনা হইল। সেখানেই তাহাদের সকলের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু শান্তিকে দেখিবার জন্য মথুরাবাসীদের আগ্রহ এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, স্বল্পকাল মধ্যেই ধর্ম্মশালা জনারণ্যে পরিণত হইল। সেই সমবেত জনতার মধ্য হইতে পঁচিশ বর্ষ বয়স্ক এক যুবককে সে আপনার পূর্ব্বজীবনের সহোদর ভ্রাতা বলিয়া চিনিতে পারে এবং অপর একজন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে নিজের 'খুড়শ্বশুর' বলিয়া চিনিয়া লয়।

দ্বিপ্রহরের পরে যাহারা দিল্লী হইতে শান্তির সঙ্গে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একজন তাহাকে কাঁধে করিয়া বেড়াইতে লইয়া চলিল। মথুরা-শহরের 'নগরা পইসা' মহল্লার তাহার যে বাড়ীর কথা সে দিল্লী থাকিতে প্রায়ই বলিত এবং যে বাড়ীতে সে তাহার পূর্ব্বজীবনের স্বামী পণ্ডিত কেদারনাথের সঙ্গে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়াছে—পথ দেখাইয়া সেই বাড়ীতে লইয়া যাইবার কথা শান্তিকে বলা হইল। স্কন্ধারূঢ় শান্তি পথ দেখাইয়া এক গলির মোড়ে কাঁধ হইতে নামিয়া এক বাটীতে প্রবেশ করিল এবং বলিল, এই তাঁহার বাড়ী। দিল্লী থাকিতে সে বলিত যে, এই বাড়ীর অঙ্গনের এক কোণে একটি কুয়া আছে, সেই কুয়া হইতে জল তুলিয়া সে স্নান

করিত। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি যে বলিতে আঙ্গিনায় কূয়া আছে এবং সেই কূয়া হইতে জল তুলিয়া তুমি স্নান করিতে, কৈ অঙ্গনে তো কূয়া দেখিতেছি না? বালিকা বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া ম্লানমুখে অঙ্গনের এক কোণায় যাইয়া পদস্থাপন করিয়া বলিল, "কূয়া তো এখানেই ছিল"। সেই স্থানের পাথর সরাইয়া দেখা গেল, তাহার নীচে কূয়া রহিয়াছে। উহা পরে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ইহার পর সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া নিজে যে-ঘরে সে শয়ন করিত সেই ঘরে প্রবেশ করিল। এদিক ওদিক চাহিয়া একটি স্থান দেখাইয়া বলিল, এখানে আমার টাকা পোঁতা আছে, খনন করিলে টাকা পাওয়া যাইবে। তাহার কথানুসারে সেই স্থান খনন করা হইল। পাথরের নীচে টাকা রাখিবার একটি কৌটা পাওয়া গেল বটে কিন্তু তাহাতে টাকা ছিল না। বালিকা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে বলিল—আমি টাকা এখানে রাখিয়াছিলাম, কিন্তু কেহ নিশ্চয় এখান হইতে উঠাইয়া লইয়াছে। তখন পণ্ডিত কেদারনাথ চৌবে বলিলেন—শান্তি, পূর্ব্বজীবনে তুমি আগ্রা হাসপাতালে যাইবার প্রাক্কালে এখানে টাকা পুঁতিয়া রাখিয়া গিয়াছিলে, আগ্রা হাসপাতাল হইতে তুমি আর এ বাড়ীতে ফিরিয়া আস নাই, সেখানেই তুমি মারা যাও, তোমার দেহত্যাগের পর আমি এইস্থান হইতে সেই টাকা উঠাইয়া লইয়াছি। বাবু কেদারনাথের এই কথা শুনিয়া শান্তি সন্তোষ প্রকাশ করিল।

কিছুক্ষণ বাদে শান্তি যমুনা নদীতে স্নান করিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহাকে লইয়া সকলে যমুনা নদীতে যাইবার আয়োজন করিলে সে বলিল—এই বাড়ীর একতলার কোণার ঘরে বাক্সে তাহার যে কাপড় আছে সেই কাপড় সঙ্গে লওয়া হউক। তাহার ইচ্ছানুসারে তাহাই করা হইল।

নগরা-পইসা মহল্লার এই বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় শান্তিকে খুবই হর্ষোৎফুল্ল দেখা গিয়াছিল, কিন্তু এই বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইবার

সময় তাহাকে খুবই বিমর্ষ দেখা গেল। যাহা হউক, তাহাকে সঙ্গে লইয়া সকলে রাস্তা দিয়া যমুনা নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দিল্লীতে অবস্থানকালে সে তাহার পূর্ব্বজীবনের স্বামী, পুত্র প্রভৃতির কথাই পুনঃ পুনঃ বলিত কিন্তু তাহার পূর্ব্বজীবনের পিতামাতা বা ভ্রাতাভগ্নি কাহারও কথা কখনও উল্লেখ করে নাই বা তাহাদের কথা যে তাহার স্মরণে আছে—তাহার পরিচয়ও কখনও পাওয়া যায় নাই। রাস্তা দিয়া যমুনা নদীতে যাইবার সময় হঠাৎ একস্থানে থামিয়া একটি বাড়ী দেখাইয়া সঙ্গী-সকলকে বলিল যে, সে এই বাড়ীতে যাইবে। এ বাড়ীতে সে যাইবে কেন, ইহা কাহার বাড়ী—এরূপ প্রশ্ন করা হইলে বালিকা বলিল যে, ইহা আমার পূর্ব্বজীবনের পিতামাতার বাড়ী। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই বাড়ীর মধ্যে তখন প্রায় ৪০।৪৫ জন নরনারী উপস্থিত ছিল, তাহার মধ্য হইতে আপন মাতাকে চিনিয়া লইয়া তাহার ক্রোড়ে আরোহণ করিল এবং তাহার মাতাও তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। বালিকার পিতাও শোকাবেগে অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শান্তির সঙ্গিগণের ও উপস্থিত সকলেরই চক্ষু বাষ্পাপ্লুত হইয়া উঠিল এবং অনেকে বলিতে লাগিল, "পূর্ব্বজীবনের ঘটনা স্মরণে না থাকাই বোধ হয় ভাল।" বালিকার সঙ্গিগণ বলিতে লাগিলেন, বালিকাকে মথুরায় আনিয়া তাঁহারা গুরুতর দায়িত্ব ঘাড়ে লইয়াছেন। পিতামাতার ক্রোড় হইতে বালিকাকে নামাইয়া আনিতে সঙ্গিগণের বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছিল। পিতামাতা কেহই বালিকাকে ছাড়িতে চাহেন না—সঙ্গীরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। অবশেষে একরূপ জোর করিয়াই পিতার ক্রোড় হইতে বালিকাকে ছিনাইয়া লইয়া আসিতে হইল। বালিকার পিতামাতা বা তাহাদের বাড়ী সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করা আর কোনও প্রকারে সম্ভব হইল না।

যাহা হউক, সকলে বালিকাকে সঙ্গে লইয়া বাজার মশজিদ্ হইয়া

চৌক বাজারে পৌঁছিয়া যমুনা নদীতীরের প্রসিদ্ধ বিশ্রামঘাটে আসিয়া পৌঁছিলেন। রাস্তায় আসিবার সময় একটি ঘাট দেখাইয়া বলিল, ইহার নাম স্বামীঘাট, এখানে পাণ্ডারা দাঁড়াইয়া থাকে। সঙ্গীদের মধ্যে একজন ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—"তুম্ ভী তো পণ্ডে হো!" তাহার উত্তরে বালিকা বলিল, "হমারা ঘাট দুসরা হৈ।"

দিল্লী থাকিতে শান্তি বিশ্রামঘাটের কথা প্রায়ই বলিত এবং বলিত যে, সে পূর্ব্বজীবনে এই ঘাটেই স্নান করিত। এই ঘাটে পৌঁছিয়া সে যেন পরম শান্তি অনুভব করিতে লাগিল এবং সে কিছুকাল এই ঘাটে বসিয়া থাকিবে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহার গলায় অনেকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করিয়াছিল, সেই মালা হইতে ফুল লইয়া সে যমুনা নদীতে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিল এবং হাত জোড় করিয়া যমুনা মাতাকে প্রণাম করিল।

ইহার পর বালিকাকে অসকুণ্ডা বাজারে লইয়া যাওয়া হইল, দূর হইতে সে শ্রীদ্বারিকাধীশের মন্দির দেখাইয়া দিল এবং শ্রীদ্বারিকাধীশের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানাইল। শ্রীদ্বারিকাধীশের মন্দিরের বিপরীত দিকে অসকুণ্ডা বাজারে পণ্ডিত কেদারনাথের কাপড়ের দোকান ছিল—দোকান সে সময় বন্ধ ছিল—শান্তি সকলকে তাহার স্বামীর দোকান দেখাইয়া দেয়। শান্তির আগমনের সংবাদ বিদ্যুদ্‌বেগে প্রচারিত হইল। চতুর্দ্দিক্ হইতে নরনারী তাহাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। ভীড়ের চাপে সঙ্গিগণের অনেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, অনেকের পরিধেয় বসন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। অতিকষ্টে বালিকাকে একটি মোটরে উঠাইয়া লইয়া লালা দেশবন্ধু পণ্ডিত, নেকীরাম শর্ম্মা, কিশোরীরমণ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় অভিমুখে রওনা হইলেন। সেখানে বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে একটি সভা পূর্ব্ব হইতেই আহূত হইয়াছিল। বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে প্রায় দশ হাজার নরনারী বালিকা শান্তিদেবী সম্বন্ধে তথ্যাদি জ্ঞাত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বেলা ৪-৩০ মিনিটের সময় সভা আরম্ভ হইল।

বালিকাকে একটি উচ্চ বেদীর উপর দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল— যাহাতে সকলেই তাহাকে দেখিতে পারে। পণ্ডিত নেকীরাম শর্ম্মা উঠিয়া শান্তি দেবীর সমস্ত কথা শ্রোতৃমণ্ডলীকে জানাইলেন এবং মথুরায় আসিয়া তাঁহারা স্বচক্ষে যাহা দেখিলেন তাহার অভিজ্ঞতা তাঁহাদের নিকট বর্ণনা করিলেন।

বক্তৃতান্তে মথুরাবাসীদের মধ্যে অনেক ভদ্রলোক শান্তি দেবীকে মথুরায় কয়েকদিন রাখিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। তাঁহাদের সে অনুরোধ রক্ষা করা তাহার সঙ্গিগণের পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব হইল না। বালিকা নিজেও সঙ্গিগণকে মথুরায় তাহাকে রাখিয়া যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাইয়াছিল। দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শান্তিকে অত্যন্ত বিমর্ষ ও শ্রান্ত দেখা যাইতেছিল এবং ট্রেনে উঠিবার অল্পক্ষণ পরেই সে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

জাতিস্মর বালিকা শান্তি দেবী সম্বন্ধে তাহার পিতা বাবু রং বাহাদুরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলিতে লাগিল এবং আমি তাঁহাকে যে-সব প্রশ্ন করিলাম তাহার তিনি উত্তর দিতে লাগিলেন। সাধারণতঃ পূর্ব্বজীবনের স্মৃতি কাহারও থাকে না—এই বালিকা সম্বন্ধে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। জন্মদান সময়ে পিতামাতার মনোভাবের সঙ্গে কোন সংশ্রব আছে কিনা তাহা জানিবার জন্যই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিলাম।

প্রঃ। আচ্ছা, জীবনের প্রথম হইতেই আপনার ঝোঁক কোন্ দিকে বেশী ছিল? ধর্ম্মের দিকে কি?

উঃ। হ্যাঁ, তাই। আমার বাল্যকাল হইতেই ঐদিকে খুবই ঝোঁক।

প্রঃ। আপনার স্ত্রী সম্বন্ধেও কি সেই কথা প্রযোজ্য?

উঃ। আমার স্ত্রী আমাপেক্ষাও ধর্ম্মশীলা।

প্রঃ। শান্তির জন্মমুহূর্ত্তে কিরূপ চিন্তার প্রাবল্য ছিল বলিতে পারেন কি?

উঃ। না, তাহা বলিতে পারি না।

প্রঃ। বালিকার জন্মের পূর্ব্বে কোন স্বপ্ন আপনি বা তাহার মাতা দেখিয়াছিলেন কি ?

উঃ। মনে তো পড়ে না।

প্রঃ। বালিকার পূর্ব্বজীবনের সহিত সম্বন্ধান্বিত ব্যক্তিগণের সহিত আপনার বা আপনাদের কাহারও কোন পরিচয় ছিল কি ?

উঃ। কখনও না। তাহাদের কথা আমরা পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই বা কোন দিন মথুরায় যাইবার অবকাশও ঘটে নাই।

প্রঃ। আপনার পুত্র-কন্যা কয়টি ?

উঃ। তিনটি কন্যা, একটি পুত্র। পুত্র লালজী সর্ব্বকনিষ্ঠ। শান্তি আমার তৃতীয় সন্তান, প্রথমা কন্যার বিবাহ হইয়াছে। প্রথমা কন্যার বয়স ২২ বর্ষ হইয়াছে। শান্তি বিবাহ করিবে না বলিয়াছে।

প্রঃ। পুত্র-কন্যাদের মধ্যে চেহারার সৌসাদৃশ্য আছে কি ?

উঃ। দুই কন্যা ও পুত্রের মধ্যে সৌসাদৃশ্য আছে, কিন্তু শান্তির চেহারার সহিত আর কাহারও সাদৃশ্য নাই।

ইতিমধ্যে শান্তি বাহির হইতে আসিয়া আমার নিকট বিছানায় বসিল এবং আমাকে নমস্কার জানাইল। তখন আমি শান্তিকে প্রশ্ন করিলাম—

প্রঃ। তোমার কিসে মৃত্যু হইয়াছিল তাহা মনে আছে কি ?

উঃ। হ্যাঁ, মনে আছে। সন্তান-প্রসবের দশ দিন পরে আমার মৃত্যু হয়; সন্তান-প্রসবই মৃত্যুর কারণ হয়।

প্রঃ। ছেলে কয়টি ?

উঃ। আমার একই মাত্র ছেলে।

প্রঃ। মৃত্যুর সময় তোমার কিরূপ বোধ হইয়াছিল তাহা স্মরণে আছে কি ?

উঃ। হ্যাঁ, ঠিক মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে গভীর অন্ধকার অনুভব করিলাম, তাহার পরই উজ্জ্বল জ্যোতি দেখিতে পাইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুভব

করিলাম যে, ধোঁয়ার মত হইয়া আমি আমার দেহ হইতে বাহির হইয়া আসিলাম এবং উপরে উঠিতে লাগিলাম।

প্রঃ। তুমি তোমার মৃতদেহ দেখিতে পাইলে না?

উঃ। না, আমি সেদিকে আর নজরই করি নাই।

প্রঃ। তারপর কি হইল?

উঃ। তারপর দেখিলাম যে, চারজন পিলা অর্থাৎ গেরুয়া পরিচ্ছদ পরিহিত লোক আমাকে লইবার জন্য আসিল।

প্রঃ। সেই চারজন লোকের পোষাক-পরিচ্ছদ ও আকৃতি কি একই প্রকারের ছিল, না কিছু ভেদ ছিল?

উঃ। তাহাদের আকৃতি ও পোষাক-পরিচ্ছদ একই প্রকারের ছিল। আমি তাহাদের প্রভেদ মোটেই বুঝিতে পারি নাই।

প্রঃ। যে চারজন লোক তোমাকে লইয়া গিয়াছিল বলিতেছ—তাহারা কি তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল?

উঃ। সেই চারজন লোক আমাকে একটি কটোরার (বাটির) মতন জিনিষের উপর বসাইয়া লইয়া চলিল।

প্রঃ। যে বাটিতে তোমাকে তাহারা বসাইয়া লইয়া চলিল, তাহার আকার কত বড় হইবে বলিতে পার কি?

উঃ। উক্ত বাটি আধ হাত পরিমাণ চওড়া হইবে।

প্রঃ। সেই চারজন গেরুয়া পরিচ্ছদধারী ব্যক্তিকে তুমি দেহ হইতে বহির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখিলে, না ধূম্ররূপে কিয়দ্দূর ঊর্দ্ধে উঠিলে পর উহাদের সঙ্গে তোমার দেখা হইল?

উঃ। আমি ধূম্ররূপে কিছুদূর ঊর্দ্ধে উঠিলে পর উহাদের সঙ্গে দেখা হইল।

প্রঃ। উহাদের মধ্যে কাহারও হাতে আর কিছু ছিল কি?

উঃ। উপরোক্ত বাটির মত জিনিষ ব্যতীত তাহাদের হাতে আর কিছুই ছিল না।

প্রঃ। তাহারা তোমাকে লইয়া কোথায় গেল ?

উঃ। তাহারা আমাকে লইয়া প্রথম প্রকাশে অর্থাৎ স্তরে গেল.

প্রঃ। তাহার পর কি হইল ?

উঃ। প্রথম স্তরে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা বলিলেন—ইহার স্থান আরও ঊর্দ্ধে।

প্রঃ। তারপর ?

উঃ। তাহারা এইরূপে আমাকে প্রথম হইতে চতুর্থ প্রকাশে বা স্তরে লইয়া গেল।

প্রঃ। তাহারা কি সব সময় তোমার সঙ্গে ছিল ? তাহাদের সঙ্গে তোমার শেষ দেখা কোথায় ?

উঃ। তাহারা প্রথম হইতে চতুর্থ প্রকাশ (স্তর) পর্য্যন্ত সঙ্গে ছিল। তাহারা আমাকে দ্বারিকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া উপবেশন করিল। পরে দ্বারিকাধীশ আদেশ করিলে তাহারা আমাকে লইয়া একটি সিঁড়ির মত স্থানে বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহারা কোথায় গেল তাহা জানি না।

প্রঃ। আচ্ছা, সেই সব প্রকাশ বা স্তরে থাকিবার কোন স্থান আছে কি ? যেমন এখানে অর্থাৎ এই পৃথিবীতে মনুষ্যের বাসোপযোগী গৃহাদি আছে—এরূপ কিছু আছে কি ?

উঃ। না, দালান বা গৃহাদি বা ঐরূপ কিছু সেখানে নাই। সব বিস্তৃত ফাঁকা ময়দান—একদিকে প্রবেশের জন্য খোলা আর তিন দিক্ দেয়াল দ্বারা ঘেরা।

প্রঃ। আচ্ছা, দ্বিতীয় প্রকাশ বা স্তরটি কিরূপ ?

উঃ। দ্বিতীয় স্তরের বিরাট ময়দানে একটি বৃহৎ শূন্য সিংহাসন রহিয়াছে দেখিলাম—আর অনেক সাধু—স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই in the form of light (জ্যোতির আকারে) দেখিলাম। তাঁহারা বলিলেন, ইহাকে ঊর্দ্ধতর স্তরে লইয়া যাইতে হইবে।

প্রঃ। তৃতীয় স্তরে কি দেখিলে?

উঃ। তৃতীয় স্তরের ময়দানে কোন সিংহাসন দেখিলাম না। অনেক সাধু রহিয়াছেন—স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই—তাঁহাদের আকৃতি পূর্ব্বস্তরের অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরের অধিবাসী অপেক্ষা আরও অধিক জ্যোতির্ম্ময়। তাঁহারাও আমাকে আরও ঊর্দ্ধস্তরে লইয়া যাইতে বলিলেন। তারপর চতুর্থ স্তরে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে, আরও জ্যোতিষ্মান্ সাধুসন্তগণ বসিয়া আছেন, আর তাহার মধ্যস্থলে একটি বিরাট সিংহাসনে দ্বারিকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ-মহারাজ বিরাজ করিতেছেন। তিনি প্রত্যেককে তাহার পরচা দেখাইতেছেন—তাহাতে তাহারা কি কি করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে তাহাদের কি অবস্থা হইবে তাহা বর্ণিত আছে।

প্রঃ। আচ্ছা, দ্বারিকাধীশ তোমাকে কিছু বলিলেন কি?

উঃ। তিনি আমাকে আমার পরচা দেখাইয়া বলিলেন যে, আমাকে পুনরায় দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহাই হইবে আমার শেষ জন্ম।

প্রঃ। দিল্লীতে তোমাকে কোথায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে তাহা শ্রীকৃষ্ণ-মহারাজ তোমাকে কিছু বলিয়াছিলেন কি?

উঃ। হ্যাঁ, তিনি আমার বর্ত্তমান পিতাজী শ্রীরং বাহাদুর মাথুরের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তোমাকে তাঁহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

প্রঃ। তারপর কি হইল?

উঃ। তারপর সেই চারজন ব্যক্তি আমাকে লইয়া একটি উজ্জ্বল চাকচিক্যময় সিঁড়ির মত স্থানে লইয়া গিয়া সেখানে বসাইয়া দিল।

প্রঃ। সেখানে আর কাহারও সহিত তোমার দেখা হইয়াছে কি?

উঃ। সেখানে থাকাকালীন অনেক রূহ্ বা আত্মার সহিত আমার দেখা হইয়াছে, এখন আমি তাহাদিগকে চিনিতে পারি না।

প্রঃ। আচ্ছা, যে স্তরে তুমি ছিলে সেখানে চন্দ্র-সূর্য্য আছে কি?

উঃ। না, চন্দ্র বা সূর্য্য বলিয়া কিছুই নাই।

প্রঃ। তাহা হইলে আলো বা অন্ধকার বলিয়া সেখানে কিছু নাই কি?

উঃ। অন্ধকার বা রাত্রি বলিয়া কিছু নাই। সবই আলোকময়, অতি স্নিগ্ধ—পূর্ণচন্দ্রমার আলোর সহিত তাহার কিয়ৎ পরিমাণে তুলনা হইতে পারে মাত্র। সেখানে all day and all night very mild, soothing, enlivening light.

প্রঃ। আচ্ছা, সেখানে তুমি কতকাল বসিয়াছিলে বলিতে পার কি? সময়ের কোন বোধ ছিল না?

উঃ। না, সেখানে কতকাল ছিলাম বলিতে পারি না, কারণ সময়ের বোধ বলিয়া সেখানে কিছু অনুভব করিতে পারি নাই।

প্রঃ। তুমি যেখানে ছিলে তাহারও ঊর্দ্ধে আরও কোন স্তর আছে কিনা তাহা তোমার অনুভবে বা লক্ষ্যে আসিয়াছিল কি?

উঃ। হ্যাঁ, আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম এবং অনুভব করিলাম, যেন ইহারও ঊর্দ্ধে আরও স্তর আছে, তবে সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে পারি না।

শান্তির সঙ্গে অতঃপর তাহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

প্রঃ। আচ্ছা, ঊর্দ্ধস্তরে তুমি যে-সব সাধুর আত্মা দেখিয়াছ বলিতেছ, তাহাদের মধ্যে কোন মুসলমান বা খৃষ্টান সাধুর আত্মা দেখিয়াছ কি?

উঃ। সেখানে তো হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভেদের কোন অবকাশ নাই; সবই একপ্রকার শান্তসমাহিতভাব। তবে আমি চতুর্থ স্তরে দ্বারিকাধীশের সিংহাসনের পাশে লম্বা দাড়িওয়ালা একজনকে দেখিয়াছি।

প্রঃ। তাহার পর কি হইল?

উঃ। সেই সিঁড়িতে কিছুকাল অবস্থানের পর আমাকে একটি অন্ধকার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। তাহার চারিদিকে নানা পূতিগন্ধময় জিনিষ, তাহা হইতে ভীষণ দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল; তাহার মধ্যে একটু পরিষ্কার স্থানে আমাকে বসাইয়া শোয়াইয়া দেওয়া হইল।

প্রঃ। তুমি দেহ হইতে কি আকারে বহির্গত হইয়াছিলে এবং সেই অন্ধকার ঘরে কি আকারেই বা প্রবেশ করিলে?

উঃ। আমি দেহ হইতে খুব ছোট আকারে বাহির হইয়াই চতুর্থ স্তরে গিয়াছিলাম এবং সেই অবস্থাতেই আবার আঁধার ঘরে প্রবেশ করি।

প্রঃ। মৃত্যু-সময়ে তোমার খুব যন্ত্রণা বোধ হইয়াছিল কি? বা সেই সময়ে কিছু দেখিতে পাইয়াছিলে কি?

উঃ। মৃত্যু-সময়ে আমি কোন যন্ত্রণা বোধ করি নাই। আমি simply passed into unconcious state, আর সেই সময় খুব brilliant light দেখিয়াছিলাম।

প্রঃ। আচ্ছা, চতুর্থ স্তরে যখন ছিলে তখন অন্যান্য আত্মাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে কি? ক্ষুধাতৃষ্ণা ছিল কি? ঘুম ছিল কি? সুখ-দুঃখ-বোধ বলিয়া কিছু ছিল কি?

উঃ। সেই স্তরে কেহই কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা বলে না— সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। সেখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রা কিছুই নাই। সুখের বোধও নাই, দুঃখের বোধও নাই।

প্রঃ। চতুর্থ স্তর হইতে নিম্নে আসিয়া তোমার সেখানে ফিরিয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা হইত না কি?

উঃ। হ্যাঁ, প্রথম প্রথম খুবই ইচ্ছা হইত।

প্রঃ। আচ্ছা, পূর্ব্বজীবনে তুমি কাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিতে?

উঃ। আমার ছেলেকেই খুব বেশী ভালবাসিতাম।

প্রঃ। মৃত্যুর সময়ে তোমার ছেলের কথা মনে হইয়াছিল কি?

উঃ। না, ছেলের কথা মনে হয় নাই।

প্রঃ। তোমার বর্ত্তমান পিতার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথমে তোমার কি মনে হইত?

উঃ। আমার মনে হইত, যেন এ-বাড়ী আমার না, আমার বাড়ী

অন্তস্থানে এবং সেই বাড়ীতে যাইবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইত, এখন আর সেরূপ হয় না।

প্রঃ। তোমার পূর্ব্বজীবনের স্মৃতি কি ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিতেছে, না পূর্ব্বের ন্যায় সজাগ আছে?

উঃ। না, একটুকুও ম্লান হয় নাই, পূর্ব্বের ন্যায় সজাগ আছে। মনে হয় যেন গতকল্যকার ঘটনা।

প্রঃ। পূর্ব্বজীবনে তুমি কাহারও পূজা করিতে কি?

উঃ। হ্যাঁ, দ্বারিকাধীশের পূজা করিতাম, এখনও করি।

প্রঃ। পূর্ব্বজীবনে পড়াশুনা কিছু করিয়াছিলে কি?

উঃ। হ্যাঁ, বাড়ীতে গীতা, রামায়ণ, উপনিষদ্ পড়িয়াছিলাম। রামায়ণই আমার সব চাইতে ভাল লাগিত।

প্রঃ। আচ্ছা, তোমার গত জীবনের স্মৃতি বর্ত্তমান মাতার গর্ভে অবস্থানকালীনও কি সজাগ ছিল?

উঃ। হ্যাঁ, গর্ভ মধ্যেও সজাগ ছিল এবং গর্ভ হইতে বাহির হইবার পরও সজাগ ছিল, কিন্তু তখন তো কথা বলিতে পারিতাম না। যখন হইতে কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম তখন হইতেই পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধীয় কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম।

তৎপরদিন বুধবার প্রাতে উঠিয়া পুনরায় বাবু রং বাহাদুরের বাড়ীতে গেলাম। তাঁহার পুত্র লালজী বলিল, পিতাজী বাড়ীতে নাই। লালজী আমাকে সঙ্গে করিয়া নিকটে একটি লাইব্রেরীতে লইয়া গেল। বাবু রং বাহাদুর সেখানে ছিলেন, আমাকে দেখিয়া উঠিয়া আসিলেন। বাড়ী আসিয়া শান্তি তাহার পিতার সঙ্গে যে ফটো তুলিয়াছে তাহার একখানা ফটো ও শান্তি দেবী সম্বন্ধে ইংরাজী ও হিন্দীতে প্রকাশিত দুইখানি বহি আমাকে দিলেন। তাহার পর সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া সীতারাম বাজারে কবিরাজ পণ্ডিত ঘনানন্দ পন্থের ঔষধালয়ে আসিলাম। তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনায় জানিতে পারিলাম যে, ষ্টেট্সম্যান

পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক বাবু নন্দলাল মুখার্জী এ-বিষয়ে অনেক খবর দিতে পারেন। এই কথা শুনিয়া বারখাম্বা রোডে ষ্টেটস্‌ম্যান অফিসে তাঁহার খোঁজে গেলাম। শুনিলাম যে, তাঁহার নাইট ডিউটি—তাই বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, তখন বেলা দেড়টা।

পরদিন শরীর একটু অসুস্থ বোধ করাতে আর কোথায়ও বাহির হইলাম না, সেদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম। তৎপরদিন প্রাতে উঠিয়া স্নানাদি সমাপনান্তে বাবু রং বাহাদুরের বাড়ীতে গেলাম। তিনি আমাকে দোতলায় লইয়া গেলেন এবং শান্তিকে আমার জন্য একগ্লাস সরবৎ আনিতে বলিলেন এবং ভবিষ্যতে দিল্লীতে আসিলে তাঁহাদের বাড়ীতে অবস্থান করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ জানাইলেন। শান্তি সরবৎ লইয়া আসিলে উহা পানান্তে শান্তির সহিত পুনরায় নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা হইল।

প্রঃ। আচ্ছা, সেই চারিজন লোক তোমাকে দ্বারিকাধীশের নিকট যখন পৌঁছাইয়া দিল, তখন তিনি তোমাকে কি বলিলেন?

উঃ। তিনি আমাকে আমার পরচা দেখাইলেন এবং বলিলেন যে, তোমাকে আবার দিল্লীতে রং বাহাদুরের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহাই তোমার শেষ জন্ম হইবে।

প্রঃ। তারপর?

উঃ। সেই চারিজন লোক আমাকে পূর্ব্বোক্ত staircase-এর নিকট লইয়া গিয়া আমাকে সেখানে বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি সেখানে একাই বসিয়াছিলাম। নামিবার সময় আবার সেই চারিজন লোক আসিয়া আমাকে নামিতে বলিল—তারপর আমি নিজেই নামিতে লাগিলাম।

প্রঃ। দ্বারিকাধীশজী তোমার পিতার নাম করিয়াছিলেন, তোমার ভাবী মাতার নামও করিয়াছিলেন কি?

উঃ। না, মাতার নাম করেন নাই, শুধু পিতার নাম করিয়াছিলেন।

প্রঃ। আচ্ছা, উঠিবার ও নামিবার সময় তুমি কি এক পথ দিয়াই যাতায়াত করিলে?

উঃ। না, উঠিবার সময় আলোর পথ দিয়া উঠিয়াছিলাম আর নামিবার সময় অন্ধকারময় পথ দিয়া নামিয়া অসিলাম।

প্রঃ। আচ্ছা, তোমাকে যে সিঁড়িতে বসাইয়া দিয়াছিল, সেই সিঁড়ি কি আরও উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছিল বলিয়া বোধ করিতে পারিলে?

উঃ। হ্যাঁ, খুব উঁচু ছিল, আরও উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছিল, কতদূর পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না—কারণ আরও উর্দ্ধে তো আমি আর যাই নাই।

প্রঃ। গত জীবনে কাহার চিন্তা তোমার মনকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় অধিকার করিয়া থাকিত?

উঃ। প্রথমে স্বীয় মাতার চিন্তা পরে দ্বারিকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ-মহারাজের চিন্তাই মনকে অধিকাংশ সময় অধিকার করিয়া থাকিত।

প্রঃ। মৃত্যুর সময় কি হইল? সে সময় কাহার চিন্তা করিয়াছিলে? তোমার স্বামীর না পুত্রের? সে সময় তোমার নিকটে কেহ ছিল কি?

উঃ। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি জপ করিতেছিলাম। মৃত্যুর সময় দ্বারিকাধীশের চিন্তা আমার মনের মধ্যে উদিত হইয়াছিল। মৃত্যুসময়ে কেহ আমার নিকটে ছিল না।

প্রঃ। তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলে যে, দেহ হইতে বাহির হইবার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে তুমি brilliant light দেখিয়াছিলে—আচ্ছা, সেই সঙ্গে দ্বারিকাধীশের মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলে কি?

উঃ। না, শুধু আলোই দেখিয়াছি, দ্বারিকাধীশের মূর্ত্তি দেখি নাই।

প্রঃ। পূর্ব্বজীবনে তুমি অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলে কি? কোন্ কোন্ তীর্থে গিয়াছিলে তাহা তোমার মনে আছে কি?

উঃ। হ্যাঁ, আমি হরিদ্বার, হৃষীকেশ, বদ্রীনাথ, রামেশ্বর ও দ্বারকায় গিয়াছিলাম।

প্রঃ। যে যে তীর্থে তুমি গিয়াছিলে সেই সব তীর্থে লইয়া গেলে তুমি কোথায় কি ভাবে ছিলে সব বলিয়া দিতে পার কি?

উঃ। হ্যাঁ, সব পারি, সবই আমার মনে আছে।

প্রঃ। যে সব তীর্থস্থানে তুমি গিয়াছিলে তাহার মধ্যে কোন্ তীর্থস্থান তোমার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল ?

উঃ। দ্বারকা।

প্রঃ। আচ্ছা, পূর্ব্বজীবনে তোমার কোন কঠিন ব্যাধি হইয়াছিল কি না তাহা তোমার মনে আছে কি ?

উঃ। হ্যাঁ, মনে আছে। হরিদ্বারে থাকাকালীন শীতকালে আমি "হরকী পিঁড়ি" প্রত্যহ ১০৮বার পরিক্রমা করিতাম। তাহাতে পায়ে ঠাণ্ডা লাগিয়া হাড়ে ব্যথা হয়। পরে পরিক্রমা করিতে করিতে একদিন একটা হাড়ের টুকরা পায়ের তলায় ফুটিয়া যায় (যে স্থানে হাড় বিদ্ধ হইয়াছিল, পায়ের ঠিক সেই স্থান অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিল)। তাহাতে আমি পূর্ণ একবৎসর ভুগি। প্রকৃতপক্ষে আমার এই ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে আর আরোগ্যই হয় নাই।

প্রঃ। উহা চিকিৎসার জন্য কোথায়ও গিয়াছিলে কি ?

উঃ। হ্যাঁ, আগ্রা-হাসপাতালে গিয়াছিলাম।

প্রঃ। আচ্ছা, তোমার যখন মৃত্যু হয়, তখন তোমার পুত্র মাত্র দশ দিনের ছিল আর তাহার যখন দশ বৎসর বয়স তখন তুমি তাহাকে দেখিলে। একটি দশ দিনের ছেলেকে দেখিবার পর দশ বৎসর পরে তাহাকে আবার দেখিলে—তাহাকে কী প্রকারে চেনা সম্ভব ? আকৃতির তো সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, কাজেই চেহারা দেখিয়া তুমি তাহাকে কী করিয়া চিনিলে ?

উঃ। উহার সকল (চেহারা) দেখিয়া আমি উহাকে চিনি নাই ; আমার দিল্ (হৃদয়) উহাকে চিনিয়া লইয়াছিল।

প্রঃ। আচ্ছা, তুমি বলিয়াছ যে, তুমি ধোঁয়ার মত হইয়া উঠিয়া গেলে কিন্তু আমরা যাহা দেখি, শুনি, আঘ্রাণ করি, তাহা ইন্দ্রিয় দ্বারাই করি। আজ যে চোখ দিয়া তোমায় দেখিতেছি, এই মুহূর্ত্তে যদি আমার সে চোখ

অন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে আর মোটেই তোমাকে দেখিতে পাইব না, সেইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই। আবার আমরা যে চিন্তা করি তাহাও সম্ভব হয় আমাদের মস্তিষ্ক আছে বলিয়া—যে যে ছাপ মাথায় পড়ে, সেই সেই সম্বন্ধেই চিন্তা আমরা করিতে পারি—তা ছাড়া কোন চিন্তা হইতে পারে না। তুমি বলিতেছ যে, তুমি দেহ-মস্তিষ্ক-ইন্দ্রিয়াদি বিরহিত হইয়া ধোঁয়ার মত চলিয়া গেলে, অথচ তোমার চিন্তা করিবার শক্তি রহিল, তুমি দেখিতে পাইলে, তুমি আঘ্রাণ করিতে পারিলে—এ কিরূপ কথা ?

উঃ। কী প্রকারে উহা সম্ভব তাহা বলিতে পারি না, তবে এই বলিতে পারি যে, সেই gaseous light form-এ ইন্দ্রিয়-মস্তিষ্ক-দেহাদি বিরহিত হইয়াও দেখা যায়, শোনা যায়, আঘ্রাণ করা যায়, চিন্তা করা যায়। আমি যাহা অনুভব করিয়াছি তাহাই বলিতেছি।

প্রঃ। আচ্ছা, ব্যাপারটা তাহা হইলে এই দাঁড়াইতেছে যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিরহিত বা বিযুক্ত হইয়াও আমরা সেই অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদির সমস্ত sensation পাইতে পারি।

উঃ। হ্যাঁ।

প্রঃ। Sensation ব্যাপারে দেহ-ইন্দ্রিয়াদি যুক্ত ও দেহাদি বিযুক্ত অবস্থায় কোন পার্থক্য অনুভব করা যায় কি ?

উঃ। হ্যাঁ, যায়। Sensation-গুলি দেহ-বিযুক্ত অবস্থায় খুব keen হয়। ধরুন, এই ঘরের দেওয়ালের অপর পার্শ্বে কি আছে আমি এখন দেখিতে পারি না ; কিন্তু দেহ অযুক্ত অবস্থায় আমি এই দেওয়ালের অপর পার্শ্বে কি আছে তাহা দেখিতে পারি অর্থাৎ আমার দৃষ্টিশক্তি এতদূর তীক্ষ্ণ হয় যে, দেওয়াল ভেদ করিয়াও অপর পার্শ্বে কি আছে তাহা দেখিতে পারি —এইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-সম্পর্কেই।

শান্তির সঙ্গে যখন এইরূপ আলোচনা চলিতেছিল তখন শান্তির পিতা বাবু রং বাহাদুর তাঁহার জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া আমার সহিত তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। পুত্র লালজী আমার নিকটেই

উপবিষ্ট ছিল। দিল্লীর এক বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারে জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছে, মধ্যমা কন্যা তখনও অবিবাহিতা। দেখিলাম, পূর্ব্বে যে বাবু রং বাহাদুর আমাকে বলিয়াছিলেন শান্তির সহিত আর বোনদের বা ভাইয়ের চেহারার কোন সৌসাদৃশ্য নাই, তাহা ঠিকই; কিন্তু আর দুই বোন ও ভাইকে দেখিলেই তাহারা যে ভাইবোন তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

যাহা হউক, জ্যেষ্ঠা ভগ্নীদ্বয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইবার পর তাহারা চলিয়া গেল, আমি পুনরায় শান্তির সঙ্গে কথাবার্ত্তা সুরু করিয়া দিলাম। শান্তিকে প্রশ্ন করিলাম—

প্রঃ। গত জীবনের দেহ হইতে বিযুক্ত হইয়া যাইবার সময় এবং পুনরায় তোমার এই বর্ত্তমান দেহে ফিরিয়া আসিবার সময়ে যে অনুভূতি, তাহা কি একই প্রকারের?

উঃ। পূর্ব্বজীবনের দেহ হইতে বিযুক্ত হইয়া যাইবার সময় ধোঁয়ার মত gaseous light form-এ গেলাম, তাহার আকার এক অঙ্গুলি অপেক্ষা কিছু বড় হইবে। কিন্তু আসিবার সময় অনুভব করিলাম, যেন খুব ছোট্ট শিশু হইয়া আসিলাম।

প্রঃ। আঁধার কুটীরে ঢুকিয়া ছোট শিশুর মত বোধ হইল, না সেখানে প্রবেশের পূর্ব্বেই ওরূপ বোধ হইয়াছিল?

উঃ। আঁধার কুটীরে প্রবেশের পর ছোট্ট শিশুর মত বোধ হইল।

প্রঃ। তোমার আকৃতির বিভিন্নতা কি তুমি সব স্তরেই অনুভব করিতে পারিয়াছিলে?

উঃ। না, ১ম, ২য়, ৩য় স্তরে অনুভব করিতে পারি নাই। চতুর্থ স্তরে যাইয়া বিভিন্নতা অনুভব করিতে পারিলাম।

প্রঃ। তোমার স্মৃতিশক্তি কি খুব প্রখর? একবার কোন শ্লোক শুনিলে তুমি তাহা তৎক্ষণাৎ আবৃত্তি করিতে পার কি?

উঃ। হ্যাঁ, পারি।

শান্তির পিতাও বলিলেন যে, শান্তির স্মৃতিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ।

প্রঃ। স্কুলে তুমি যে-সব বিষয় পড় তাহার কোন্ বিষয় তোমার সব চাইতে ভাল লাগে?

উঃ। সংস্কৃত ও হিন্দী।

প্রঃ। আচ্ছা, তোমার পূর্ব্বজীবনের স্বামী বাবু কেদারনাথকে, তোমাদের বাড়ীতে তিনি যখন আসেন তখনই প্রথম দেখিলে, না পূর্ব্বেও দেখিয়াছিলে?

উঃ। একদিন দিল্লীতে রাস্তায় স্কুলের পথে তাঁহাকে দেখি এবং বাড়ীতে আসিয়া মাকে বলি।

প্রঃ। তুমি যখন পূর্ব্বজীবনের দেহ হইতে বিযুক্ত হইলে তন্মুহূর্ত্তে তোমার মনে কাহার চিন্তা স্থান পাইয়াছিল—অবশ্য সে অবস্থায় মন বলিয়া যদি কিছু থাকিয়া থাকে?

উঃ। মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই দ্বারিকাধীশের নাম জপ করিতে করিতে এবং তাঁহার চিন্তা করিতে করিতেই দেহত্যাগ করি। দেহত্যাগের পরও তাঁহার চিন্তাই করিতেছিলাম।

প্রঃ। যখন তুমি দেহী ছিলে তখনও দ্বারিকাধীশের চিন্তা করিতে এবং দেহ বিযুক্ত হইয়াও দ্বারিকাধীশের চিন্তা করিয়াছ—এই দুই চিন্তায় কোন পার্থক্য অনুভব করিতে পারিয়াছ কি?

উঃ। দেহবিযুক্ত চিন্তা ঢের বেশী গভীর।

প্রঃ। এক দেহবিযুক্ত আত্মা অন্য দেহবিযুক্ত আত্মার সহিত কথা বলিতে পারে কি?

উঃ। না, আমি তাহা অনুভব করি নাই। কাহারও সহিত কেহ কিছু বলিতেছে এরূপ কিছু দেখি নাই।

শান্তির সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় শান্তিকে বলিলাম যে, আমি ২।১ দিনের মধ্যেই মথুরা যাইব এবং পণ্ডিত কেদারনাথ চৌবের সহিত দেখা করিব। সে আমার মথুরা-গমনের সংবাদ শুনিয়া খুবই

আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহাকে আরও বলিলাম যে, ভবিষ্যতে দিল্লীতে আসিলে তোমাদেরই অতিথি হইব—তাহাতেও সে খুব খুশিই হইল।

সেদিন শুক্রবার ছিল। রবিবার দিন শ্রীযুক্ত ভার্গবদের পরিবারবর্গের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বেলা ১২॥টার ট্রেনে দিল্লী হইতে রওনা হইয়া বেলা ৪॥টায় মথুরা জংসন ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। ষ্টেশন হইতে স্বামীঘাটে মিঃ জে, এস্, চতুর্ব্বেদীর বাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম এবং তাঁহাকে আমার মথুরা-আগমনের কারণ বলিলাম। তিনি বলিলেন, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন, পরে আমার পুত্রকে আপনার সঙ্গে দিব। সে আপনাকে অস্‌কুণ্ডা-বাজার বা অন্য যেখানে যাইতে চান লইয়া যাইবে। আমি বলিলাম, আচ্ছা, তাহাই হইবে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর চতুর্ব্বেদী-মহাশয়ের পুত্রকে সঙ্গে লইয়া শীতলা-ঘাটিতে হাকিম ব্রজলাল বর্ম্মণের খোঁজে গেলাম। বাবু ব্রজলাল অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস-কমিটির মেম্বর এবং মথুরা জেলা কংগ্রেস-কমিটির ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র গত হইয়াছে। তিনি এখন প্রাণ-মন ঢালিয়া কংগ্রেসের কাজে নিযুক্ত। তাঁহার সহিত সাধনাদি সম্বন্ধে অনেক আলাপ হইল। তিনি বলিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দীক্ষা গ্রহণের কথা তিনি জানেন এবং দেশবন্ধুর নিকট হইতেই তিনি উহা শুনিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ হইবার পর বর্ত্তমানে আমার মথুরা-আগমনের উদ্দেশ্য তাঁহাকে বলিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, এ বিষয়ের সত্যাসত্য সম্বন্ধে তিনি কোন আলোকপাত করিতে পারেন কিনা।

বাবু ব্রজলাল বলিলেন, দিল্লীর সেই মেয়েটি (শান্তি দেবী) যখন প্রথম মথুরায় আসে তখন আমি লালা দেশবন্ধু গুপ্ত, পণ্ডিত নেকীরাম শর্ম্মা প্রভৃতির সহিত উপস্থিত ছিলাম। দেখিলাম, মেয়েটি টাঙ্গাওয়ালাকে নির্দ্দেশ দিয়া তাহার পূর্ব্বজীবনের বাড়ীর দিকে লইয়া যাইতেছে। বাড়ী হইতে কিছুদূরে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখিয়া মেয়েটি তাঁহাকে প্রণাম

করিল এবং বলিল, ইনি আমার শ্বশুর। তারপর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সে যাহা যাহা বলিয়াছে এবং আপনি সে সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছেন সবই সত্য, একটি কথাও মিথ্যা নহে ; আমি সে সময়ে সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম।

বাবু ব্রজলালের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তাঁহার ভ্রাতা হাকিম কানাইয়ালালকে সঙ্গে করিয়া দ্বারিকাধীশের মন্দিরের বিপরীত দিকে শান্তির পূর্ব্বজীবনের স্বামী বাবু কেদারনাথ চৌবের দোকানে আসিলাম। তিনি উপস্থিত না থাকায় তাঁহার সহিত দেখা হইল না। বিশ্রামঘাট হইয়া যমুনার ধারে বেড়াইয়া দ্বারিকাধীশের ঝুলন দেখিয়া সেদিনকার মত বাসায় ফিরিলাম।

তৎপরদিন স্নানাদি সমাপনান্তে অস্‌কুণ্ডা-বাজারে বাবু কেদারনাথ চৌবের দোকানে গেলাম। তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে আমার আগমনের কারণ বলিলাম, তিনি আমাকে সমাদরে বসাইলেন এবং শান্তি দেবীর সম্বন্ধে তাঁহার সহিত নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা হইল।

প্রঃ। দিল্লীর শান্তি দেবীই যে পূর্ব্বজীবনে আপনার মৃতা পত্নী লুগ দি দেবী ছিল, এ বিষয়ে কি আপনি নিঃসন্দেহ ?

উঃ। হ্যাঁ, এ বিষয়ে আমার এতটুকুও সন্দেহ নাই।

প্রঃ। আপনার এই নিশ্চয়তা-বোধ কিরূপে জন্মিল ? বালিকা শান্তি দেবীর সহিত আপনার কোন গোপনীয় কথা হইয়াছিল কি, যাহার দ্বারা আপনি এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ? যদি আপনার বলিতে কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে এ বিষয় আপনার নিকট হইতে জানিতে পারিলে জন্মান্তরবাদ যে একটি অলীক কল্পনা নহে, সে সম্বন্ধে আমারও নিশ্চিত ধারণা হইবে। শুধু একটা কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আপনার নিকটে আসি নাই। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ইহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি। কাজেই গোপন কথা হইলেও তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিতে আপনার আপত্তি হওয়া উচিত নহে।

উঃ। শান্তি মথুরায় প্রথম আসিয়া আমার বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিকে যথাযথভাবে সনাক্ত করে। পূর্ব্বজীবনে কোন্ ঘরে সে শয়ন করিত, কি কি অলঙ্কার পরিত, কাপড়-পোষাকাদি কোথায় রাখিত ইত্যাদি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে। তাহার দ্বারা আমার আত্মীয়-স্বজনের দৃঢ় ধারণা হয় যে, সেই আমার পূর্ব্বজীবনের পত্নী ছিল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই দিল্লীতে প্রথম আমি যখন শান্তিকে দেখিতে পাই তখন তাহার সহিত আমার যে গোপন আলোচনা হয় তাহা হইতেই আমার নিশ্চিত ধারণা হয় যে, শান্তিই আমার মৃতা পত্নী লুগ্‌দী দেবী নবকলেবরে এবার দিল্লীতে আসিয়াছে। এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।

এই গোপনীয় কথা এপর্য্যন্ত আমি কাহাকেও বলি নাই, সর্ব্বপ্রথমে আপনাকেই বলিতেছি। আমি যেদিন শান্তিকে দেখিবার জন্য প্রথমে দিল্লী যাইয়া তাহাদের বাড়ীতে উঠি, সেদিন তাহাদের অনুরোধে তাহাদের বাড়ীতেই অবস্থান করি। সেদিন নানা কথাবার্ত্তা হইতে হইতে রাত্রি প্রায় একটা হয়। তাহার পর সকলে চলিয়া যায়। একটি ঘরে আমি, আমার বর্ত্তমান স্ত্রী, আমার পুত্র নবনীতলাল ও শান্তি এই চারি জনে রহিলাম। পুত্র নবনীতলাল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তখন আমি অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা শান্তিকে বলিলাম—তুমি যাহা যাহা বলিয়াছ তাহা তো শুনিলাম, কিন্তু তুমি এমন কোন কথা বল যাহা তুমি ও আমি ছাড়া আর কাহারও জানা সম্ভব না। সে তখন আমার বর্ত্তমান স্ত্রীকে অন্য ঘরে যাইতে বলে। আমি তখন তাহাকে বলি—তুমিও যেমন এও তেমনি, কাজেই এঁর সাক্ষাতে কোন কথা বলিতে তোমার সঙ্কোচ করা উচিত নহে। তখন সে বলিল—মৃত্যুর পূর্ব্বে তুমি আমাকে আগ্রা-হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলে এবং আমাকে সেবা করিবার জন্য এক নার্স নিযুক্ত করিয়াছিলে। সেই নার্স-সম্পর্কিত সব কথা তোমার মনে পড়ে কি? আমি বলিলাম, হ্যাঁ।

আমি তখন শান্তিকে বলিলাম, আরও কিছু বল। তখন সে

বলিল—তুমি জিজ্ঞাসা কর, আমি বলিতেছি। আমার যাহা বলিবার সবই তো বলিয়াছি। তখন আমি শান্তিকে বলিলাম—আচ্ছা, তুমি তো বাতরোগগ্রস্ত হইয়া পা সোজা করিতে পারিতে না, বসিয়া বসিয়া পাছায় ভর দিয়া চলিতে—সেই অবস্থায় তোমার সহিত সন্তানের জন্য কি করিয়া মিলিত হইয়াছিলাম, বলিতে পার কি? তখন অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা শান্তি তাহা বলিয়া দিল। আমি সেই হইতে নিরুত্তর ও সন্দেহশূন্য হইয়াছি।

বাবু কেদারনাথ আরও বলিলেন—আগ্রা-হাসপাতালে ছেলে হইবার পর তাহার মাকে আমি সঙ্গে লইয়া যাই। সে অর্থাৎ লুগ্‌দী দেবী তখন তাহার মাকে বলে, "মা, পুত্রের মঙ্গলার্থে দ্বারিকাধীশকে সওয়া সের পেঁড়ার ভোগ দিও।" তাহার মা তখন তাহাকে বলে, "সওয়া সের কেন, একমণ দশ সের পেঁড়ার ভোগ দিব।" কিন্তু তাহা আর দেওয়া হয় নাই। শান্তি যখন প্রথম মথুরাতে আসে তখন তাহার পূর্ব্বজীবনের মাতার সহিত দেখা হইলে সে মাকে জিজ্ঞাসা করে, "মা, তুমি যে ছেলের জন্য একমণ দশ সের পেঁড়া-ভোগ দ্বারিকাধীশকে চড়াইতে চাহিয়াছিলে, তাহা কি দিয়াছ? না দিয়া থাকিলে এখনই উহা দাও।" সেইদিনই উহা দেওয়া হয়।

বাবু কেদারনাথ আরও বলিলেন, "১৯৩৭ সালে সুপ্রসিদ্ধ কলাবিদ্ সেণ্ট নিহাল সিং ও তাঁহার আমেরিকান্ পত্নী শান্তি ও তাহার পিতামাতাকে সঙ্গে লইয়া মথুরায় আসেন। শান্তির এই দ্বিতীয় বার মথুরায় আগমন। সেণ্ট নিহাল সিং মোটর-যোগে শান্তিকে লইয়া মথুরা হইতে বৃন্দাবন যাইতে-ছিলেন। পথিমধ্যে শান্তি মোটর থামাইতে বলিল, এবং একটি বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, 'এইটি আমার বাগানবাড়ী। এই বাড়ীর উপরের ঘরে দশখানা ছবি আছে।' সেণ্ট নিহাল সিং গাড়ী হইতে নামিয়া উপরের ঘরে যাইয়া দেখিলেন যে, সত্যই দশখানা ছবি টাঙ্গানো আছে। অসুস্থ অবস্থায় আমার স্বর্গত দ্বিতীয়া পত্নী লুগ্‌দী দেবী এই বাগানবাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—

প্রঃ। আপনার মৃতা পত্নী লুগ্ দী দেবী কি ধর্ম্মশীলা ছিলেন?

উঃ। হ্যাঁ, খুবই ধর্ম্মশীলা ছিল। দেখুন না, আমি নিজে বিশেষ কোন তীর্থে যাই নাই, কিন্তু সে আমাকে ধরিয়া ভারতের সব প্রসিদ্ধ তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিল। হরিদ্বারে তীর্থ করিতে যাইয়া পরিক্রমা-কালে তাহার পায়ের নীচে হাড় ফুটিয়া যায়—তাহাতে সে দীর্ঘদিন ভোগে। ইহা হইতে সে আর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে নাই।

তারপর বাবু কেদারনাথ বলিলেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে ও ভারতের নানাস্থান হইতে তাঁহার নিকট এই বিষয় জানিবার জন্য বহু পত্র আসিয়াছে। কিন্তু তাঁহার পক্ষে তাহার উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নাই—এই বলিয়া বহু পত্র তিনি আমায় দেখাইলেন—তাহার মধ্যে একখানি পত্রে দেখিলাম যে, Clement Hey নামক Sterling Illinos (U. S. A.) নিবাসী একজন আমেরিকান লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পত্নী লুগ্ দী দেবী ৪ঠা অক্টোবর, ১৯২৫ সালে মারা যান এবং শান্তি দেবী রূপে দিল্লীতে ১১ই ডিসেম্বর, ১৯২৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি লিখিয়াছেন—This lapse of time between Oct. 4, 1925 and Dec. 11, 1926 fits a cycle of time that matches a certain theory of mine, which I would like to check. In order to check it with precision I should know that time of the day when she died on 4th Oct., 1925. I will appreciate very much if you can give me the time. I have studied astrology for 35 years and the cycle of planets makes a deep study.

এই পত্রখানি দেখিয়া আমি বলিলাম, "আপনি এই পত্রখানিরও জবাব দেন নাই বোধ হয়।" তিনি বলিলেন, "না, আমি কোন পত্রেরই জবাব দিই

নাই।” তাঁহাকে এই পত্রের মর্ম্ম অবগত করাইলে তিনি বলিলেন, “আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রখানির উত্তর দিয়া দেন তবে আমি বাধিত হইব।” —এই বলিয়া তিনি পত্রখানি আমায় দিলেন। আমি পত্রখানি হাতে লইয়া বলিলাম, “আমি উহার জবাব দিয়া দিব।” এই বলিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইবার সময় বলিলাম, “আপনার পুত্র নবনীতলাল এবং আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত দেখা হইলে সুখী হইতাম।” তিনি বলিলেন, “তাহারা কেহই এখানে উপস্থিত নাই, আগামী কল্য আসিবেন, তাহাদের সহিত দেখা হইবে।”

তাহার পরদিন সকালে পুনরায় চৌবেজীর সহিত দেখা করিতে গেলাম। সেখানে চৌবেজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাবুলালজী ও নবনীতলাল উপস্থিত ছিল। তাহার পড়াশুনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে নবনীতলাল বলিল যে, সে মথুরার কিশোরীরমণ হাইস্কুলের ৫ম শ্রেণীতে পড়িতেছে। বাবুলাল-জীর সহিত আলাপ-পরিচয় হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “বালিকা শান্তি মথুরা-ষ্টেশনে জনতার মধ্য হইতে আপনাকে তাহার জেঠ (ভাশুর) বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল, একথা কি সত্য?” উত্তরে হাঁ বলিয়া বালিকা কি প্রকারে তাঁহাকে বহুজনসমক্ষে সনাক্ত করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল তাহা বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন, “সে যে পূর্ব্বজন্মে আমার ভ্রাতৃবধূ ছিল, এ-বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।” তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে বাবু কেদারনাথকে বলিলাম, “একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি—আপনার পূর্ব্বপত্নী লুগ্‌দী দেবী কি আপনার প্রতি খুব অনুরক্তা ছিলেন? উত্তরে বাবু কেদারনাথ বলিলেন, “তাহার অনুরক্তির কথা আর আপনাকে কী বলিব? ওরূপ পতিপরায়ণা পত্নী ক্বচিৎ দেখা যায়। আমার সেবাই যেন তাহার জীবনের ব্রত ছিল। কিসে আমি সুস্থ থাকিব, আনন্দে থাকিব, তাহাই তাহার একমাত্র চিন্তা ছিল। আমাকে কখনও বিমর্ষ বা চিন্তাক্লিষ্ট দেখিলে নানাপ্রকার উৎসাহবাক্যে আমার মনের গ্লানি মুছাইয়া দিবার চেষ্টা করিত। আমার আহার-গ্রহণের পূর্ব্বে

সে কখনও আহার-গ্রহণ করিত না—এমনকি অসুস্থাবস্থায়ও না। তাহাকে এসম্বন্ধে অনেক বুঝাইয়াও নিরস্ত করিতে পারি নাই। সুস্থাবস্থায় আমার আহার্য্য নিজহস্তে রন্ধন করিত, আমার ভগ্নী বা বাড়ীর আর কাহাকেও তাহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও রন্ধন করিতে দিত না। যে ব্যঞ্জনাদি আমি ভালবাসি তাহাই সে বুঝিয়া-বুঝিয়া প্রস্তুত করিত। আমার কখন কি প্রয়োজন, না বলিতেই অনুমান করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিত।" মৃতা পত্নী সম্বন্ধে এইসব কথা বলিতে বলিতে চৌবেজীর চক্ষু আর্দ্র ও মুখ মলিন হইয়া আসিল—তখন আমি বলিলাম—"পূর্ব্বকার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আপনাকে আর কষ্ট দিতে চাই না। আজ আপনাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৃন্দাবনে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া পুনরায় হয়তো দিল্লী ফিরিয়া যাইতে পারি।" চৌবেজী তখন বলিলেন—"যদি দিল্লী যান আর শান্তি দেবীর সহিত দেখা হয় তবে আমাদের কথা তাহাকে বলিবেন।" আমি বলিলাম—"হাঁ, নিশ্চয়ই।" কয়েকদিন এই চৌবে-পরিবারের সহিত আলাপ-পরিচয়ে ও তাঁহাদের প্রেমপূর্ণ ব্যবহারে তাঁহারা আমার আত্মীয় এই বোধই প্রবল হইয়াছিল—কাজেই তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইতে নিজেরও একটু কষ্টবোধ হইল।

এইবার শান্তি দেবীর বর্ত্তমান ও পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

১। মথুরার নগরা পইসা মহল্লার চতুর্ভুজ চতুর্ব্বেদীর কন্যা লুগ্‌দী দেবীর (শান্তি দেবীর পূর্ব্বজীবনের নাম) জন্ম হয় সম্বৎ ১৯৫৮, ১৩ই পৌষ, রবিবার, ইংরাজী ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯০২।

২। সম্বৎ ১৯৬৮ ফাল্গুন মাসে নগরা পইসা মহল্লা-নিবাসী কেদার-নাথ চতুর্ব্বেদীর সহিত লুগ্‌দী দেবীর বিবাহ হয়।

৩। পুত্র নবনীতলালের জন্ম হয় আগ্রা লেডি লায়াল হাসপাতালে আশ্বিন শুক্লাষ্টমী তিথি, শুক্রবার, সম্বৎ ১৯৮২, ইংরাজী ২৫-৯-২৫ দিবা ২টা ৫৫ মিনিটে।

৪। পুত্রজন্মের ৯ দিনের দিন হাসপাতালে কার্ত্তিক মাসে, কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথিতে, সম্বৎ ১৯৮২, ইংরাজী ৪-১০-২৫ সকাল ১০টার মৃত্যু।

৫। শান্তি দেবীর জন্ম—অগ্রহায়ণ শুক্লা অষ্টমী তিথি, শনিবার, সম্বৎ ১৯৮৩, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ সাল, ইংরাজী ১১ই ডিসেম্বর, ১৯২৬, দিবা ১টা ৫৫ মিনিট। (শান্তির পিতা শান্তির জন্ম ২৬শে অক্টোবর ১৯২৬ সালে হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, এফিমেরীস দৃষ্টে প্রতীয়মান হইল যে, ইংরাজী তারিখ বলিতে তিনি ভুল করিয়াছেন) শান্তির রাশিচক্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।
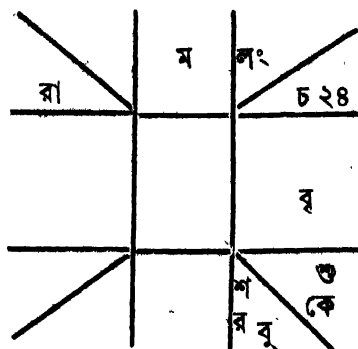
৬। সেই সময়ে আগ্রা লেডি লায়াল হাসপাতালে যে লেডি ডাক্তার ইনচার্জ্জ ছিলেন তাঁহার নাম হইতেছে—লেডি ওয়েব।

পূর্ব্বজীবনের যে-সব আত্মীয়গণকে শান্তি দেবী চিনিয়া বহু জনসমক্ষে তাঁহাদের সনাক্ত করিয়াছিল, তাঁহাদের নাম—

১। স্বামী—কেদারনাথ চৌবে। ২। পুত্র—নবনীতলাল। ৩। শ্বশুর—মহাদেব চৌবে। ৪। খুড়শ্বশুর—বনমালি চৌবে। ৫। ভাশুর—বাবুরাম চৌবে। ৬। স্বামীর জ্ঞাতিভ্রাতা—কাঞ্জিমল চৌবে। ৭। পিতা—চতুর্ভুজ চৌবে। ৮। মাতা—জগতি দেবী। ৯। ভ্রাতাগণ—(১) মথুরানাথ। (২) ভিথলনাথ। (৩) অযোধ্যানাথ।

॥ চার ॥

মথুরায় যাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, তাঁহাদের সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৃন্দাবনে ঠাকুর-সাহেবের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রায় দেড়মাস্ পরে ঠাকুর-সাহেব আমাকে দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইলেন এবং দীর্ঘদিন পরে গৃহাগত প্রিয়জনের ন্যায় আমাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আপনি আসিলে আপনাকে লইয়া জয়পুর যাইব মনে করিয়া আপনার আগমন-প্রতীক্ষায় ছিলাম, আগামী পরশ্বই আমরা জয়পুর রওনা হইব।" সেবারে তাঁহার সহিত জয়পুর যাইয়া রাজস্থান পরিভ্রমণ করি।

১৯৪০ সালের মে মাসের প্রথমে কানপুরে আসিয়া কানপুর ষ্টেশনের পার্সেল ক্লার্ক শ্রীযুক্ত কমলকুমার মিত্রের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম, মেষ্টন রোডের উপর অবস্থিত শর্ম্মা রেষ্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী বাবু মঙ্গল দেও শর্ম্মার পত্নী শ্রীযুক্তা বিদ্যাবতী দেবীর পূর্ব্বজীবনের কথা স্মরণে আছে। ইহার পূর্ব্বেও কানপুরের গান্ধীনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ ভাটনাগারের পুত্রের জাতিস্মরত্বের বিষয় পায়োনিয়র পত্রিকা-পাঠে অবগত হইয়াছিলাম। ইহাদের বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

এইবার কানপুরে অবস্থানকালে জানিতে পারিলাম যে, বেরেলী-শহরের এডভোকেট বাবু কৈকেয়ীনন্দন সহায় বি, এ; এল, এল, বি, মহাশয়ের পুত্র শ্রীজগদীশচন্দ্র জাতিস্মর। এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক 'লীডার' পত্রিকায় তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। আরও জানিতে পারিলাম যে, কৈকেয়ীনন্দনবাবু জাতিস্মরত্ব সম্বন্ধে তথ্যাদি অনুসন্ধান করিবার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন এবং বহু অর্থব্যয়ও করিয়াছেন।

এবারে আশ্রম হইতে রওনা হইবার সময়ে শ্রীযুক্ত সুখময়-দা (সেনগুপ্ত) আমার সহিত কানপুর গিয়াছিলেন। সুখময়-দাকে কানপুরে অবস্থান করিবার

জন্য অনুরোধ করিলাম; তিনি রাজি হইলেন না। বলিলেন—"আপনি না থাকিলে আমার পক্ষে থাকা সম্ভব না।" তাই স্থির হইল যে, তিনি মুজঃফরপুর যাইবেন আর আমি বেরেলী যাইব। আমি বেরেলী যাইব শুনিয়া আমাদের গুরুভ্রাতা কানপুর বেঙ্গলী ক্লাবের তদানীন্তন সেক্রেটারী অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন মিত্র মহাশয় বেরেলীর প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত সারদাপদ মুখার্জ্জি মহাশয়ের নামে আমাকে একখানি পরিচয়-পত্র দিলেন। ২৪শে মে, বৃহস্পতিবার আমি ও সুখময়-দা একটি টাঙ্গা করিয়া বেলা ৪টার সময় কানপুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমাদিগকে ট্রেনে উঠাইয়া দিবার জন্য কানপুরের প্রসিদ্ধ কন্ট্রাক্টর মোহিতকুমার মুখার্জ্জি, নারায়ণ প্রসাদ, পরমেশ্বর দীন, গিরিজাশঙ্কর প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা আসিয়াছিলেন। সুখময়-দাকে ট্রেনে উঠাইয়া দিয়া আমি বেরেলী যাইবার জন্য ১নং প্লাট-ফর্ম্মে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ট্রেন লেট্ হওয়াতে ও শ্রীযুক্ত মোহিত-দার অন্যত্র কাজ থাকাতে তিনি চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। কিছুক্ষণ পরে ট্রেন আসিলে উঠিয়া বসিলাম। লক্ষ্ণৌ-এ গাড়ী বদল করিয়া প্রাতে বেরেলী ষ্টেশনে নামিয়া বনবাটা মহল্লায় উকিল শ্রীযুক্ত সারদাপদ-বাবুর বাসায় আসিলাম। সারদাবাবু বাড়ীতে ছিলেন না, তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত উমাপদ মুখার্জ্জি ও পুত্র অবনীনাথ মুখার্জ্জির সহিত আলাপ-পরিচয় হইল—ইঁহারা দুইজনও উকিল। তাঁহারা আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

উমাপদবাবুর নিকট হইতে জানিলাম যে, এখানে প্রায় একশত ঘর বাঙ্গালী আছেন। এখানকার কলেজের প্রিন্সিপাল বাঙ্গালী—নাম শ্রীঅনুকূলচন্দ্র দত্ত; ডাঃ অবনীকুমার ভট্টাচার্য্য, ডি, এস-সি, সায়েন্সের প্রফেসার, তাছাড়া আরও ছয় জন বাঙ্গালী প্রফেসার আছেন। দুঃখের বিষয়, এখানেও বাঙ্গালীদের মধ্যে দলাদলি। বাঙ্গালীদের দুইটা পৃথক ক্লাব। বাঙ্গালী-দের এই সংহতির অভাবই তাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায়—ইহার জন্য বাঙ্গালী আজ ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে লাঞ্ছিত, হেয় ও অপাংক্তেয় হইয়া আছে। একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কেন্দ্রায়িত না হইলে বাঙ্গালী কখনও

স্বমর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমাদের দেশের সকল অমঙ্গলের মূল কোথায়? যেখানে আমরা বিচ্ছিন্ন। অতএব আমাদের দেশে বহুকে এক ক'রে তোলাই দেশহিতের সাধনা।" আজ বাঙ্গলার এই ঘোর দুর্দ্দিনেও বাঙ্গালীজাতির সে সুবুদ্ধি বিকাশের কোন লক্ষণই তো দেখা যাইতেছে না। কবে হইবে, কে জানে। উমাপদবাবুকে আমার বেরেলী আগমনের উদ্দেশ্য কি তাহা জানাইলাম এবং বাবু কৈকেয়ী-নন্দন সহায় কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাঁহার বাড়ী এই মহল্লা হইতে কতদূরে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন—"কৈকেয়ীবাবু সজ্জন, পূর্ব্বে তিনি ওকালতি করিতেন, এখন আর ওকালতি করেন না। তাঁহার শ্বশুরের বিরাট সম্পত্তির তিনিই বর্ত্তমানে একমাত্র উত্তরাধিকারী। উহার বার্ষিক আয় ৫।৬ লক্ষ টাকা হইবে। শুনিয়াছি, তাঁহার একটি ছেলেকে তিনি বিলাতে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার ছোট ছেলেটিই জাতিস্মর। কৈকেয়ীবাবুর বাড়ী আমাদের এখান হইতে বেশী দূর হইবে না—সিভিল লাইনে ইম্পিরিয়েল টকি হাউসের নিকটেই তাঁহার বাড়ী। আপনি রাত্রি জাগিয়া আসিয়াছেন, স্নান-আহারাদি সারিয়া এবেলা বিশ্রাম করুন, বৈকালে কাছারী হইতে আসিয়া আমি সঙ্গে করিয়া আপনাকে কৈকেয়ীবাবুর বাড়ীতে লইয়া যাইব বা কাহাকেও আপনার সঙ্গে দিয়া পাঠাইব।"

বৈকালে কাছারী হইতে আসিয়া উমাপদবাবু বলিলেন যে, তাঁহার পক্ষে আর কৈকেয়ীবাবুর বাড়ীতে যাওয়া সম্ভব হইতেছে না, তাঁহাকে কি একটা মিটিং-এ যাইতে হইবে; কাজেই তিনি বাড়ীর একটি ছেলেকে আমার সঙ্গে দিলেন।

কৈকেয়ীবাবু বাড়ীতেই ছিলেন। তিনি আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন। আমিও কোথা হইতে আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি ইত্যাদি সব কথাই তাঁহাকে বলিলাম। তিনি আমার সহিত প্রাণ খুলিয়াই আলাপ করিলেন এবং বাড়ীর প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহার তিনটি পুত্র; বড় ছেলেটি বি, এস-সি পাশ করিয়া কানপুরে এগ্রিকালচার

ট্রেনিং পাইয়াছে। মধ্যম পুত্র কেশবচন্দ্রকেও বি, এস-সি ও এগ্রিকালচার ট্রেনিং দিয়া উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছেন। সে University of Reading (England)-এ Horticulture পড়িতেছে। ছোট ছেলেটির নাম জগদীশচন্দ্র, সেই জাতিস্মর।

বাবু কৈকেয়ীনন্দনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কনিষ্ঠ পুত্র জগদীশচন্দ্র কত বর্ষ বয়সে প্রথম পূর্ব্বজীবনের কথা বলিতে আরম্ভ করে—কি কি বলে এবং সে সম্বন্ধে আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বয়ং কোন অনুসন্ধান করিয়াছেন কি না, এবং যদি করিয়া থাকেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ কৃপা করিয়া যদি আমাকে জানান তবে বিশেষ বাধিত হইব।" কৈকেয়ীবাবু বলিলেন—"আমি নিজে আমার পুত্রের বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছি তো বটেই তাহা ছাড়া আরও কয়েকটি এই ধরণের ঘটনার বিষয় অবগত আছি। আপনি যখন এ বিষয়ে গবেষণামূলক মনোবৃত্তি লইয়া তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন—তখন এ বিষয়ে আমার যাহা জানা আছে সবই আপনাকে বলিতেছি।"—এই বলিয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—

আমি আমার পল্লীভবন কামা গ্রামে গিয়াছিলাম, তথায় অবস্থান-কালে সংবাদ পাইলাম যে, আমার স্ত্রী বেরেলীতে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। সংবাদ পাইবামাত্র আমি বেরেলীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। স্ত্রীর কঠিন পীড়া হেতু ছয় দিন আমি কোর্টে যাই নাই—আমার স্ত্রীর ব্যাধি উপশম হইতে অনেক দিন লাগিল। স্ত্রীর অসুস্থতার সময় আমার কনিষ্ঠ পুত্র (তখন তাহার বয়স সাড়ে তিন বৎসর মাত্র) আমাকে একখানা মোটরগাড়ী আনিবার কথা বলিল। আমি বলিলাম—হাঁ, আমি শীঘ্রই একখানা মোটরগাড়ী খরিদ করিব। কিন্তু বালকটি মোটরগাড়ীর জন্য ভীষণ অধীর হইয়া উঠিল এবং আমাকে ত্বরায় একখানা গাড়ী আনিবার জন্য বার-বার বলিতে লাগিল। আমি বলিলাম—বলিবামাত্রই তো আর গাড়ী পাওয়া যায় না—উহার জন্য খোঁজ করিয়া দেখিতে হইবে। তখন সে বলিল—তাহা হইলে আমার গাড়ীখানা লইয়া আইস। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার

মোটরগাড়ী কোথায় আছে? উত্তরে সে বলিল যে, উহা বেনারসে বাবুজীর নিকট আছে। বাবুজী তাহার পিতা—তাঁহার পুরা নাম বাবুজী পাণ্ডে; এবং সে বাবুজীর বাড়ীর বর্ণনা দেয়—বিশেষ করিয়া বাড়ীর প্রকাণ্ড গেটের কথা বলে এবং বলে যে, মাটির নীচে একটি ঘর আছে, সেই ঘরের দেওয়ালে একটি লোহার সিন্দুক পোঁতা আছে।

তাহাকে আরও প্রশ্ন করাতে সে বলে যে, সেই বাড়ীতে একটি প্রকাণ্ড আঙ্গিনা আছে, সেখানে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বাবুজী আসিয়া বসেন এবং বহু লোক সেই সময় সেখানে আসে এবং তাহারা সকলে মিলিয়া ভাঙ্গ খায়। বাবুজীর স্নানের পূর্ব্বে তাঁহার শরীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া চাকরে তেল মর্দ্দন করিয়া থাকে। সকালে স্নানের পূর্ব্বে মুখে মাটি মাখিয়া তিনি মুখ ধোন। সে বলে, বাবুজীর দুইখানা মোটর গাড়ী ও একখানা দুই-অশ্ববাহিত ফিটন গাড়ী আছে। বাবুজীর দুইটি পুত্র ও এক পত্নী ছিল। সে বাবুজী সম্বন্ধে অনেক গোপনীয় কথা ও পারিবারিক অনেক ঘটনার বিষয়ও উল্লেখ করে।

কৈকেয়ীনন্দনবাবু আরও বলিলেন যে, বেনারসে আমার কোন আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবান্ধব নাই বা আমার পত্নী কখনও বেনারসে যান নাই। আমি পূর্ব্বে বাবুজীর নাম কখনও শুনি নাই। আমার পুত্রের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়াতে বহুলোক নানাস্থান হইতে এ বিষয়ে সবিশেষ সংবাদ জ্ঞাত হইবার জন্য আমাকে পত্র লেখেন। আমি তখন আমার বেরেলী বার লাইব্রেরীর বন্ধুগণকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলি এবং এ বিষয়ে আমার কিছু করণীয় আছে কিনা সে বিষয়ে তাহাদের উপদেশ প্রার্থনা করি।

বেরেলী বার লাইব্রেরীর বন্ধুগণের মধ্যে সৈয়দ ইউসুফ আলি, বি, এ, এল, এল, বি, উকিল ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, বাবু ব্রহ্ম নারায়ণ, বি, এ, এল, এল, বি, উকিল ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, বাবু

মুক্তবিহারী লাল, বি, এ, এল, এল, বি, উকিল, পণ্ডিত রামস্বরূপ শর্ম্মা, বি, এ, এল, এল, বি, উকিল, বাবু শৈলবিহারী কপুর, এম, এ, এল, এল, বি, উকিল এবং আইন-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য, জয়নারায়ণ চৌধুরী বি, এ, এল, এল, বি, উকিল, যুক্তপ্রদেশের আইন-সভার সভ্য, বেরেলী বার লাইব্রেরীর সেক্রেটারী এবং রায়সাহেব ডাঃ শ্যামস্বরূপ সত্যব্রত, এল, এম, এম, আসিয়া আমার পুত্র জগদীশচন্দ্রকে পরীক্ষা করেন ও নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন।

যাঁহারা আমাকে পত্র দিয়াছিলেন, সংবাদপত্র মারফৎ এবং পত্রদ্বারা তাঁহাদিগকে জানাই যে, যদি এ বিষয়ে তাঁহাদের যথার্থ আগ্রহ থাকে তবে তাঁহারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বালকের কথিত বিবরণ সত্য কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে অনেকে পরামর্শ দিলেন যে, বেনারসে একটি বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া বালকের বর্ণিত বিষয় যথার্থ কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হউক; কিন্তু আমার উকিল বন্ধুগণ আমাকে বলিলেন যে, কোন লোক পাঠাইবার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহা হইলে সংশয়বাদী যাহারা তাহারা বলিবে যে, বেনারসের বাবুজী ও তাহার বাড়ী প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্যাদি সেই প্রেরিত লোক মারফৎ অবগত হইয়া বালক ঐরূপ বর্ণনা দিতেছে। উকিল বন্ধুদের উপদেশ অনুসারে বেনারসে লোক না পাঠাইয়া বেনারস মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মুন্সি মহাদেবপ্রসাদ, এম, এ, এল, এল, বি, মহাশয়ের নিকট বালক—বাবুজী, বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে এই অনুরোধ জানাইয়া পত্র লেখা হইল, যেন তিনি অনুসন্ধান করিয়া পত্রোত্তরে জানান যে, বালক জগদীশচন্দ্রের বর্ণিত বিষয় সত্য কিনা। ভারতের নেতৃস্থানীয় কয়েক ব্যক্তিকেও পত্রদ্বারা জানাই যে, তাঁহারা যদি প্রতিনিধি পাঠান তবে তাঁহাদের সঙ্গে বালকটিকে বেনারস লইয়া যাওয়া যাইতে পারে ও পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে যে, সে

বেনারস সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছে তাহা সে নিজে চিনিয়া লইতে পারে কিনা। কারণ, বালক যাহা যাহা বলিয়াছে তাহা আমি সংবাদপত্রে প্রকাশ করাতে বহু ভদ্রলোক—যাঁহাদের নিকট আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত—তাঁহারা বালকের কথিত বিবরণ যে সত্য তাহা পত্র মারফৎ আমাকে লিখিয়াছিলেন। তাই আমার এ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বালককে বেনারস লইয়া গেলে সে তাহার বর্ণিত স্থানসমূহ সনাক্ত করিতে পারিবে।

যাহা হউক, কয়েকদিন পরেই বেনারস মিউসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বাবু মুন্সি মহাদেবপ্রসাদের নিকট হইতে পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—

মহাশয়,—

আপনার পত্র পাইয়া আমি প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করিয়াছি। দেখিলাম যে, আপনার পুত্র যাহা যাহা বলিয়াছে তাহার সবই প্রায় ঠিক। ফিটন, একা, ঘোড়া, মালিশ, গুণ্ডা, ভাঙ্গ ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছে, বালকের সব কথাই সত্য। বাবু পাণ্ডে—যাঁহাকে আপনার পুত্র বাবুজী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে—আমার বিশেষ পরিচিত। কারণ বিগত বহু বৎসরাবধি সে আমার মক্কেল। আপনার পত্রপাঠমাত্রই আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আপনার পুত্র তাঁহার কথাই বলিতেছে। তাই যথাযোগ্য তথ্যাদি অনুসন্ধানের জন্য বাবুয়া পাণ্ডের নিকট আমি লোক পাঠাই। তাঁহার নিকট হইতে আপনার পুত্রের বিষয় অবগত হইয়া বাবুয়া পাণ্ডে লোকদ্বারা আমার নিকট হইতে আপনার লিখিত পত্রখানি লইয়া গিয়াছেন। তাহারা নিজেরাই বিষয়টি ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সম্ভবতঃ শীঘ্রই বেরেলী রওনা হইবে। বাবুয়া পাণ্ডের প্রকৃত নাম পণ্ডিত মথুরাপ্রসাদ পাণ্ডে, তাঁহার বাড়ী বেনারস সিটিতে পাণ্ডে ঘাটে।

ভবদীয়

মুন্সি মহাদেবপ্রসাদ

বাবু কৈকেয়ীনন্দন বলিতে লাগিলেন—আমি এলাহাবাদের 'লিডার' পত্রিকায় যে পত্র প্রকাশ করি, তাহা পাঠ করিয়া বেনারসের উকিল পণ্ডিত উমাকান্ত পাণ্ডে আমাকে পত্র লেখেন—

"লিডার-পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার পত্র দেখিয়াছি। বাবুয়া পাণ্ডে আমার বিশিষ্ট বন্ধু। পাণ্ডে-পরিবারের যে ছেলেটির মৃত্যু হইয়াছে এবং পুনরায় যে আপনার পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে তাহাকে আমি চিনিতাম। আপনার পুত্র বাবুয়া পাণ্ডে সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা মূলতঃ সবই সত্য। বাবুয়া পাণ্ডের নিজের কোন মোটর গাড়ী নাই কিন্তু তিনি দুইখানা মোটর গাড়ী ব্যবহার করেন। আপনার পুত্রের বিষয় আমি বাবুয়া পাণ্ডেকে জানাইব এবং শীঘ্রই আমরা একসঙ্গে বেরেলীতে আপনার পুত্রকে দেখিতে যাইব।"

কৈকেয়ীবাবু আমাকে উপরোক্ত ভদ্র-মহোদয়ের পত্র দুইখানি আনিয়া দেখাইলেন এবং বলিলেন যে, "যাঁহারা এ বিষয়ে আগ্রহান্বিত ছিলেন তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিলাম যে, বালকটিকে পরীক্ষা করিতে হইলে ইহাই উপযুক্ত সময়, কারণ কিছুকাল পরে হয়তো তার পূর্ব্বজীবনের স্মৃতি আর তেমন সতেজ না থাকিতে পারে বা বিস্মৃতিও আসিতে পারে।" তিনি আরও বলিলেন যে, "বেনারসের উকিল পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত পাণ্ডে, বি, এ ; এল, এল, বি, মহোদয় পত্রযোগে আমাকে জানান যে, তিনি বাবুয়া পাণ্ডের একজন প্রতিবেশী এবং তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনাই তাঁহার জানা আছে।" বাবুয়া পাণ্ডে সম্বন্ধে বালক কি বলে তাহা তিনি পত্রোত্তরে জানিতে চাহেন। পত্রে তাঁহাকে বালক জগদীশচন্দ্র কথিত নিম্নলিখিত বিবরণ জানাই—

"বাবুজীর স্ত্রীকে সকলে চাচী বলিয়া ডাকে। পাণ্ডেজী যদিও অর্থশালী লোক তথাপি বাড়ীতে রাঁধিবার জন্য কোন পাচক রাখা হয় না, সমস্ত পরিবারের জন্য রন্ধনাদি তিনিই করেন। যদিও চাচীর বয়স অনেক হইয়াছে তথাপি তিনি পর্দ্দাপ্রথা মানিয়া চলেন এবং সর্ব্বদাই ঘোমটা দিয়া থাকেন। গুণ্ডারা বাড়ীর ভিতরে আসিলে তিনি ঘোমটা আরও লম্বা করিয়া

টানিয়া দিতেন। তিনি হাতে ও কানে সোনার অলঙ্কার ব্যবহার করেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বসন্তের দাগে পূর্ণ।

"বাবুজী প্রত্যহ অহিফেন সেবন করেন। তাঁহার হাতের আঙ্গুলে সোনার অঙ্গুরী আছে। তিনি রাবড়ী খাইতে খুব ভালবাসেন। বাবুজী প্রত্যহ প্রাতে হাত-মুখ ধুইবার পর গায়ে-মুখে মাটি মাখিয়া থাকেন। বাবুজী ভগবতী নামে একজন বাঈজীর নাচ ও গান শুনিয়া থাকেন। ভগবতীর রঙ ফর্সা নহে কিন্তু তাহার গলার স্বর মিষ্ট ও তীক্ষ্ণ। বাড়ীতে কোন ক্রিয়াকর্ম্ম হইলেই তাহার নাচ-গান হয়।"

লক্ষ্মীকান্তবাবু পত্রোত্তরে আমাকে জানান যে, বালক বাবুয়া পাণ্ডে ও তাঁহার স্ত্রীর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা সবই যথার্থ। ভগবতী বাঈজী সম্বন্ধীয় তাহার উক্তিও ঠিক।

ইহার কিছুদিন পরেই বেনারস হইতে বাবুজী পাণ্ডের স্ত্রী বেচু নামে এক ব্যক্তিকে বালককে দেখিবার জন্য বেরেলীতে পাঠান এবং তাহার মারফৎ আমাকে অনুরোধ জানান যে, আমি যেন একবার বালককে সঙ্গে লইয়া বেনারস আসি। ইহার পূর্ব্বে বাবুয়া পাণ্ডেও কয়েকখানি পত্রে আমাকে পুত্রসহ বেনারসে যাইবার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। বেচু বালক জগদীশের সঙ্গে কথা বলে এবং আমাকে বলে যে, বালকের উক্তি যথার্থ।

কৈকেয়ীবাবু বলিলেন—"আমার মনে হইল, বেনারসে রওনা হইবার পূর্ব্বে এখানকার কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা বালকের বিবৃতি রেকর্ড করাইয়া লওয়া বোধ হয় ঠিক হইবে। বালককে বেনারসে লইয়া গেলে সেই বিবৃতির বিবরণ যথার্থ কিনা পরীক্ষা করার সুযোগ মিলিবে।" ২৮শে জুলাই, ১৯২৬ বেরেলীর ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রামবাবু সাকশেনা, এম, এ; এল, এল, বি, বালকের নিম্নলিখিত বিবৃতি রেকর্ড করেন।

"মেরা নাম জয়গোপাল হ্যায়। মেরা বাপকা নাম বাবু পাণ্ডে। সহর কা নাম বেনারস। গঙ্গাজী মেরা মোকান কে পাস হ্যায়। যেইসা ফটক কুয়ারপুর মে হ্যায় ওইসা উসকো ফটক হ্যায়। মেরা ভাই জয়মঙ্গল থা।

উও সুখসে বড়া থা। উও জহর খা কর মর গয়া। চাচী নে জয়মঙ্গল কো কৈ করাই থী। মৈ বাবু পাণ্ডে সে বাবু পাণ্ডে কহতা হুঁ, চাচা নহিন কহতা হুঁ। বাবু পাণ্ডে কা রূপিয়া লোহে কী আলমারিমে রহতা হ্যায়। উও বাঁয় হাতকি তরফ হ্যায়। উও দীওয়াড় মে লাগা হুয়া হ্যায়। উও গাড়্ডে মে হ্যায়। বহুত উঁচা হ্যায়। দরওয়াজে পর সিপাহী রহতে হ্যায়। বাবুজীকো রাবড়ী পছন্দ হ্যায়। সাম কো লোগ ভাঙ্গ পিতে হ্যায়। বাবুজী মুহ্ ধোতে হ্যায় তো উও আপনে মুহ্ পর মিট্টি কি মালিশ করতে হ্যায়। উসকো পাস সওয়ারী ফিটন হ্যায়। দো ঘোড়ে লাগতে হ্যায়। আউর মোটর কার হ্যায়। চাচী সোনে কি কড়ে পহিনতী হ্যায়। কানোনমে বন্ধে পহনতী হ্যায়। বাবুজী অঙ্গুঠী পহনতা হ্যায়। চাচী বহুত বড়া ঘুঙ্ঘট করতী হ্যায়। দশাশ্বমেধ ঘাট হ্যায়। গঙ্গাজী উসকী পাস হ্যায়। চাচী রোটী করতি হ্যায়। মৈ টিকোনি পহিনকে নাহাতা যাতা। উমাকান্ত জয়মঙ্গলকে বাপকে শালে হ্যায়। বিশ্বনাথজী কী মন্দির মে মৈ জাতা থা। বাবুজীকো পাস কালা চশমা হ্যায়। বাবুজী ভগবতী বাঈজী কী গানা শুনতে হ্যায়।”

বাবু কৈকেয়ীনন্দন আমাকে আরও বলিলেন যে, পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, জয়গোপালের বয়স যখন দশ কি এগারো বৎসর তখন সে মারা গিয়াছিল। পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত আরও জানান যে, জয়গোপাল বাবু পাণ্ডের পৌত্র অর্থাৎ তাহার কন্যার সন্তান। উক্ত কন্যা বাবু পাণ্ডের বাড়ীতেই থাকিত। কন্যার মৃত্যুর পর বাবু পাণ্ডেই তাহাকে লালনপালন করেন এবং পৌত্র জয়গোপাল বাবু পাণ্ডেকেই পিতা বলিয়া জানিত ও সম্বোধন করিত। আমার পুত্র জগদীশ বাবু পাণ্ডেকে যে পিতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিল তাহার কারণ উক্তরূপ হওয়া সম্ভব বলিয়া আমার মনে হইল।

লিডার-পত্রিকায় আমার পুত্র জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধীয় সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর বহুলোক এ বিষয়ের সত্যাসত্য জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় বহুলোক আমার বাড়ীতে সমবেত হইতে লাগিল এবং প্রত্যেকেই বালকের নিজ মুখ হইতে সব বিষয় জানিতে

চাহিত। লোকের সহিত অনবরত দেখা করিয়া ও কথা বলিয়া জগদীশচন্দ্র এতই ক্লান্ত হইয়া পড়িল যে, সে আর লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করিয়া বসিল ও অসুস্থও হইয়া পড়িল।

বন্ধুবর্গের পরামর্শানুসারে অবশেষে জগদীশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বেনারস যাইতে মনস্থ করিলাম, কিন্তু ভয় হইল, পাছে অতিরিক্ত লোকের ভিড়ে বালক ক্লান্ত ও অসুস্থ হইয়া পড়ে। তাই বেনারসের তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ভি, এন্, মেটা, আই, সি, এস-কে পত্রদ্বারা জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। পত্রোত্তরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট-মহোদয় সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া পত্র লিখিলেন। তাঁহার পত্র পাইয়া ১৩ই আগষ্ট তারিখ পুত্র-পত্নী প্রভৃতি সহ বৈকালে বেরেলী হইতে রওনা হইয়া তাহার পরদিন প্রাতে বেনারস পৌঁছিলাম। আমাদের আগমন-সংবাদ কাহাকেও না দিয়া বাবুয়া পাণ্ডের বাড়ী হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে নাদেশ্বরে আমরা আসিয়া অবস্থান করি। দুর্ভাগ্যক্রমে, কি প্রকারে জানি না, আমাদের আগমন-সংবাদ গোপন রহিল না—সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র অসংখ্য জনতা আমাদের নিবাসস্থল ঘেরাও করিয়া ফেলিল। জনতার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আমাকে পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইল; কিন্তু পুলিশ চেষ্টা করিয়াও জনতার ভিড় কমাইতে পারিল না। জনতার ভিড়ে আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। বাবু হনুমান প্রসাদ সাব-জজ, ডাঃ গণেশ প্রসাদ, মিঃ ট্যাণ্ডন ইনকামট্যাক্স অফিসার এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি দেখা করিতে আসিলেন। উকিল পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত দেখা করিতে আসিলে জগদীশ তাঁহাকে চিনিতে পারিল এবং প্রথমে বলিল যে, তাঁহার নাম উমাকান্ত; কিন্তু লক্ষ্মীকান্তবাবু বলিলেন যে, তাঁহার নাম উমাকান্ত নহে, তখন বালক বলিল যে, তাহা হইলে তাঁহার নাম লক্ষ্মীকান্ত—কারণ, লক্ষ্মীকান্ত ও উমাকান্ত দুই ভাই-এর চেহারা প্রায় একই রকম। সেই সময়ে বহু বিশিষ্ট লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাবুয়া পাণ্ডের সহিত লক্ষ্মীকান্তবাবুর সম্বন্ধ কি তাহাও বালক ঠিক ঠিক বলিয়া দেয়।

জগদীশচন্দ্র সহ আমরা সেইদিন অপরাহ্ণে বাবুয়া পাণ্ডের বাড়ী যাইব স্থির হইল। আমরা সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, এ, মেটা, সহর কোতোয়াল ও আট জন কনেষ্টবল সহ উপস্থিত ছিলেন। বাবুয়া পাণ্ডের বাড়ী যাইতে হইলে নানা অলি-গলি ঘুরিয়া যাইতে হয়—বালক জগদীশচন্দ্র-প্রদর্শিত পথ ধরিয়া নানা সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর দিয়া বাবুয়া পাণ্ডের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম—আমাদের সঙ্গে শহরের বহু বিশিষ্ট লোক ছিলেন।

বাবুয়া পাণ্ডের বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিলাম, চতুর্দ্দিক্ লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। বাড়ীর আশে-পাশের ছাদে, অলিন্দে, রাস্তায় কোথায়ও তিল ধারণের স্থান নাই—পুলিশের সাধ্য কি যে সে জনতাকে হটাইয়া দেয়। এমন কি বাবুয়া পাণ্ডে যে ঘরে থাকিত সেই ঘরে পুলিশের সাহায্যে অতি কষ্টে বালককে লইয়া গেলে দেখা গেল যে, সেই ঘরের মধ্যে অন্যূন চল্লিশ জন লোক গায়ে গা লাগাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। অত্যধিক ভিড়ের চাপে বালক (তখন তাহার বয়স সাড়ে ছয় বৎসর মাত্র) অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল এবং কোন কথাই বলিতে চাহিল না। কিছুক্ষণ পরেই ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব চলিয়া গেলেন। বালককে তাহার পর তাহার নির্দ্দেশ অনুসারে অন্য বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে বাবুয়া পাণ্ডে কোথায় বসিয়া ভাঙ্গ খাইত তাহা সে সকলের সমক্ষে দেখাইয়া দেয়। ইহার পরে ম্যাজিষ্ট্রেটপত্নী বাড়ী চলিয়া গেলেন। বাড়ীর অন্দরমহলে গিয়া বালক বলিল, "এই চাচীর বাড়ী"—এই বলিয়া চাচীকে সনাক্ত করে। জনতার চাপ না কমাতে সেদিন ইহাই স্থির করা হইল যে, আর একদিন অতর্কিতভাবে বালককে লইয়া আসিতে হইবে—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সেদিন বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

১৮ই আগষ্ট বৈকালে পুনরায় বালক জগদীশচন্দ্রকে লইয়া বাবুয়া পাণ্ডের বাড়ীতে গেলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন স্থানীয় এক মেলা ছিল, কাজেই সেদিনও লোকের ভিড় এড়ান গেল না। জগদীশ সেদিন বাবুয়া পাণ্ডের সহিত কথাবার্ত্তা বলিল এবং সে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিত সমস্ত

বলিল এবং যে-কোন প্রশ্ন তিনি ইচ্ছা করিলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—এই কথা সে বাবুয়া পাণ্ডেকে জানাইল। বাবুয়া পাণ্ডে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন না।

তাহার পর বালক জগদীশচন্দ্রকে দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে লইয়া যাওয়া হইল। দূর হইতেই সে দশাশ্বমেধ ঘাট চিনিতে পারিল এবং এক পাণ্ডার ক্রোড়ে উঠিয়া যাহাকে সে পূর্ব্বজীবনের পরিচিত বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল, পরম আনন্দে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিল। বর্ষাকালের গঙ্গার খরস্রোত ও ভীষণ তরঙ্গাভিঘাত তাহার মনে বিন্দুমাত্রও ভীতির সঞ্চার করিল না। মনে হইল, সে যেন এরূপ স্নানে নিয়তই অভ্যস্ত, যদিও প্রকৃতপক্ষে ইহার পূর্ব্বে কোন দিনই সে নদীতে স্নানই করে নাই।

স্নানের পরে সেই পাণ্ডা তাহাকে পান খাইতে দিল, বালক তাহা লইল না এবং বলিল সে নিজে বড় পাণ্ডা, কাজেই ছোট পাণ্ডার প্রদত্ত পান সে গ্রহণ করিতে পারে না। জগদীশ বাবা বিশ্বনাথের মন্দির, হরিশচন্দ্র ঘাট ও কাশীর গঙ্গার উপরের ডাফরিন ব্রীজ চিনিতে পারিল। এই ব্রীজের কথা সে বেনারস আসিবার পূর্ব্বে বেরেলীর পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ নটবাওয়ার-এর নিকট বলিয়াছিল।

পরে তাহাকে বেনারস হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে লইয়া যাওয়া হইল। সে ইহাকে বিশ্ববিদ্যালয় বলিল এবং বলিল যে, তাহার সময় ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল।

কৈকেয়ীবাবু বলিলেন—তাহার পরদিন আমরা বেনারস হইতে বেরেলী-অভিমুখে রওনা হইলাম।

কৈকেয়ীবাবুর কথা শেষ হইলে আমি বলিলাম—"আপনার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে যে, বাবুয়া পাণ্ডে এ বিষয়ে তেমন আগ্রহ দেখান নাই—ইহার কারণ কি হইতে পারে?" ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন—"বালকের বর্ণিত বিষয় যে সত্য তাহা বেনারসের সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণের উক্তি হইতেই

প্রমাণিত হইয়াছিল। এমন কি, আমরা বেনারস রওনা হইবার পূর্ব্বেই পত্রাদিতে উহা প্রমাণিত হইয়াছিল। বালক বাবুয়া পাণ্ডে সম্বন্ধে দুইটি গ্লানিকর তথ্য প্রকাশ করিয়াছিল। লোকপরম্পরায় উহা বাবু পাণ্ডের কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে। তাহার পর বাবু পাণ্ডে যখন দেখিতে পাইল যে, বেনারসের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ে খুব ঔৎসুক্য দেখাইতেছেন তখন সে ভীত হইয়া পড়িল। কারণ, সে যদি সব স্বীকার করে বা আগ্রহ দেখায় তবে সকলেই বলিবে যে, উক্ত গ্লানিকর তথ্যও সত্য এবং তাহার বিরুদ্ধে এইজন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইতে পারে—এইজন্য আমার মনে হয়, সে প্রথম হইতেই এ বিষয়ে উদাসীনতার ভাব দেখাইয়াছিল।"

পুনরায় প্রশ্ন করিলাম—আচ্ছা, পূর্ব্বজীবনে মৃত্যুর পর তাহার কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি এবং সে তাহার কি উত্তর দিয়াছিল?

উঃ। মৃত্যুর পরের কথা তাহার কিছুই মনে ছিল না।

প্রঃ। আপনার কয়েকটি ছেলে আছে, আর কেহই জাতিস্মর নহে, মাত্র এই ছেলেটিরই পূর্ব্বজীবনের কথা মনে আছে। ইহার কারণ কিছু বলিতে পারেন কি? বা এই ছেলের জন্মদান সময়ে আপনার বা ছেলের মায়ের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু আভাস দিতে পারেন কি?

উঃ। আমার এই ছেলেটিই কেন জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিল তাহা তো বলিতে পারি না। অথবা জন্মদান সময়ে আমাদের মানসিক ভাব কিরূপ ছিল তাহাও বর্ণনা করা কঠিন।

প্রঃ। শুনিয়াছি, আপনি জাতিস্মরত্ব সম্বন্ধে নিজে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। যদি করিয়া থাকেন তবে খাঁটি verified case-গুলি সম্বন্ধে আমাকে বলিবেন কি?

উঃ। আচ্ছা, আর একদিন আসিলে সে সম্বন্ধে আপনাকে বলিব। আজ কথাবার্ত্তায় অনেক সময় কাটিয়াছে, রাত্রি প্রায় ন'টা বাজিতে চলিয়াছে।

চলিয়া আসিবার পূর্ব্বে বলিলাম, "জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে এত কথা শুনিলাম,

যাইবার পূর্ব্বে তাহার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া যাইব নাকি ?” জগদীশ তখন পাশের ঘরে পড়িতেছিল, কৈকেয়ীবাবু ডাকিতেই আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল এবং প্রণাম করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“তোমার নামই জগদীশ ?” সে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। পুনরায় প্রশ্ন করিলাম—“পূর্ব্বজীবনের কথা যাহা তুমি বালক-অবস্থায় বলিতে তাহা তোমার এখনও মনে আছে কি ?” উত্তরে জগদীশ বলিল, “এখন আর আমার কিছুই মনে নাই, সবই বিস্মৃত হইয়াছি।”

কৈকেয়ীবাবুকে তখন বলিলাম—“রাত্রি অধিক হইয়াছে, আর আপনার বিরক্তির কারণ হইব না।” তিনি বলিলেন—“না, আপনার সহিত আলাপে আমি মোটেই বিরক্তি অনুভব করি নাই—আপনি আবার আসিলে সুখীই হইব।” এই বলিয়া তিনি বলিলেন—“আপনি এই শহরে নূতন আসিয়াছেন, রাত্রিতে পথ চিনিয়া সারদাবাবুর বাড়ী যাওয়া আপনার পক্ষে কষ্টকর হইবে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আমার ড্রাইভারকে ডাকিয়া দিতেছি।” এই বলিয়া তাঁহার ড্রাইভারকে ডাকিয়া মোটরে করিয়া আমাকে সারদাবাবুর বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন।

ইহার পরে আবার যখন বেনারসে গিয়াছিলাম তখন পাণ্ডে-ঘাটে বাবুজী পাণ্ডের বাড়িতে গিয়া এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। বাবু পাণ্ডে তখন জীবিত ছিলেন না। বাড়ীর আর কেহ এ বিষয়ে তখন বিশেষ কোন কথা বলিতে পারিলেন না—শুধু বাবু পাণ্ডের একজন পুরাতন কর্ম্মচারী আমাকে বলিলেন যে, বালক জগদীশচন্দ্রের অনেক কথাই ঠিক ছিল, আবার কোন কোন কথা ঠিক মেলে নাই। উত্তরে আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম—যে ঘটনাসমূহ অনেকদিন পূর্ব্বে ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে কোন কোন ঘটনা যেমন ঠিক ঠিক মনে থাকে আবার কোন ঘটনা যেমন আমরা ভুলিয়া যাই—এ সম্বন্ধেও তো তেমনি হইতে পারে। তবে দেখিতে হইবে, ঘটনা সম্বন্ধে সে যাহা বলিয়াছিল তাহা মোটের উপর সত্য কিনা—২।১টি ঘটনা বা বিবরণ ঠিক নাও হইতে পারে। আমাদের এই জীবনের

অতীত ঘটনাই বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া যায়, আর এ তো তাহার পূর্ব্বজীবনের ঘটনাবলীর কথা। কাজেই সামান্য একটু-আধটু ভুলভ্রান্তি হইতেই তো পারে। উক্ত কর্ম্মচারী-মহোদয় তাহা স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, বালক জগদীশচন্দ্রের বিবরণ মোটামুটি ঠিকই ছিল।

॥ পাঁচ ॥

পরদিন পুনরায় প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে সিভিল লাইনে কৈকেয়ী-বাবুর বাড়ীতে গেলাম। তিনি বাড়ীতেই ছিলেন—আমাকে দেখিয়া স্মিতহাস্যে সম্ভাষণ জানাইয়া সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিতে অনুরোধ করিলেন। আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম—"আপনি যে-সব জাতিস্মরদের সম্বন্ধে নিজে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে, তাহাদের কথিত উক্তি যথার্থ—তাহাদের বৃত্তান্ত আপনার নিকট হইতে শুনিব বলিয়াই আজ আপনার নিকট আসিয়াছি।" এই কথা বলিয়াই আবার প্রশ্ন করিলাম—"আচ্ছা, আপনি নিজে তো এই ধরণের অনেক বালক-বালিকাকে দেখিয়াছেন কিন্তু বলিতে পারেন কি, কি হেতু তাহাদের এই স্মৃতি অব্যাহত থাকে?" উত্তরে তিনি বলিলেন—"সে বিষয়টা আমিও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই বা তাহাদের প্রশ্ন করিয়াও কোন সদুত্তর পাই নাই। প্রথমে আমার মনে হইয়াছিল যে, যাহারা শুদ্ধাচারসম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়াছে তাহারাই হয়তো এইরূপ স্মৃতির অধিকারী হয়। কিন্তু এরূপ দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বজীবনে যাহাদের নৈতিক চরিত্র ভাল ছিল না, পরজীবনে তাহারাও স্মৃতিবাহী-চেতনার অধিকারী হইয়াছে। এইরূপ কয়েকটি ঘটনা আমার জানা আছে। ধরুন না বিশ্বনাথ বলিয়া বালকটির কথা। সে এই বেরেলী শহরেই জন্ম গ্রহণ করে ১৯২১ সালের ৭ই

ফেব্রুয়ারী তারিখে—এই শহরের একপ্রান্তে থান্নু-মহল্লায়। তাহার বয়স যখন দুই বৎসর—যখন সে কেবল কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন হইতে সে আধ-আধ স্বরে 'পিলিভিত' এই কথাটি উচ্চারণ করিতে থাকে। আর একটু বড় হইলে সে তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করে, বেরেলী হইতে পিলিভিত কতদূরে এবং তিনি তাহাকে কবে পিলিভিতে লইয়া যাইবেন। তিন বৎসর বয়সে সে তাহার পূর্ব্বজীবনের সব ঘটনা বলিতে আরম্ভ করে। ভারতীয় আইন-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য ও উকিল ঠাকুর মতি সিং-এর নিকট হইতে এই বালকের কথা আমি অবগত হই এবং ২৯শে জুন, ১৯২৬ সালে এই বালককে দেখিবার জন্য যাই এবং বালকের পিতা বাবু রামগোলামকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাই যে, তিনি যেন একবার বালকটিকে সঙ্গে লইয়া পিলিভিতে যান, অন্ততঃ একবার পরীক্ষা করিয়াও তো দেখা দরকার যে, বালকের উক্তি সত্য কিনা। তাঁহাকে রাজি করাইতে না পারিয়া অবশেষে বলিলাম—আপনি যদি যান তাহা হইলে না হয় আমিও আপনার সঙ্গে যাইতে পারি।" আমার যাইবার ইচ্ছা আছে জানিয়া তিনি রাজি হইলেন এবং স্থির হইল যে, আমরা উভয়ে বালকটিকে সঙ্গে লইয়া রবিবার, ১লা আগষ্ট পিলিভিতে যাইব। আমরা ১লা আগষ্ট তারিখে পিলিভিতে যাইয়া প্রথমেই গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে উঠিলাম। বালক পিলিভিতের স্কুলের কথা বলিত, কিন্তু সে গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুল-বিল্ডিং চিনিতে পারিল না। পরে শুনিলাম, এই স্কুল-বিল্ডিং নূতন তৈয়ারী হইয়াছে। আমি পিলিভিত গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের হেডমাষ্টার রায়সাহেব বাবু আসরফি লালকে অনুরোধ জানাইলাম—তিনি যেন এই তথ্যানুসন্ধানব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেন। তিনি আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং আমাদের সঙ্গে এতদুদ্দেশ্যে নানাস্থানে গিয়াছিলেন।

আমি পূর্ব্বেই বালকের নিকট হইতে তাহার বিবৃতি লিখিয়া লইয়াছিলাম। এখন আমাদের দেখার আবশ্যক ছিল যে, তাহার বিবৃতি সত্য

কিনা। বালক বিশ্বনাথ বলিয়াছিল যে, তাহার কাকার নাম হরনারায়ণ, তাহারা জাতিতে কায়স্থ, পিলিভিত শহরের মহল্লাগঞ্জ মহল্লায় তাহাদের বাড়ী—তাহার কাকার বয়স ২০ বৎসর এবং তিনি অবিবাহিত। সে বলিয়াছিল যে, লালা সুন্দর লাল তাহার প্রতিবেশী ছিলেন, তাঁহার বাড়ীর ফটক-এর রং সবুজ বর্ণ, তাঁহার বন্দুক ও তলোয়ার আছে। তাঁহার বাড়ীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রায়ই বাঈজীদের নাচ-গান হইত।

সে তাহার বাড়ীর বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিল যে, তাহার হর্ম্ম্য দ্বিতল, তাহাতে মহিলাদের আঙ্গিনা পুরুষদের থাকিবার স্থান হইতে পৃথক ছিল। বাড়ীতে উৎসব, আমোদ-প্রমোদ, পান-ভোজন প্রায় প্রতিনিয়তই অনুষ্ঠিত হইত। তাহার পিতা ছিলেন একজন জমিদার—তিনি তাহাকে যথেচ্ছ খরচ করিবার জন্য যথেষ্ট টাকা ও নানাবিধ মনোরম পোষাক-পরিচ্ছদ দিতেন। তাহার ফলে বিলাস-ব্যসনেই তাহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল—সে অত্যন্ত পান ও বেশ্যাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং নানাবিধ কুক্রিয়ায় তাহার দিন কাটিত। বাল্যকাল হইতেই ভোগ-বিলাসের দিকে মন আকৃষ্ট হওয়ায় লেখাপড়া আর বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই—নদীর ধারের গভর্ণমেন্ট হাই স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত কোনরূপে উঠিয়াছিল। উর্দ্দু, হিন্দী জানিত, ইংরাজীও কিছু কিছু শিখিয়াছিল। মদ্য-মাংসে তাহার প্রীতি ছিল—রোহিত মৎস্য খাইতে সে অত্যধিক ভালবাসিত। তাহার বাড়ীতে একটি ঠাকুরদ্বারা ছিল—তাহার কথাও সে বলিয়াছিল।

বাবু কৈকেয়ীনন্দন বলিতে লাগিলেন—আমরা একটি টাঙ্গায় করিয়া যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে একটি বাড়ীর নিকট বালক বিশ্বনাথ টাঙ্গা থামাইতে বলিয়া টাঙ্গা হইতে নামিয়া পরলোকগত বাবু শ্যামসুন্দর লালের বাড়ী দেখাইয়া বলিল—ইহাই তাহার বাড়ী—বাড়ীর ফটক দেখাইয়া বলিল যে, ফটকের রং সবুজ কিনা দেখুন। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া আঙ্গিনা দেখাইয়া বলিল, এইখানেই বাঈজীদের নাচ-গান হইত। ইতিমধ্যে সেখানে অনেক লোকসমাগম হইল, নিকটবর্ত্তী দোকানের মালিকেরা বলিল—হ্যাঁ,

বাবু শ্যামসুন্দর লাল জীবিত থাকিতে এই আঙ্গিনায় বাঈজীর নাচ-গান প্রায়ই হইত।

ইহার অনতিদূরেই পরলোকগত জমিদার লালা দেবী প্রসাদের বাড়ী দেখাইয়া বলিল, ঐ আমার বাড়ী—ইহাই হরনারায়ণের বাড়ী। হরনারায়ণ লালা দেবী প্রসাদের পুত্র। এই প্রকাণ্ড দ্বিতল-হর্ম্ম্য এখন ভগ্নদশাগ্রস্ত—এই পরিবারের অধিকাংশ লোকই অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা বলিলেন, কালক্রমে এই স্থানের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বালক গেটের পার্শ্ববর্ত্তী বিল্ডিং দেখাইয়া বলিল—এইখানে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মদ-মাংস ও রোহিত মৎস্য খাইতাম ও বাঈজীর নাচ দেখিতাম। দর্শকদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিল—এই ভাঙ্গা বাড়ীর দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি কোন্দিকে ছিল বলিতে পার কি? বাড়ীর ভিতর একস্থানে কোণের দিকে রাবিশ ও ইটের স্তূপ ছিল, বালক তাহা দেখাইয়া বলিল যে, এইস্থানে দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি ছিল। বালকের কথা যথার্থ বলিয়া প্রতিবেশীরা বলিল। মেয়েদের মহল বাড়ীর কোন্দিকে ছিল এবং মেয়েরা দোতলায় কোন্দিককার ঘরে থাকিত, তাহাও যথার্থভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বালক সমর্থ হইয়াছিল।

বাবু কৈকিয়ীনন্দন বলিলেন, "আমি অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম—যখন বাবু ব্রজমোহন লাল নামে লালা দেবী প্রসাদের একজন বংশধর—যিনি কিছু দূরে অন্য একটি বাড়ীতে বাস করেন, একটি অতি পুরাতন বিবর্ণ ফটো আনিয়া বালক বিশ্বনাথের সম্মুখে ধরিলেন এবং বালক বিশ্বনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই ফটো কাহার বলিতে পার কি? তখন বালককে ঘিরিয়া বহু লোক উৎসুক নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়াছিল। বালক ফটোখানা নিজহাতে লইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—ইহা বাবু হরনারায়ণের ফটো—আর তাঁহার পার্শ্বে চেয়ারে উপবিষ্ট একটি বালকের ফটো দেখাইয়া বলিল, ইহাই আমার ফটো। তখন আর কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না যে, পরলোকগত বাবু হরনারায়ণের পুত্র মৃত লক্ষ্মীনারায়ণই

আবার বেরিলীর বাবু রামগোলামের পুত্র বিশ্বনাথ রূপে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। সকলেই বিস্ময়ে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল।

তাহার পর বিশ্বনাথকে লইয়া সকলে পুরাতন গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুল বিল্ডিং-এর দিকে অগ্রসর হইল। দূর হইতেই বালক ইহাকে তাহার স্কুল বলিয়া চিনিতে পারিল। স্কুল বিল্ডিং-এ গিয়া বালক তাড়াতাড়ি দক্ষিণ কোণে অবস্থিত সিঁড়ি বাহিয়া ছাদে উঠিয়া গেল—মনে হইল, যেন এ বাড়ী তাহার বিশেষ পরিচিত। কৈকেয়ীবাবু বলিলেন—"আমি ও আরও তিন-চারিজন লোক বালককে অনুসরণ করিয়া ছাদের উপরে উঠিলাম। সে ছাদ হইতে দূরে তাহাদের বাড়ী দেখাইয়া বলিল, ঐ দেখুন, আমাদের বাড়ী দেখা যাইতেছে, আর বিল্ডিং-এর পিছনের দিকের 'ডিউহা' নদী দেখাইয়া বলিল, স্কুলের পাশের এই নদীর কথাই পূর্ব্বে আপনাকে বলিয়াছিলাম।"

তাহার পর বালক বিশ্বনাথকে প্রশ্ন করা হইল।

প্রঃ। তুমি তো এই স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলে, তোমার সময়ে কোন্ ঘরে ৬ষ্ঠ শ্রেণী বসিত ?

উঃ। একটি ঘর দেখাইয়া বলিল—এই ঘরে বসিত।

দর্শকদের মধ্যে একজন, যিনি সেই সময়ে স্কুলের ছাত্র ছিলেন, তিনি বালকের উক্তি সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। তিনি বালকের সহপাঠী ছিলেন—তাঁহার পুরাতন ফটো দেখান হইলে সে তাঁহাকে তাহার বন্ধু বিশ্বম্ভর-নাথ বলিয়া চিনিতে পারে। তাহার বন্ধু বিশ্বম্ভরনাথ তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—

প্রঃ। আচ্ছা বলিতে পার কি, সে সময়ে কে আমাদের ক্লাসে অর্থাৎ ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ইংরাজী পড়াইতেন ?

উঃ। যিনি আমাদের ইংরাজী পড়াইতেন তাঁহার দাড়ি ছিল এবং তাঁহার চেহারা হৃষ্টপুষ্ট ছিল—তাঁহার নাম আমার ঠিক স্মরণ হইতেছে না। তাহার সহপাঠী বাবু বিশ্বম্ভরনাথ বলিলেন—হ্যাঁ, তাঁহার চেহারার যে বর্ণনা তুমি দিয়াছ তাহা ঠিকই—তাঁহার নাম ছিল মহম্মদ মৈনুদ্দিন।

বাবু বিশ্বম্ভরনাথের নিকট হইতে জানা গেল যে, মৃত লক্ষ্মীনারায়ণ খুব ভাল তবলা বাজাইতে পারিত। তাঁহার নিকট হইতে এই কথা অবগত হইয়া ডুগি ও তবলা আনান হইল ও তাহাকে বাজাইতে দেওয়া হইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, সে অতি সহজভাবে সুন্দর ডুগি-তবলা বাজাইয়া গেল। বালক বিশ্বনাথের পিতা বাবু রামগোলাম বলিলেন—বালককে ডুগি-তবলা বাজান শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, ইহার পূর্ব্বে ডুগি-তবলা কিরূপ তাহা সে কখন চক্ষেও দেখে নাই।

বাজনা শেষ হইলে পর তাহার পুরাতন বন্ধু বাবু বিশ্বম্ভরনাথ তাহাকে পুনরায় প্রশ্ন করিল—"আচ্ছা, যে বাঈজীর সহিত তুমি খুব মেলামেশা করিতে তাহার নাম তোমার মনে আছে কি?" বালক কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু বাবু বিশ্বম্ভরনাথ তাহাকে পুনঃ-পুনঃ এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে অবশেষে নেহাৎ অনিচ্ছা সত্বেও বালক উত্তর করিল—"তাহার নাম ছিল 'পদ্মা'।" বাবু বিশ্বম্ভরনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলিয়াছ।"

কৈকেয়ীবাবু বলিলেন যে, সেই সময়ে পিলিভিতের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া রায়বাহাদুর লালা রাম-স্বরূপ, রায়সাহেব বাবু আসরফি লাল প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। পুলিশসাহেব বালক বিশ্বনাথকে তাঁহার মোটর গাড়ীতে উঠাইয়া লইলেন এবং কিছুদূর পরিভ্রমণান্তে বালককে রেল ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিলেন। ষ্টেশন-প্লাটফর্ম্মে বালককে দেখিবার জন্য জনতার ভিড় খুবই হইয়াছিল।

কৈকেয়ীবাবু আরও জানাইলেন যে, বেরেলী শহরের অধিবাসী বাবু উপেন্দ্রনারায়ণ, পরলোকগত লক্ষ্মীনারায়ণের মাতুল ছিলেন। উক্ত বাবু উপেন্দ্রনারায়ণের নিকট হইতে আমি জানিতে পারি যে, বাবু হরনারায়ণের পুত্র উক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ ১৯১৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে সাজাহানপুরে জ্বর ও ফুস্‌ফুস্‌-ঘটিত রোগে মারা যায়। পাঁচ মাস রোগযন্ত্রণা ভোগ করিবার পর ৩৩ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়।

বাবু উপেন্দ্রনারায়ণের নিকট হইতে আরও জানিতে পারি যে, বালক বিশ্বনাথ তাঁহাদের পারিবারিক এমন কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছে যাহা তাঁহারা সকলেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি বালক বিশ্বনাথ সম্বন্ধে আর একটি আশ্চর্য্যজনক কথা বলেন। তিনি বলেন—"বিশ্বনাথ পূর্ব্বজন্মে লক্ষ্মীনারায়ণ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই লক্ষ্মীনারায়ণেরও আবার তৎ-পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণে ছিল। সে বলিত যে, ইহার পূর্ব্বজন্মে সে জাহানা-বাদে জন্মিয়াছিল—ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক লক্ষ্মীনারায়ণের পূর্ব্বজীবনের কথা মনে ছিল, তাহার পর সে সব ভুলিয়া গিয়াছিল। লক্ষ্মীনারায়ণের পিতা-মাতা বালককে জাহানাবাদ লইয়া গিয়া ইহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। কারণ, তাঁহাদের এরূপ কুসংস্কার বদ্ধমূল ছিল যে, এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা বালকের জীবনের পক্ষে হানিকর হইবে। কাজেই তাঁহারা নিজেও এ বিষয়ে যথার্থ পরীক্ষা করেন নাই বা অন্য কাহাকেও এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে দেন নাই।

বাবু উপেন্দ্রনারায়ণের কথা সত্য হইলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বেরেলীর বালক বিশ্বনাথ পূর্ব্বজীবনে পিলিভিতের লক্ষ্মীনারায়ণ রূপে জন্মিয়াছিল। আবার এই লক্ষ্মীনারায়ণও তাহার পূর্ব্বজন্মে জাহানা-বাদের কাহারও গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

বালক বিশ্বনাথের পূর্ব্বজীবনের মাতা অর্থাৎ মৃত লক্ষ্মীনারায়ণের মাতা সেই সময় জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা বেরেলীর বাবু উপেন্দ্রনারায়ণের গৃহে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছিলেন। বালক বিশ্বনাথকে উপেন্দ্রনারায়ণের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। মহিলাগণের মধ্য হইতে বালক আপনার পূর্ব্বজীবনের মাতাকে চিনিয়া লইল। অতঃপর তাহার পূর্ব্বজীবনের মাতা বালক বিশ্বনাথকে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেন—বালক বিশ্বনাথ তাহার যথাযথ উত্তর দেয়—ইহাতে মাতার দৃঢ় ধারণা হইল যে, এই বালকই তাঁহার মৃত পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ।

প্রঃ। ছেলেবেলায় তুমি কী খেলা করিতে সব চেয়ে বেশী ভালবাসিতে?

উঃ। আমি ঘুড়ি উড়াইতে বেশী ভালবাসিতাম।

প্রঃ। ঘুড়ি উড়ান ব্যাপারে কাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে বলিতে পার কি ?

উঃ। ছেলেদের মধ্যে যাহারাই ঘুড়ি উড়াইত তাহাদের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা করিতাম—তবে সুন্দরলালের ঘুড়ির সঙ্গেই আমার প্রায়ই প্রতিযোগিতা হইত।

প্রঃ। আচ্ছা, আমি আচার তৈয়ারী করিয়া রাখিতাম, সে সম্বন্ধে কোন বিশেষ ঘটনা তোমার মনে আছে কি ?

উঃ। তুমি আচার তৈয়ারী করিয়া পাত্রে রাখিতে, তাহাতে পোকা জন্মিত। একদিন আচার খাইতে চাহিলে—তোমার ইচ্ছা ছিল না যে, আমি আচার খাই—তুমি পোকা শুদ্ধ আচার আমাকে খাইতে বলিলে। আমি ভাবিলাম, পোকা খাওয়া যায় কিরূপে ? তাই আমার ভীষণ রাগ হইল। পরে যখন তুমি পোকাগুলি বাছিয়া আচার রৌদ্রে দিয়াছিলে তখন আমি তোমার সেই আচার ফেলিয়া দিয়াছিলাম।

প্রঃ। তুমি কি কখনও কোন চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়াছিলে ?

উঃ। হ্যাঁ, আমি কিছুদিন O. R. Railway-তে চাকুরী করিয়াছিলাম।

প্রঃ। সে সময় তোমার নিজের কোন পরিচারক ছিল কি ?

উঃ। মাইকুয়া নামে আমার এক প্রিয় ভৃত্য ছিল, সেই আমার খানসামার কাজ করিত। সে জাতিতে কাহার ছিল, দেখিতে খর্ব্বাকৃতি ও তাহার গায়ের রং ছিল কাল।

বিশ্বনাথের পূর্ব্বজীবনের মাতা তাহাকে যখন এইরূপ প্রশ্ন করিতেছিলেন সেই সময় সেখানে বাবু সীতারাম (যিনি পূর্ব্বে পিলিভিত হাইস্কুলে শিক্ষকতা করিতেন ও বর্ত্তমানে বেরেলী গভর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষক) উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, আমি তোমাকে কি পড়াইতাম বলিতে পার কি ?" বালক উত্তর করিল—"আপনি আমাদের হিন্দী পড়াইতেন।"

বিশ্বনাথ সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর কৈকেয়ীবাবু বলিলেন যে, বিশ্বনাথের পূর্ব্বজীবনের একটি ঘটনা সম্বন্ধে আমার উকিল-বন্ধু বাবু জোয়ালা প্রসাদের নিকট হইতে আর একটি প্রমাণ পাইয়াছি। তিনি বলিতে লাগিলেন—একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নিকট বিশ্বনাথের পূর্ব্বজীবনের কথা বলিতেছিলাম এবং এই বালকই যে পূর্ব্বে পিলিভিতে লক্ষ্মীনারায়ণরূপে জন্মিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমি পাইয়াছি এরূপ বলিলাম এবং সেই সম্পর্কে বাঈজী পদ্মার নামও উল্লেখ করিলাম। এই কথা শুনিয়া বাবু জোয়ালা প্রসাদ বলিলেন, "আমার মনে পড়িতেছে, অনেকদিন পূর্ব্বে বেশ্যা পদ্মার একটি মোকর্দ্দমা আমি করিয়াছিলাম, সেই মোকর্দ্দমায় লক্ষ্মীনারায়ণ বলিয়া এক ব্যক্তি জড়িত ছিল বলিয়া আমার মনে হইতেছে। আমার পুরানো কেস-ডায়েরী দেখিলে এ বিষয়ে সঠিক বলিতে পারিব।" এই বলিয়া অনেক খোঁজ করিয়া তাঁহার একখানা পুরাতন কেস-ডায়েরী বাহির করিয়া আনিলেন এবং আমাকে দেখাইলেন যে, ১৯১৮ সালে ১৯৩ ধারা আই, পি, সি, অনুসারে একটি ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় পিলিভিতের লক্ষ্মীনারায়ণের পক্ষে তিনি উকিল ছিলেন। এই মোকর্দ্দমার ঘটনা বেশ্যা 'পদ্মা' সম্পর্কিত এবং ঘটনার অকুস্থল বাঈজী 'পদ্মা'র বাটী।

বিশ্বনাথের কথা শেষ হইবার পর বাবু কৈকেয়ীনন্দন বলিলেন—"দেখুন না, এই বিশ্বনাথের পূর্ব্বজীবন অর্থাৎ লক্ষ্মীনারায়ণের জীবনযাপন-প্রণালী মোটেই শুদ্ধভাবাপন্ন ছিল না। শুধু তাহাই নয়, বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, তাহার নৈতিক চরিত্র খুব খারাপই ছিল অথচ দেখিতেছি, সে এই জীবনে—যাহাকে আপনি স্মৃতিবাহী-চেতনা বলিয়া বলিতেছেন—তাহার অধিকারী। তাই আমিও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না কি কারণে, বা কারণ-সমবায়ে মানুষ এই স্মৃতির বা জাতিস্মরত্বের অধিকারী হয়।"

বেলা অধিক হওয়াতে সেদিনকার মত তাঁহার নিকট বিদায় চাহিলাম। তিনি বলিলেন, "আমি খুব খুশি হইতাম, যদি আপনি দয়া করিয়া আমার বাড়ীতে আসিয়া অবস্থান করিতেন।" আমি বলিলাম, "এবারে সারদাপ্রসন্নবাবুর

বাসায় আসিয়া উঠিয়াছি, ভবিষ্যতে বেরিলীতে আসিলে আপনারই অতিথি হইব।"

॥ ছয় ॥

সেইদিন বাবু কৈকেয়ীনন্দনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিবার পর আর দুই দিন তাঁহার নিকট যাই নাই। প্রথম দিন সকালে স্থানীয় কলেজে গেলাম; সেখানে প্রফেসারদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইল ও প্রসঙ্গতঃ নানা বিষয়ের আলোচনা হইল। সন্ধ্যায় কলেজের অনেকগুলি ছাত্র জাতিস্মরত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আমার বাসায় আসিল। রাত্রি নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। তাহার পরদিন সকালে আর কোথায়ও বাহির হই নাই। বৈকালে শহরের দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দেখিয়া বাসায় ফিরিলাম।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—পূর্ব্বের দিন বাবু কৈকেয়ীনন্দনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিবার সময় হলদোয়ানী রেলওয়ে ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টারকে খবর দিবার জন্য বলিয়া আসিয়াছিলাম, যাহাতে তিনি কৈকেয়ী-বাবুর বাড়ীতে আসিয়া আমার সহিত দেখা করেন। কারণ, কৈকেয়ীবাবুর নিকট হইতেই শুনিয়াছিলাম যে, হলদোয়ানী ষ্টেশনের ভূতপূর্ব্ব ষ্টেশন-মাষ্টার বাবু শ্যামবিহারী লালের কন্যা হীরা কুয়ঁার জাতিস্মর। আরও শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, এই বালিকাটি পূর্ব্বজীবনে পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু এ-জীবনে কন্যারূপে আসিয়াছে। জাতিস্মরদের সম্বন্ধে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া দেখিয়াছি যে, সাধারণতঃ তাহাদের sex বা যোনির পরিবর্ত্তন হয় না অর্থাৎ পূর্ব্বজীবনে যে পুরুষ হইয়া জন্মিয়াছিল, পরবর্ত্তী জীবনে সে আবার পুরুষরূপেই জন্ম-পরিগ্রহ করে, গত জীবনে যে স্ত্রীরূপে

জন্মগ্রহণ করে, পরের জীবনেও সে স্ত্রীর শরীর ধারণ করিয়াই সংসারে আসিয়া থাকে। জাতিস্মরদের শরীর-ধারণ সম্বন্ধে আমার এই ধারণাই প্রায় বদ্ধমূল হইয়াছিল। কারণ, ইহার বিপরীত কোন দৃষ্টান্ত এ পর্য্যন্ত আমার গোচরে আসে নাই। কথাপ্রসঙ্গে কৈকেয়ীবাবুর নিকট হইতে জন্মান্তরের ব্যাপারে যোনি-পরিবর্ত্তনের এক বিস্ময়কর ঘটনাটি অবগত হইয়া উহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছিল এবং এই জন্যই হলদোয়ানীর ষ্টেশনমাষ্টার বাবু শ্যামবিহারী লালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলাম। অবশ্য কৈকেয়ীবাবুও আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এই একটিমাত্র দৃষ্টান্ত ছাড়া দ্বিতীয় ঘটনা তাঁহারও জানা নাই।

আমার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া কৈকেয়ীবাবু বলিলেন—বাবু শ্যাম-বিহারী লালের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় আছে। তিনি বাড়ীতে আছেন কিনা জানি না, যদি থাকেন তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে দুদিন পরে আসিয়া দেখা করিবার জন্য আজই তিনি কোন লোককে তাঁহার নিকট পাঠাইবেন। আমাকে বলিয়াছিলেন যে, দুদিন পরে তাঁহার বাড়ীতে আসিলে সম্ভবতঃ শ্যামবিহারী লালের সঙ্গে আমার দেখা হইতে পারে।

তদনুসারে দুদিন পরে বেলা প্রায় ৮টার সময় খুবই উৎকণ্ঠার সহিত সিভিল লাইনে কৈকেয়ীবাবুর বাড়ীতে গেলাম। কৈকেয়ীবাবু তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁহার পুত্র জগদীশের নিকট হইতে জ্ঞাত হইলাম যে, বাবু শ্যামবিহারী লাল তাহাদের বাটীতে আসিয়াছেন। তাহার পিতার সহিত তিনি নিকটেই কোথায়ও গিয়াছেন। যাইবার সময় তাহাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, কেহ আসিলে তাঁহাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিবে, তাঁহারা শীঘ্রই ফিরিবেন।

বেলা ৯টার সময় তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কৈকেয়ী-বাবু বাবু শ্যামবিহারী লালের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাহার পর তাঁহার সঙ্গে নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা হইল।

প্রঃ। আপনার মেয়েটির নাম ও জন্ম-সময় আমাকে বলিবেন কি?

উঃ। আমার মেয়েটির নাম হীরাকুয়ঁার, তাহার জন্ম হয় ১৯১৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে। তারিখটা আমার ঠিক মনে নাই।

প্রঃ। আপনার এই মেয়েটি কি জাতিস্মর?

উঃ। হ্যাঁ; কিন্তু সে যে জাতিস্মর প্রথমে আমরা তাহা বুঝিতে পারি নাই।

প্রঃ। কিরূপে উহা বুঝিতে পারিলেন?

উঃ। আমি ১৯২২ সালে আমার স্ত্রী, কন্যা ও একটি পাহাড়িয়া ভৃত্য সঙ্গে লইয়া তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। আগষ্ট মাসে আমরা মথুরা যাইয়া পৌঁছি। গোকুলে যাইবার জন্য আমরা একটি নৌকা ভাড়া করি। গোকুলে পৌঁছিয়া একটি স্থানে আমার কন্যাটি আমার পাহাড়িয়া ভৃত্যের কোল হইতে মাটীতে নামিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। যেস্থানে যাত্রীদিগকে নন্দ-যশোদার পুরাতন বাটী ছিল বলিয়া পাণ্ডারা দেখাইয়া থাকে—ইহা তাহারই সন্নিকটে। ভৃত্যটি তাহাকে ক্রোড় হইতে নামাইতে অস্বীকার করায় সে ক্রন্দন সুরু করিয়া দিল এবং একরূপ জোর করিয়াই সেখানে ভৃত্যের ক্রোড় হইতে নামিয়া পড়িল। উক্ত নন্দ-যশোদার বাড়ীর নিকটেই একটি বাড়ীর দ্বারদেশে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক উপবিষ্টা ছিলেন। বালিকাটি ভৃত্যের ক্রোড় হইতে নামিয়াই একদৌড়ে সেই বাড়ীর দ্বারদেশে উপবিষ্টা সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির পাশ দিয়া সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার মাতা কন্যার এই অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইল ও সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

মেয়েটি ও তাহার মা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই দ্বারদেশে উপবিষ্টা স্ত্রীলোকটিও বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, আমি ও আমার ভৃত্যটিও বৃদ্ধার পশ্চাদনুসরণ করিলাম।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া মেয়েটি সবিস্ময়ে চারিদিকে তাকাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল—একি! আমার সেই তক্তি কোথায় যাহার উপর

আমি লিখিতাম? আমার কলমগুলিই বা কি হইল? আমি উহা ঐ কুলুঙ্গিতে রাখিতাম—তাহাও তো সেখানে দেখিতেছি না! আমার চৌকিও তো দেখিতেছি না—আমি চৌকীতে বসিয়া তক্তির উপর লিখিতাম—কিছুই তো দেখিতেছি না। কে উহা এখান হইতে সরাইয়া ফেলিল?"

বালিকাটির এই সব প্রশ্ন শুনিয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি রোদন করিতে লাগিলেন। বালিকাটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটিকে বলিল—"আমার যে সরৌতা (যাঁতি) আছে তাহার দ্বারা সুপারি কাটিয়া মাকে পান তৈয়ারী করিয়া দাও।" বালিকার কথা শুনিয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি একটি যাঁতি বাহির করিয়া আনিলেন। পান তৈয়ারী করিয়া আমার স্ত্রীকে খাইতে দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"সে অর্থাৎ মেয়েটি তাহার নিজের বাড়ীতে আসিয়াছে, উহাকে তোমরা এখানে রাখিয়া যাও।" এই বলিয়া সেই বৃদ্ধা বলিলেন যে, তাঁহার একটি মাত্র পুত্র ছিল--তাহারই এই সব চৌকি-তক্তি ছিল। সে বার বৎসর বয়সের সময় যমুনায় স্নান করিতে যাইয়া জলে ডুবিয়া মারা যায়।

এই সব ব্যাপার দেখিয়া ও শুনিয়া আমার স্ত্রী অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল এবং আমিও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। কি করিব কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। এমন সময় আমার স্ত্রী মেয়েটিকে বাড়ীর বাইরে লইয়া যাইবার জন্য তাহার হাত ধরিল। মেয়েটি মায়ের হাত হইতে নিজের হাত ছিনাইয়া লইয়া—এই বাড়ী হইতে সে যাইবে না, এ তাহার নিজের বাড়ী, ইহা ছাড়িয়া সে অন্য কোথাও যাইবে না, এই কথা বলিল। আমার স্ত্রী ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝিয়া আমার সেই পাহাড়িয়া ভৃত্যকে চীৎকার করিয়া বলিল—"তুই মেয়েটিকে জোর করিয়া বাহিরে লইয়া চল।" এই কথা শুনিয়া ভৃত্যটি মেয়েটিকে বলপূর্ব্বক কোলে তুলিয়া লইয়া বাড়ীর বাহিরে চলিয়া আসিল, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিলাম। মেয়েটির চীৎকারে পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধাটিও রোদন করিতে করিতে বাটীর বাহিরে আসিলেন।

বাড়ীর বাহিরে আসিয়া আমি বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম।

মেয়ের মা মেয়েটির চীৎকার থামাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের ক্রন্দন শান্ত হইতে কিছু সময় লাগিল। বৃদ্ধা ও মেয়ে উভয়ে শান্ত হইলে আমি বৃদ্ধাকে বলিলাম—"আমরা যমুনার তীরে যাইতেছি, আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন।"

আমরা সকলেই যমুনা-তীরে আসিলাম এবং মুড়ি ও ছোলা-ভাজা কিনিয়া যমুনায় কচ্ছপদের খাইতে দিতে লাগিলাম। আমার কন্যা হীরা-কুয়ঁার যমুনা নদী ও কচ্ছপ দেখিয়া বলিল—'পূর্ব্বজন্মে আমি জলে ডুবিয়া মরিয়াছিলাম, আবার তোমরা আমাকে জলে ডুবাইয়া মারিতে যমুনায় লইয়া আসিয়াছ।' বালিকার এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধাটি পুনরায় ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধাকে সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিয়া আমি আমার মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম —পূর্ব্বজীবনে তুমি কোথায় ডুবিয়াছিলে দেখাইয়া দিতে পার কি? তখন সে অঙ্গুলীদ্বারা একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল—"ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া আমি স্নান করিতেছিলাম, হঠাৎ পা পিছলাইয়া যাওয়াতে গভীর জলে যাইয়া পড়ি, তাহাতেই জলমগ্ন হইয়া আমার মৃত্যু হয়।" বৃদ্ধাটি তখন বাষ্পাকুল নয়নে বলিলেন—"চার বছর পূর্ব্বে আমার বার বৎসর বয়স্ক একমাত্র পুত্র ঐস্থানে ঐরূপ অবস্থায় জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছিল।"

বাবু শ্যামবিহারী বলিতে লাগিলেন—"তখন বৃদ্ধাকে লইয়া আমরা বড় মুস্কিলে পড়িলাম। বৃদ্ধাটি তাঁহার মৃতপুত্র বিবেচনায় কন্যাটিকে ছাড়িতে চাহেন না, আবার কন্যাটিও মথুরায় থাকিয়া যাইবার জন্য বায়না ধরিল। এই উভয়-সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বৃদ্ধাকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া বলিলাম—'আপনি এখন বাড়ীতে যান, আপনি যখনই আমার মেয়েটিকে দেখিতে চাহিবেন, আমাকে খবর দিলে আমি নিজেই পারি বা আর কাহাকেও সঙ্গে দিয়া মথুরায় পাঠাইয়া দিব।" তাঁহাকে এইরূপ নানা কথা কহিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া সেই রাত্রিতেই স্ত্রীকন্যা সহ আমার কর্ম্মস্থানে চলিয়া আসিলাম।

প্রঃ। বৃদ্ধার সেই দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক ছেলেটির মৃত্যু কোন্ সালে হইয়াছিল তাহা তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন কি ?

উঃ। হ্যাঁ। তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম যে, ছেলেটি ১৯১৮ সালে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর পরে মারা যায়।

প্রঃ। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, আপনার মেয়ের জন্ম হয় ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবং আপনি তীর্থযাত্রা করেন ১৯২২ সালের আগষ্ট মাসে অর্থাৎ মেয়েটির বয়স যখন প্রায় তিন বৎসর। আচ্ছা, তীর্থযাত্রা করিবার পূর্ব্বে সে কখনও তাহার পূর্ব্বজীবনের কথা কিছু বলিয়াছিল কি ?

উঃ। না. মথুরার এই ঘটনার পূর্ব্বে এই সম্বন্ধে কোন কিছুই জানিতে পারি নাই।

প্রঃ। মথুরা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে কি মেয়েটি তাহার পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিয়াছে ?

উঃ। না, আর কোন কথা বলে নাই, কেবল মাঝে মাঝে বায়না ধরিত, আমাকে মথুরায় লইয়া চল, আমি আমার বাড়ী যাইব। আর আমিও এ সম্বন্ধে কোন কিছু বলা পছন্দ করি নাই বা তাহাকে কোন প্রশ্রয়ও দিই নাই।

বাবু শ্যামবিহারী লালের সঙ্গে এইরূপ আলাপ-আলোচনার পরে তাঁহার ও কৈকেয়ীবাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। ইহার পরে যখন আমি নিজে মথুরায় যাই তখন এই মেয়েটি সম্বন্ধে মথুরার এক পাণ্ডার দ্বারা অনুসন্ধান করাইয়াছিলাম—তখন এই বৃদ্ধাটি মারা গিয়াছিলেন, আর কেহ এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিল না।

পরদিন বেরেলী ত্যাগ করিব মনস্থ করিয়া কৈকেয়ীবাবু ও তাঁহার পরিজনবর্গের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিবার মানসে তাঁহাদের বাড়ীতে গেলাম। আমার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করাতে কৈকেয়ীবাবু বলিলেন —"এত শীঘ্রই চলিয়া যাইবেন তাহা ভাবিতেও পারি নাই।" আমি বলিলাম—"যে কার্য্যের জন্য এখানে আসিয়াছিলাম তাহা সমাধা হইয়াছে,

এখন আর বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া ঐ একই উদ্দেশ্যে অন্যত্র যাইতে প্রস্তুত হইয়াছি।”

তাঁহাকে বলিলাম—“ইতিপূর্ব্বে আপনাকে বলিয়াছি, আমার ধারণা ছিল—যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ, সদাচারী, ন্যায়বান্, সংযমী, উদার প্রভৃতি গুণসম্পন্ন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। আমাদের শাস্ত্রাদিরও অভিমত তাহাই। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

“বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ।
অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিস্মরত্বি পৌর্ব্বিকীম্॥”

সুতরাং জগদীশ ও বিশ্বনাথের জাতিস্মরত্ব লাভ কি করিয়া সম্ভব হইল তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। কারণ, পূর্ব্বজীবনে তাহাদের নৈতিক চরিত্রই ভাল ছিল না।” উত্তরে তিনি বলিলেন, “আমিও তো ঠিক ইহা বুঝিতে পারি নাই। আচ্ছা, আপনি যখন আশ্রমে ফিরিয়া যাইবেন, তখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি যাহা বলেন তাহা আমাকে জানাইবেন কি? তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষেরাই এ বিষয়ে সমাধান দিতে পারেন।” আমি বলিলাম—“আশ্রমে পৌঁছিয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি যাহা বলেন তাহা আপনাকে জানাইব।” বহুস্থান ঘুরিয়া আশ্রমে পৌঁছিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—“জগদীশ ও বিশ্বনাথ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন যে, হয়তো কোন একটি প্রবৃত্তি তাহারা সংযত করিতে পারে নাই, এবং তাহাদের প্রবৃত্তির এই অসংযত ভাব তাহারা নিজেরাই পছন্দ করিত না, এবং ঐ প্রবৃত্তিকে বশে আনিবার চেষ্টাও তাহাদের ছিল, কিন্তু সরল, উদার, প্রেমপূর্ণ হৃদয় নিশ্চয়ই তাহাদের ছিল।” পত্রদ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিমত কৈকেয়ীবাবুকে জানাইয়াছিলাম।

কৈকেয়ীবাবুকে আরও বলিলাম যে, গতকল্য বাসায় যাইয়া বাবু শ্যামবিহারী লালের কন্যা হীরাকুয়ঁারের কথাও অনেক ভাবিয়াছি। পৌরাণিক উপাখ্যানাদিতেও জাতিস্মরদের এরূপ যোনি-পরিবর্ত্তনের

কোন দৃষ্টান্ত আছে বলিয়া আমার জানা নাই। বুদ্ধজাতকে ভগবান্ তথাগতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহুজীবনের বহু ঘটনার উল্লেখ আছে। বহু পশু-জীবনের মধ্য দিয়া ক্রমে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, ক্রমপাদক্ষেপে উন্নততর জীবন লাভ করিতে করিতে তিনি অবশেষে মহারাজ শুদ্ধোদনের পুত্র 'গৌতম' রূপে জন্মলাভ করিয়া কঠোর-সাধনায় বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া সমগ্র জগতে ভগবান্ শ্রীবুদ্ধরূপে আখ্যাত হইয়াছেন। বুদ্ধজাতক গ্রন্থে বর্ণিত এই সব উপাখ্যানের ভিতর কোথায়ও তো দেখি নাই—(এমন কি বর্ণিত বহু পশুজীবনেও) যে-কোন জন্মে তিনি স্ত্রী-শরীর ধারণ করিয়াছিলেন। জাতকের উপাখ্যানসমূহের সত্যতা সম্বন্ধে অনেকে সংশয় প্রকাশ করিয়া থাকেন—কিন্তু এই বিষয়ে ইহার মর্ম্মার্থ স্পষ্ট। ইহা ছাড়াও ভারতের এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহের যে-সব জাতিস্মরদের বিবরণ আমি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে জাতিস্মরদের যোনি বিষয়ে এরূপ ব্যতিক্রমী চলন কোথায়ও পাই নাই। সেই জন্য বাবু শ্যামবিহারী লালের কন্যার এই দৃষ্টান্ত আমাকে বড় সংশয়ে ফেলিয়াছে। আমার মনে হইতেছে, এই দৃষ্টান্তটি একটি white crow-র (সাদা কাকের) মত। এ-সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান আবশ্যক এবং তাহা করিতে গেলে গোকুলের স্থানীয় লোকের সাহায্যের প্রয়োজন। আপনি যদি এ-বিষয়ে আমার সহ-যোগিতা করেন, তাহা হইলে খুবই আনন্দিত হইব।

কৈকেয়ীবাবু বলিলেন—"দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, ঐ অঞ্চলের কাহারও সহিত আমার বিশেষ পরিচয় নাই, তবে আপনি সেখানে গেলে স্থানীয় লোকের সাহায্য পাইবেন বলিয়া আশা করি। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সেখানে গিয়া স্থানীয় লোকের সাহায্যে অনুসন্ধান করিয়াও কোন সুস্পষ্ট আলোক পাই নাই এবং এই বিষয়ে আমার মন সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত নহে।"

॥ সাত ॥

তাঁহার সহিত এইরূপ কথা হইবার পর তাঁহাকে আরও বলিলাম যে, এ বিষয়ে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া আমি আরও একটি বিষয় ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছি। মুসলমান-সম্প্রদায় জন্মান্তরে বিশ্বাসী নহে। যখন পাশ্চাত্যদেশে ক্রিশ্চিয়ান-সম্প্রদায়ের মধ্যেও যাহারা মুসলমানদের ন্যায় এই মতবাদে বিশ্বাসী নহে—এইরূপ জাতিস্মরদের অস্তিত্বের প্রমাণ শিক্ষিত পাশ্চাত্য দেশবাসী কর্ত্তৃক লিখিত গ্রন্থ হইতে পাইলাম, তখন আমার মনে ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, তাহা হইলে মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যেও এরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।

পূর্ব্বে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি যে, একজন প্রত্যক্ষদর্শী উচ্চশিক্ষিত মুসলমান-ভদ্রলোকের নিকট হইতে পেশোয়ারে এইরূপ একটি ঘটনার বিষয় জানিতে পারিয়া সেখানে যাইয়া উক্ত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মান্ধতার দরুণ কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই।

আলিগড়ে একজন মুসলমান-ভদ্রলোকের গৃহে একটি জাতিস্মর বালকের জন্ম হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাই। ছেলেটি নাকি পূর্ব্বজন্মে হিন্দু ছিল, এ জন্মে মুসলমান-পিতার গৃহে আসিলেও তাহার পূর্ব্বসংস্কার অক্ষুণ্ণ ছিল। জ্ঞানোন্মেষের সময় হইতেই সে কাহারও উচ্ছিষ্ট খাইতে চাহিত না। যখন তাহার বয়স পাঁচ বৎসর তখন ইদপর্ব্ব উপলক্ষে তাহাদের গৃহের সন্নিকটে অনুষ্ঠিত গো-কোর্ব্বানীর সময় সেই বালকটি সেই গরুর গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল যাহাতে কেহ গো-কোর্ব্বানী করিতে না পারে। আলিগড়ে এ-বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করিতে যাইয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছিলাম। তাই কৈয়েয়ীবাবুর নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলাম যে, মুসলমান-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে এবিষয়ে কোন তথ্য সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার। আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"আমি এরূপ একটি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি এবং পাছে তাহাদের সম্প্রদায়ের সামাজিক শাসনে ইহা অস্বীকার করে, এই ভয়ে, তাহাদের নিকট হইতে ইহা

লিখাইয়া লইয়াছি ও তাহাদের স্বাক্ষর ও টীপসহি লইয়া রাখিয়াছি”—এই বলিয়া তিনি তাঁহার ফাইল আনিয়া উহা আমাকে দেখাইলেন। উহার অবিকল বঙ্গানুবাদ নিম্নে দিলাম—

তহশীল বেরেলীর অন্তর্গত করণপুর গ্রাম-নিবাসী মহম্মদ হাসান খাঁর পুত্র মহম্মদ জহন খাঁ হাফিজ (বয়স ৬৫ বৎসর)-এর বিবৃতি :—

আমার কন্যা “পীরবীন” পাঁচ বৎসর বয়সে মারা যায়। তাহার মৃত্যুর এক বৎসর পরে এই গ্রামেরই অধিবাসী মহম্মদ মাদারী খানের কন্যা ‘হুহী’র একটি কন্যা-সন্তানের জন্ম হয়। যখন সেই কন্যার বয়স পাঁচ বৎসর তখন একদিন কোন কার্য্যোপলক্ষে আমি তাহাদের বাড়ী গেলে, সে আমাকে হঠাৎ দেখিয়াই পিতা বলিয়া সম্বোধন করে। তাহার পর তাহাকে আমার বাড়ীতে আনা হইলে বহু স্ত্রীলোকের মধ্য হইতে সে আমার স্ত্রীকে তাহার পূর্ব্বজীবনের মাতা বলিয়া চিনিতে পারে। এই প্রকারে আমার দুই পুত্র মিণ্ডু ও আলিহোসেনকেও সে সনাক্ত করে। আমার পিতা মহম্মদ হাসান খাঁ ও আমার মাতাকে তাহার পিতামহ ও পিতামহী বলিয়া চিনিয়া লয়। ইহা ব্যতীত আমার আত্মীয়-স্বজন সকলকেই—আমার দুই ভ্রাতা গুলাব খাঁ ও মহম্মদ খাঁ, আমার নিকট-আত্মীয় ও প্রতিবেশী মরদান খাঁ, পীর খাঁ, আলিশের খাঁ, সাহেব খাঁ ও তেজ খাঁ প্রভৃতিকে সর্ব্বজনসমক্ষে চিনিয়া লয়। আমার গৃহে পূর্ব্বজীবনে তাহার নিজের ব্যবহৃত জিনিস সবই সে সনাক্ত করে।

এই মেয়েটি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বেরেলী জেলার সেরৌলী গ্রাম-নিবাসী মহম্মদ খানদান খাঁর সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হয়। মেয়েটি বর্ত্তমানে সেরৌলী গ্রামে স্বামীসহ বাস করিতেছে এবং সে এখনও জীবিত আছে।

স্বাক্ষর

তাং ১৭ই অক্টোবর, ১৯২৬। (১) মহম্মদ জহন খাঁ। (পূর্ব্বজন্মের কন্যার পিতা)
(২) হাকিম বাবুরাম। (করণপুর গ্রামের জমিদার)

টীপসহি (১) মঃ মরদান খাঁ (গ্রামের প্রধান)
(২) „ নূর খাঁ (গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক গ্রামের হেডম্যানরূপে মনোনীত)
(৩) „ রসিদ খাঁ
(৪) „ মমসের খাঁ
(৫) „ জব্বর খাঁ
(৬) „ মীরসাহেব
(৭) „ মাদারী খাঁ।

উক্ত বিবৃতি লিখিয়া লইবার পর আমি কৈকেয়ীবাবুকে বলিলাম, "আপনি আইন-ব্যবসায়ী বলিয়াই কৌশলে তাহাদের নিকট হইতে এইরূপ বিবৃতি লিখাইয়া লইতে পারিয়াছেন।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তাহাদের নিকট হইতে এই বিবৃতিটি লিখাইয়া লইতে আমাকে ভীষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। আমি ভাবিলাম যে, সামাজিক পীড়নের ভয়ে ইহারা হয়তো পরে এই ঘটনা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারে—তাই তাহাদের দ্বারা এই বিবৃতি লিখাইয়া লইয়াছিলাম ও স্বাক্ষর ও টীপসহিও লইয়াছিলাম।"

তিনি এই কার্য্যের জন্য যে কষ্ট-স্বীকার করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার ও তাঁহার পরিজনবর্গের নিকট হইতে বিদায় লইলাম ও সেইদিনই সন্ধ্যার ট্রেনে বেরেলী সহর ত্যাগ করিলাম।

॥ আট ॥

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বেরেলী যাইবার পূর্ব্বে কানপুরে দুইটি জাতিস্মরের তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলাম এবং কানপুরেই সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, ফতেপুরের কলেক্টরেটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু নন্দী লালের কন্যা শকুন্তলা জাতিস্মর। শুক্রবার দুপুরের ট্রেনে কানপুর হইতে ফতেপুর রওনা হইলাম। ষ্টেশনেই ফতেপুরের জেলাবোর্ডের বাবু লছমীনারায়ণের সঙ্গে পরিচয়

হইল। তিনি আমাকে বলিলেন—"আপনি ফতেপুর যাইয়া আর কোথায়ও না উঠিয়া বাবু নন্দী লালের বাড়ীতে যাইয়া উঠিবেন। আমার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ পরিচয় আছে, তিনি বিশেষ সজ্জন, সেখানে গেলে আপনার কোন অসুবিধাই হইবে না।" তাঁহার কথামত ফতেপুর ষ্টেশনে নামিয়া টাঙ্গা করিয়া ফতেপুরে শনিচরা মহল্লাতে বাবু নন্দী লালের বাড়ীতে যাইয়া শুনিলাম যে, তিনি সপরিবারে এলাহাবাদে গিয়াছেন, রবিবার সন্ধ্যায় ফতেপুর ফিরিবেন। টাঙ্গাওয়ালা আমার অবস্থা বুঝিয়া বলিল—"বাবুজী, আপনি বাঙ্গালী, এখানকার সবচেয়ে বড় ডাক্তারও বাঙ্গালী, সেখানে গেলে আপনি নিশ্চয়ই থাকিবার জায়গা পাইবেন, চলুন আপনাকে সেখানে লইয়া যাই"—এই বলিয়া সে ডাঃ রমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-বি, মহোদয়ের বাসায় আমাকে লইয়া গেল। রমেশবাবুর সহিত পরিচয় হইল, তাঁহাকে আমার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য এবং কোথা হইতে আসিয়াছি তাহাও বলিলাম—সব শুনিয়া তিনি তাঁহার ওখানে স্থানাভাবের কথা বলিলেন। সেখানেও বিফল মনোরথ হইলে টাঙ্গাওয়ালা আমাকে আর্য্যসমাজ মন্দিরে লইয়া গেল। সেখানে মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষের কেহ উপস্থিত ছিলেন না। সেই সময় হায়দ্রাবাদে আর্য্যসমাজীরা সত্যাগ্রহ করিতেছিলেন, সেখানে হায়দ্রাবাদের সত্যাগ্রহ হইতে ফেরত এরূপ একজন স্বামীজী ও একজন স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে পরিচয় হইল। তাঁহারা বলিলেন যে, শনিচরা মহল্লায় উকিল বাবু উমাশঙ্কর আছেন, তিনিই ইহার কর্ত্তা। তিনি অনুমতি দিলে আপনি এখানে থাকিতে পারেন। আরও শুনিলাম যে, বাবু উমাশঙ্কর উত্তর প্রদেশের আর্য্যসমাজীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং স্থানীয় হিন্দুসমাজ তাঁহাকে খুবই শ্রদ্ধা করে এবং তিনি বার লাইব্রেরীরও প্রেসিডেন্ট—কাজেই ভাবিলাম, তিনি এখানকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণস্বার্থী হইবেন, তাঁহার নিকট গেলে থাকিবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হইবে, এই মনে করিয়া আমার সুটকেশ বিছানা ইত্যাদি স্বামীজীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া টাঙ্গাওয়ালাকে উমাশঙ্করবাবুর বাড়ীতে লইয়া যাইতে বলিলাম।

উমাশঙ্করবাবু বাড়ীতেই ছিলেন, আমাকে খুবই হৃদ্যতার সহিত গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, "আমার এখানে থাকিলেই আমি খুব প্রীত হইব। আপনার বোধ হয় বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না বলিয়া আশা করি এবং আমিও আপনার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ পাইব।" আমি তাঁহার সাদর-অভ্যর্থনার জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলাম যে, আর্য্যসমাজ-মন্দিরটি শহরের এক প্রান্তে, স্থানটিও বেশ নির্জ্জন, আমার পক্ষে সেই স্থানই প্রীতিপ্রদ হইবে, তাছাড়া আমি স্বপাকী, কাজেই আপনার এখানে থাকিলে আপনাদের অসুবিধার কারণ হইতে পারি। আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"আপনি যখন আর্য্যসমাজ-মন্দিরে থাকাই পছন্দ করিতেছেন তখন সেখানে থাকিবার ব্যবস্থাই করিয়া দিতেছি"—এই বলিয়া আর্য্যসমাজ-মন্দিরের তত্ত্বাবধায়কের নিকট একখানা পত্র লিখিয়া আমার নিকট দিলেন এবং টাঙ্গাওয়ালাকে বিদায় করিয়া দিতে বলিয়া একজন ভদ্রলোককে আমাকে সঙ্গে লইয়া সমাজ-মন্দিরে থাকিবার সব ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিয়া আসিতে বলিলেন। আমাকে বলিলেন, "আপনি এখানে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করুন ও হাত-মুখ ধুইয়া ফলমূলাদি যাহা আপনার গ্রহণীয় তাহা দ্বারা কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পরে সমাজ-মন্দিরে যাইবেন।"

তাঁহার ওখানে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহাদের সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং আমার ফতেপুরে আগমনের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বাবু শিউরাজ বাহাদুরকে (ইনি জেলাবোর্ডের কর্ম্মচারী) ডাকিয়া পাঠাইলেন। শিউরাজ বাহাদুর আসিলে তাঁহার সহিত পরিচয় হইল। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি বলিলেন—বাবু নন্দীলালের কন্যা শকুন্তলা আমার ভ্রাতৃবধূকে তাহার পূর্ব্বজীবনের পরিচিত বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। মেয়েটি কিরূপে প্রথমে তাহার অতীত জন্মের কথা বলিতে আরম্ভ করে তাহা বর্ণনা করেন এবং মেয়েটি তাহার পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহার

যথার্থতার বহু প্রমাণও আমি পাইয়াছি, একথাও তিনি বলিলেন। বাবু শিউরাজ বাহাদুরের সহিত আলাপ-আলোচনান্তে জলযোগ করিয়া রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টায় আর্য্যসমাজ-মন্দিরে আসিয়া মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে খাটিয়া বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

তাহার পরদিন প্রাতে উঠিয়া স্নানাদি সমাপনান্তে বেড়াইতে বাহির হইলাম। প্রথমে গ্রে কোম্পানীর ডাক্তারখানায় গেলাম। সেখানে বর্দ্ধমানের দুর্গাপুর-গ্রামবাসী দুইজন ভদ্রলোক থাকেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মিঃ মজুমদারের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, বোধ হয় আমি তাঁহার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়া গিয়াছি, তাই প্রথমেই বলিয়া বসিলেন, credentials না হইলে তো থাকিতে দেওয়া বা সাহায্য করা সম্ভব নয়। আমি হাসিয়া বলিলাম—"আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আপনার নিকট সেই হিসাবে আসি নাই; আপনি বাঙালী, সেইজন্য আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি।" আমার কথা শুনিয়া তিনি লজ্জিত হইলেন—তাঁহার সহিত পরে খুবই আলাপ হইল। উঠিবার সময় প্রথম সাক্ষাতেই আমাকে ঐরূপ বলাতে অনুতপ্ত বোধ করিয়া ক্ষমা চাহিলেন এবং তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া থাকিতে অনুরোধ জানাইলেন। সেইস্থান হইতে উমাশঙ্করবাবুর বাড়ীতে আসিলাম। সেখানে বাবু হরিহর-প্রসাদ, শিউপ্রসাদ লাল, বাবু কাশীপ্রসাদের (ইঁহারা সকলেই কলেক্টরেটে যথাক্রমে chief reader, chief record-keeper এবং senior clerk-রূপে কাজ করেন) সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহারাও বলিলেন যে, মেয়েটি পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে যাহা বলে তাহা সবই সত্য। তাঁহারা আরও বলিলেন যে, গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের তহশীলের নিকট এ্যাডভোকেট বাবু হৃদয়রামের বাড়ী। তিনিই প্রথমে এই মেয়েটির সংবাদ এলাহাবাদের পাইওনিয়ার পত্রে প্রকাশ করেন। তাঁহার নিকট গেলে আপনি সব সংবাদ জানিতে পারিবেন। তাঁহাদের নিকট হইতে Anglo High School-এ মিঃ মুখার্জি

নামে আর একজন বাঙালী শিক্ষক আছেন জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনিও মিঃ মজুমদারের মতই আমাকে গ্রে কোম্পানীতে যাইবার উপদেশ দিয়া সরিয়া যাইতে পারিলে যেন বাঁচেন এইরূপ বোধ হইল। তাঁহার সহিত আলাপে দেখিলাম, তিনি এতদ্দেশীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাংলা উচ্চারণও হিন্দীর ঢঙে করেন। যাহা হউক, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আর্য্যসমাজ-মন্দিরে ফিরিলাম। আহার ও বিশ্রামাদির পর বৈকালে বাবু হৃদয়রামের বাড়ীতে গেলাম। দেখিলাম, লোকটি বিশেষ ভদ্র ও বেশ মিষ্টি মানুষ। তাঁহার সহিত আলাপাদির পর তিনি আমাকে থাকিবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন এবং তখনই আর্য্যসমাজ-মন্দির হইতে আমার বিছানাপত্র আনিবার জন্য তাঁহার চাকরকে বলিলেন। যাহা হউক, তাঁহার সে চেষ্টা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে আমাকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইল। তাহার পর তাঁহার সঙ্গে বাবু নন্দীলালের কন্যা শকুন্তলা সম্বন্ধে আলাপ হইল। তিনি মেয়েটি সম্বন্ধে কি জানেন তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "মেয়েটির বয়স বর্ত্তমানে পাঁচ কি ছয় বৎসর হইবে। মেয়েটির নিকট হইতে সব কথা শোনা বড় মুস্কিল, কারণ সে বড় লাজুক। বিশেষ পরিচিত না হইলে সে কাহারও সহিত বিশেষ কিছু বলে না। তারপর ধারাবাহিকভাবেও কিছু বলে না, তাহার খেয়াল-খুশী মতই বলে। তাহার মায়ের নিকট বা অন্যান্য পরিচিত মেয়েদের নিকটেই মাঝে মাঝে বলে; আবার তাহাকে পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাও মুস্কিল—কারণ, তাহার পূর্ব্বস্মৃতি মনে জাগ্রত হইলেই সে কাঁদিতে থাকে এবং তাহার পর গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। এজন্য তাহার পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনেরা চান না যে, পূর্ব্বজীবনের কোন কথা তাহার মনে উদিত হয়।" তিনি বলিলেন—প্রথমে তিনি মেয়েটির কথা তাহার পিতা বাবু নন্দীলালের নিকট হইতেই শোনেন। বাবু নন্দীলাল তাঁহাকে বলেন যে, প্রথমে যখন তিনি এলাহাবাদ হইতে বদ্‌লি হইয়া ফতেপুরে আসেন তখন তিনি একাই

আসিয়াছিলেন। তারপর যে বাড়ী তাঁহার থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সেই বাড়ী পরিষ্কার করাইয়া কিছুদিন পরে তাঁহার পরিবারবর্গ লইয়া তিনি সেই বাড়ীতে আসেন। মেয়েটি এই বাড়ীতে আসিয়াই একটা ঝাঁটা লইয়া এই বাড়ীর আঙ্গিনা পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করে। তাহার মাতা তাহাকে বলে—তুমি এ কি করিতেছ? আঙ্গিনা তো পরিষ্কারই আছে, আবার তুমি ঝাড়ু দিতেছ কেন? উত্তরে মেয়েটি বলে—এ আমারই বাড়ী, তাই আমি পরিষ্কার করিতেছি। মা বলিলেন—হ্যাঁ, বাপের বাড়ী তো মেয়ের নিজেরই বাড়ী। মেয়েটি উত্তর করে—না, তা নয়। আমি এ বাড়ীতে ছিলাম—এ বাড়ী আমারই বাড়ী। বাড়ীর বহির্ভাগের অংশ দেখাইয়া বলে, আমি যখন ছিলাম তখন উহা নির্ম্মিত হয় নাই এবং বলে যে, মূল বাড়ীটিরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বাড়ীর মধ্যকার একটি ঘর দেখাইয়া বলে যে, এই ঘরে আমার স্বামী থাকিতেন, তাঁহার অসুখ হয়—জ্বর ও উরুতে একটা ফোড়া হয়—ডাক্তারেরা তাঁহাকে খাইবার জন্য কিছু দিতে নিষেধ করেন এবং বলেন যে, কিছু খাইতে দিলে তাঁহার ক্ষতির কারণ হইবে। আমার স্বামী ইশারা করিয়া আমার নিকট কিছু খাইবার জন্য চাহেন, আমি খাইবার জন্য কিছু আনিয়া দিই। তিনি তাহা খাইয়াই শুইয়া পড়েন, আর সে নিদ্রা হইতে উঠিলেন না—উহাই তাঁহার চিরনিদ্রা হইল।

তাহার মাতা একদিন তাহাকে বলেন, আচ্ছা, এ বাড়ী তো তোমার ছিল, কিছু টাকাকড়ি কোথাও পুঁতিয়া রাখিয়াছিলে কি? যদি রাখিয়া থাক, তাহা বাহির করিয়া দাও তো? মেয়েটি তখন বলে—আমার টাকা তো ছিল, সেই টাকার দ্বারা আমি বাহিরের ঐ ইন্দারাটি সংস্কার করাইয়াছি। প্রথমে ঐ ইন্দারাটির জল বিস্বাদযুক্ত ক্ষারী (brackish) ছিল, ব্যবহারের উপযুক্ত ছিল না। আমি গাড়ী গাড়ী আমলকি আনিয়া উহাতে ঢালিয়া দিই, আমলকি-জল পচিয়া বিবর্ণ হইয়া যায়, তাহার পরে কলগুলি লোক দ্বারা তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। তাহার কিছুদিন পর হইতে জল ব্যবহারের উপযুক্ত হয়, জলের ক্ষারত্ব নষ্ট হয়। বাবু হৃদয়রাম বলিলেন যে, কন্যার পিতা তাহাকে

বলিয়াছেন যে, আমলকি জলে পচাইলে ক্ষারধর্মী জল যে সুপেয় হয় তাহা আমারই জানা ছিল না—আর এতটুকু মেয়ের পক্ষে এই জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইল তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বাবু নন্দীলাল তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি পরে খবর লইয়া জানিয়াছিলেন, কোথাও কোথাও নাকি ঐ ভাবে জল পরিষ্কার করা হইয়া থাকে।

বাবু হৃদয়রাম বলিতে লাগিলেন, মেয়েটির পূর্ব্বজীবনের স্মৃতি আছে, এই কথা রাষ্ট্র হইলে চতুষ্পার্শ্বস্থ অনেক স্ত্রী-পুরুষ তাহাকে দেখিতে আসে। একদিন দুপুরে অনেক স্ত্রীলোক তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে একজনকে দেখাইয়া সে বলে, আমি উঁহাকে চিনি। যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়া বালিকাটি ঐ কথা বলে তিনি হইতেছেন পূর্ব্বোক্ত শিউরাজ বাহাদুরের ভ্রাতৃবধূ, বয়স সত্তর বৎসরের অধিক হইবে। তারপর মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার স্বামীর নাম কি ছিল বল তো ? তখন সে উত্তর করে, কোন স্ত্রীলোক কি স্বামীর নাম উচ্চারণ করে ?

মেয়েটির নিকট হইতে সব বিবরণ শুনিয়া বাবু শিউরাজ বাহাদুরের ভ্রাতৃবধূ বলেন, অনেকদিন পূর্ব্বে ঐরূপ একটি লোক এখানে ছিল, তখন আমার বিবাহের পর আমি সবেমাত্র শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়াছি। তাহার কিছুদিন পরেই মেয়েটির বর্ণিত অবস্থায় একটি লোক এই বাড়ীতেই মারা যায়। যতদূর মনে পড়িতেছে, তাহার নাম গণেশ প্রসাদ ছিল এবং তাহার স্ত্রীকে সকলে পেশকারিন বলিয়া ডাকিত। বাবু নন্দীলালের এই মেয়ে শকুন্তলাই বোধ হইতেছে সেই পেশকারিন হইবে, এ জন্মে নন্দীলালের কন্যা হইয়া আসিয়াছে। কিছুকাল পরে অবস্থান্তর হওয়ায় তাহার বংশধরেরা এই বাড়ী বিক্রয় করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। উকিল বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঐ বাড়ী ক্রয় করিয়া বাড়ীর অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন।

মেয়েটি আরও বলে যে, তাহার নিজের গৃহদেবতা ছিল শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি। মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই বিগ্রহকে সে নিয়মিতভাবে পূজা করিবার জন্য এক ব্রাহ্মণীকে দিয়া যায়। বাবু হৃদয়রাম বলিলেন—অনুসন্ধানে জানা গেল

যে, ব্যাপারটি সত্য এবং পেশকারিনের সেই গৃহদেবতা এক্ষণে একটি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী কর্তৃক ফতেপুরেই বাবু নন্দীলালের বাড়ী হইতে কিছু দূরে নিয়মিতভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। তিনি বলিলেন—বিষয়টা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একদিন আমি মেয়েটিকে সঙ্গে লইয়া পূজারিণী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বাটীতে যাই। দুঃখের বিষয় সেই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী মেয়েটিকে কিছু বলিতে না দিয়া নিজেই সব বলিতে আরম্ভ করেন—এই মূর্তিই তোমার প্রদত্ত মূর্তি আর অন্যগুলি তোমার নহে ইত্যাদি। আমার ইচ্ছা ছিল, মেয়েটির দ্বারা কোন্‌টি তাহার মূর্তি তাহা সনাক্ত করিয়া লই, কিন্তু বৃদ্ধার অতিরিক্ত বাচালতার জন্য তাহা করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। বাবু হৃদয়রাম বলিলেন—তবে মেয়েটির একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমি বিশেষভাবে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। মেয়েটির বয়স তো মাত্র পাঁচ বৎসর—কিন্তু তাহার সেই বিগ্রহমূর্তিকে দেখিয়া সে বাষ্পাকুল লোচনে, ভক্তি গদ্‌গদচিত্তে বিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল এবং একান্তে একদৃষ্টে সেই বিগ্রহের দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া রহিল—দেখিলাম, তাহার নয়নযুগল হইতে অশ্রু ঝরিতেছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলবিগ্রহ দৃষ্টে এতটুকু মেয়ের এই অদ্ভুত ভক্তি ও ভাবাবেগ এই বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে আমার মনকে সংশয়মুক্ত করিল।

বাবু হৃদয়রাম বলিলেন—মেয়েটি আরও বলে যে, এই বাড়ীতে আর একটি স্ত্রীলোক ছিল, তাহার ছয়টি অঙ্গুলি ছিল। বাবু শিউরাজ বাহাদুরের ভ্রাতৃবধূ বলিলেন যে, এইরূপ ছয় অঙ্গুলিবিশিষ্ট (দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুলিযুক্ত) একটি স্ত্রীলোক এই বাড়ীর নিকটেই থাকিত, সে সম্প্রতি মারা গিয়াছে।

একদিন শিউরাজ বাহাদুরের ভ্রাতৃবধূ মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া যান। মেয়েটি প্রথমে তাঁহাদের বাড়ীতে ঢুকিয়াই বলে, এ বাড়ীতে একটিমাত্রই আঙ্গিনা ছিল, এখন দেখিতেছি, দুইটি আঙ্গিনা হইয়াছে এবং ইন্দারাটিরও আকৃতির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য।

হৃদয়বাবু আরও বলিলেন—আমি শকুন্তলাকে একদিন জিজ্ঞাসা

করিলাম, তোমার মৃত্যুর পর তুমি এতদিন কোথায় ছিলে বলিতে পার কি? উত্তরে মেয়েটি বলে—আমার মৃত্যু হইলে আমি এলাহাবাদের অপর পারে ঝুঁসিতে এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। আমার বর্ত্তমান পিতা বাবু নন্দীলাল সেই সময় ঝুঁসিতে থাকিতেন। একটি চাকরাণী আমাদের বাড়ীতে কাজ করিত এবং আমার এখনকার পিতা বাবু নন্দীলালের ওখানেও কাজ করিত এবং তাহার প্রশংসা প্রায়ই করিত। সেই চাকরাণীটি তাহাকে বলিত, তুমি এবার মরিয়া যদি নন্দীবাবুর ঘরে জন্মাও তাহা হইলে খুব সুখী হইবে। তাই মরিয়া আমি এখানে আসিয়াছি। হৃদয়রামবাবু বলিলেন—আমি নন্দীলালবাবুর নিকট শুনিয়াছি যে, ঝুঁসিতে থাকাকালীনই এই মেয়েটি তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে আসে।

হৃদয়বাবুর সহিত এই কথা হইবার পর আমি তাঁহাকে বলিলাম—তাহা হইলে তো দেখিতেছি, এই মেয়েটির দুই জন্মের কথা স্মরণে আছে, ইহা খুবই বিচিত্র বলিয়া মনে হয়। তাঁহাকে আরও জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি মেয়েটি সম্বন্ধে আরও কিছু জানেন কি? উত্তরে তিনি বলিলেন—না, ইহা অপেক্ষা আর অধিক কিছু আমি জানি না।

হৃদয়বাবুর সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিয়া সেদিন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম। তিনিও ক্লাবে চলিয়া গেলেন, আমিও গভর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড-মাষ্টার মিঃ মজুমদারের বাসায় গিয়া তাঁহার সহিত অনেক আলাপ-আলোচনা করিয়া আর্য্যসমাজ-মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন ১৬ই জুলাই, রবিবার প্রাতে উঠিয়া স্নান ও পূজাদি সমাপনান্তে শনিচরা মহল্লায় বাবু শিউরাজ বাহাদুরের বাড়ীতে গেলাম। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, বাবু নন্দীলাল সপরিবারে এলাহাবাদ হইতে ফিরিয়াছেন, তাই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নন্দীলালবাবুর বাড়ীতে গেলাম। বাবু নন্দীলালের সঙ্গে পরিচয় হইল। তাঁহাকে দেখিয়া বেশ ভাল লোক বলিয়াই মনে হইল। আমি আর্য্যসমাজ-মন্দিরে আছি জানিয়া বলিলেন, আপনি আমার এখানে আসিয়া থাকেন না কেন, আপনার কোনই

অসুবিধা হইবে না। আমি বলিলাম, সেখানেও আমার কোন অসুবিধা নাই, বেশ ভালই আছি, আর দীর্ঘদিন তো এখানে থাকিব না, কাজেই আর টানাটানি করিতে ইচ্ছা করি না, আপনার জন্তই আমি এখানে অপেক্ষা করিতেছি। আপনার মেয়ে শকুন্তলা সম্বন্ধে মোটামুটি সব খবর এ্যাডভোকেট বাবু হৃদয়রামের নিকট হইতে পাইয়াছি। আপনাকে এই সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আছে। শুনিয়া তিনি বলিলেন—আপনার জিজ্ঞাস্ত যাহা আছে বলিতে পারেন। তখন তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম।

প্রঃ। আপনার কন্তা শকুন্তলার জন্মসময় এবং কখন হইতে সে তাহার পূর্ব্বজীবনের কথা বলিতে আরম্ভ করে তাহা আমাকে জানাইবেন কি?

উঃ। মেয়েটির জন্ম হয় এলাহাবাদে ১৯৩৪ সালের ২৭শে জানুয়ারী। ১৯৩৬ সালের জুলাই মাস হইতে সে প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় কাঁদিত এবং মাঝে মাঝে বলিত—আমি বাড়ী যাইব। আমি ও মেয়ের মা বুঝাইতাম, বাড়ীতেই তো আছ, সুতরাং কান্নার কারণ কি? সে আমাদের কথা যেন খেয়ালের মধ্যেই আনিত না। আমরা এবং বাড়ীর প্রত্যেকেই তাহার প্রতিদিনের এইরূপ কান্নাতে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করিতাম, কিন্তু কি করা যায়, উপায় নাই। গত ৩রা জানুয়ারী, ১৯৩৯ সালে এলাহাবাদ হইতে বদ্‌লি হইয়া সপরিবারে ফতেপুরে আসি এবং এই বাড়ীতে আসিয়া উঠি। এই বাড়ীতে আসিয়াই মেয়েটির কান্না থামিয়া যায়। এখানে আসিবার পর সেইদিন হইতেই যাহা সে বলিয়াছে, তাহা তো সবই আপনি বাবু হৃদয়রামের নিকট হইতে শুনিয়াছেন।

প্রঃ। মেয়েটিকে একবার ডাকিবেন কি? তাহাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতাম।

উঃ। মেয়েটি বড় লাজুক, অপরিচিতের নিকট আসিতে চাহে না এবং জিজ্ঞাসা করিলেও কোন কথার জবাব দিতে চাহে না। নানারূপ কথার দ্বারা ভুলাইয়া আদর করিয়া কথা কহিলে হয়তো উত্তর দিতে পারে।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম যে, "ইহা আমি পূর্বেই শুনিয়াছি, সেই হেতু মেয়েটির জন্য কয়েকটি খেলনা লইয়া আসিয়াছি।" তিনি হাসিয়া বলিলেন—"বেশ ভালই করিয়াছেন, আচ্ছা, আমি মেয়েকে ডাকিয়া আনিতেছি।" এই বলিয়া তিনি বাড়ীর ভিতর গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে মেয়েটিকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। মেয়েটিকে দেখিয়া পাঁচ বৎসর বয়স্ক বলিয়াই মনে হইল—বেশ গোলগাল নিটোল চেহারা, শ্যাম বর্ণ, টানা চোখ, মুখশ্রী সুন্দর, বেশ বুদ্ধিমতী বলিয়াই মনে হইল।

নন্দীবাবু তাহাকে আমার কাছে বসাইয়া নানারকমে আদর করিতে লাগিলেন—বলিলেন, "দেখ, বাবুজী তোমার জন্য কেমন সুন্দর খেলনা লইয়া আসিয়াছেন।" খেলনার কথা শুনিয়া সে উহা লইবার জন্য আমার দিকে হাত বাড়াইল ও আমার কোলের কাছে আসিলে আমিও আদর করিয়া নানা গল্প বলিলাম। কিয়ৎক্ষণ মেয়েটির সঙ্গে এইরূপ নানা গল্প করাতে দেখিলাম, সে যেন আমাকে তাহার আপনার জন বলিয়াই মনে করিয়া লইল। তখন তাহাকে বলিলাম—"এইবার তোমার জন্য খেলনা আনিয়াছি, তুমি যদি আমার কথার জবাব দাও তবে তোমাকে লাড্ডু খাওয়াইব—তোমার জন্য ভাল লাড্ডু লইয়া আসিব।" কারণ শুনিয়াছিলাম যে, মেয়েটি লাড্ডু খাইতে খুব ভালবাসে। লাড্ডুর কথা শুনিয়া হাসিয়া সোৎসুক মেয়ে একবার আমার দিকে তাকাইয়া বলিল—"আচ্ছা বলুন, আমি জবাব দিতেছি।" তখন আমি তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—

প্রঃ। এ বাড়ী কি তোমার ছিল? তুমি এ বাড়ীতে থাকিতে কি?

উঃ। হ্যাঁ, এ বাড়ী আমারই ছিল, এই বাড়ীতে আমি আমার স্বামীর সঙ্গে থাকিতাম।

প্রঃ। যখন তুমি এ বাড়ীতে ছিলে তখন তোমার স্বামীর কি কোন অসুখ করিয়াছিল?

উঃ। হ্যাঁ, তাহার তো কয়েকবার বেশী অসুখ হইয়াছিল।

প্রঃ। আমি জানিতে চাহিতেছি, গত জীবনে তোমার মৃত্যুর আগে কি তাহার মৃত্যু হইয়াছিল? যদি তাহা হইয়া থাকে তাহা হইলে কী অসুখে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল?

উঃ। তাহার ফোঁড়া উঠিয়াছিল এবং জ্বর হইয়াছিল।

প্রঃ। কোথায় ফোঁড়া উঠিয়াছিল?

উঃ। উরুতে (এই বলিয়া নিজের উরু দেখাইয়া স্থান নির্দেশ করিয়া দিল)।

প্রঃ। তারপর?

উঃ। ডাক্তারেরা তাহাকে কিছু খাইতে দিতে বারণ করিয়াছিল, কিন্তু সেই অসুস্থ অবস্থায় সে একদিন ইসারা করিয়া ডাকিয়া আমার নিকট ডাল, রুটি খাইতে চাহিল—আমি অড়হর ডাল ও রুটি তৈয়ারী করিয়া তাহাকে খাইতে দিই।

প্রঃ। তারপর কি হইল?

উঃ। ডালরুটি খাইবার কিছু পরে সে বেশী অসুস্থ হইয়া পড়িল, বিছানা হইতে আর উঠিল না—তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইল।

প্রঃ। তোমার এই বাড়ীর কোন্ ঘরে তোমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল তাহা দেখাইয়া দিতে পার কি?

সে তখন উত্তরপূর্ব্ব কোণের একটি ঘর অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল। তাহার স্বামী সম্বন্ধীয় এইসব প্রশ্নের জবাব দিবার সময় তাহার চক্ষু ছলছল করিতেছিল—জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল—তাহা দেখিয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম—কি আশ্চর্য্য! পাঁচ বৎসরের বালিকা, তাহার স্বামী সম্বন্ধে কোন ধারণাই তো সম্ভবে না—তথাপি তাহার স্বামীর প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তির এই প্রকাশ, এই play of emotion সম্ভবে কিরূপে! তাহার এই অবস্থা দেখিয়া আমি বাবু নন্দলালকে বলিলাম—বালিকাকে তাহার স্বামী সম্বন্ধে প্রশ্ন করা আমার নিজের নিকটেই বড় পীড়াদায়ক বোধ হইতেছে, আমি আজ আর এ সম্বন্ধে উহাকে কোন

প্রশ্ন করিতে চাই না। সে একটু আত্মসংবরণ করিলে তাহার নিজের সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন পরে জিজ্ঞাসা করিব। এই বলিয়া মেয়েটিকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া অন্য গল্প আরম্ভ করিয়া দিলাম—একবার গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া মোটরযোগে যাইবার সময় কি করিয়া একটি বাঘ আমাদের গাড়ীর উপর লাফাইয়া পড়ে ইত্যাদি গল্প করাতে সে আবার বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠে—তখন আবার তাহাকে প্রশ্ন করিলাম।

প্রঃ। আচ্ছা, তোমার কি এই বাড়ীতে মৃত্যু হইয়াছিল ?

উঃ। হ্যাঁ।

প্রঃ। কিসে মৃত্যু হইয়াছিল ?

কোন উত্তর করিল না।

প্রঃ। কোন অসুখ করিয়াছিল নাকি ?

উঃ। না, কোন অসুখ করে নাই।

প্রঃ। তবে কি এমনিই মৃত্যু হইয়াছিল ?

উঃ। হ্যাঁ।

প্রঃ। মৃত্যুর পরে তুমি কোথায় গেলে ?

উঃ। ঝুঁসিতে, (এলাহাবাদের কাছে)।

প্রঃ। ঝুঁসিতে কোথায় গেলে ?

উঃ। সেখানে এক ঠাকুর-পরিবারে—তাহারা জমিদার।

প্রঃ। আচ্ছা, তোমার এই বাড়ীতে মৃত্যু হওয়ার পরে এবং ঝুঁসিতে ঠাকুর-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তুমি কোথায় ছিলে, কি করিতে, বলিতে পার নাকি ?

উঃ। না, সে অবস্থার কোন কথা মনে নাই।

প্রঃ। একটু ভাবিয়া দেখ সে সময়ের কোন কথা তোমার মনে পড়ে কিনা।

শকুন্তলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, মনে হইল কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করিতেছে—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর বলিল—না, সে

সময়ের কোন কথাই তো মনে পড়ে না। সে আমার এইসব প্রশ্নের উত্তর এত স্বাভাবিক ও সহজভাবে দিতে লাগিল যে, তাহা আমার অন্তর স্পর্শ করিল।

সেদিন শকুন্তলার মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আর তাহাকে তাহার পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে কোন প্রশ্নাদি করিতে ইচ্ছা হইল না। তাহাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য তাহার সহিত বাঘের গল্প করিতে আরম্ভ করিলাম এবং বাবু নন্দীলালের চাকরকে ডাকিয়া একটি টাকা দিয়া শকুন্তলার জন্য বাজার হইতে ভাল লাড্ডু আনিতে বলিলাম। ইহাতে নন্দীবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—আপনি কেন টাকা দিতেছেন, আমিই দিতেছি। আমি তাহাকে বলিলাম, "আমি যখন শকুন্তলাকে বলিয়াছি যে সে আমার প্রশ্নের জবাব দিলে তাহাকে লাড্ডু খাওয়াইব, তখন আমারই উহা দেওয়া উচিত। তাহা না হইলে আমার পক্ষে মিথ্যাচার করা হইবে এবং প্রকারান্তরে মেয়েটিকেও মিথ্যা বলিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে।" আমার এই কথাতে বাবু নন্দীলাল আর কোন আপত্তি করিলেন না। চাকরটি বাজার হইতে লাড্ডু লইয়া আসিলে শকুন্তলা ও উপস্থিত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে উহা বণ্টন করিয়া দিয়া সেদিনকার মত তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতে যাইয়া শকুন্তলার সহিত দেখা করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—

প্রঃ। তুমি বলিয়াছিলে যে, ঝুঁসিতে তোমাদের বাড়ী ছিল, সে বাড়ী গঙ্গার খুব নিকটে ছিল কি ?

উঃ। না, গঙ্গা-নদী হইতে একটু দূরে।

প্রঃ। তোমাদের যে বাড়ী ছিল তাহার নিশানা বলিতে পার কি ?

উঃ। সেই বাড়ীর পাশে অনেক আমগাছ আছে।

প্রঃ। আচ্ছা, তোমাকে যদি ঝুঁসিতে লইয়া যাই তাহা হইলে তুমি সেই জায়গা বা বাড়ী চিনাইয়া দিতে পারিবে কি ?

উঃ। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারিব।

প্রঃ। তুমি যখন তোমার এই ফতেপুরের বাড়ীতে ছিলে তখন তোমার ছেলে কয়টি ছিল?

উঃ। দুইটি [শিউরাজ বাহাদুর সেখানে উপস্থিত ছিলেন, বালিকার উত্তর শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন—আমি যতদূর জানি, কালীচরণ নামে একটি মাত্র পুত্রই উঁহার ছিল। তারপর তিনি তাঁহার বিধবা জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ শ্রীযুক্তা জগরাণী দেবীকে (তাঁহার বয়স অনুমান ৮০ বৎসর হইবে) জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, বালিকার কথাই ঠিক, পেশকারিনের দুইটি পুত্রই ছিল]।

প্রঃ। আচ্ছা, তোমার স্বামীর নাম কি ছিল বলিতে পার কি? (এই প্রশ্ন শুনিয়া বালিকাটি মাথা নীচু করিয়া রহিল)। পুনরায় তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—

আচ্ছা, তোমার স্বামীর নাম গণেশপ্রসাদ ছিল কি?

মেয়েটি এবারেও আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহাকে এতদবস্থায় দেখিয়া তাহার পিতা বলিলেন, চুপ করিয়া আছ কেন? হ্যাঁ বা না বলিতে দোষ কি?

মেয়েটি তখন উত্তর করিল—হ্যাঁ।

প্রঃ। আচ্ছা, এখানে তোমার মৃত্যু হইবার পর তুমি তো এলাহাবাদের নিকটে ঝুঁসিতে গিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। সে জন্মে তোমার কোন সন্তানাদি হইয়াছিল কি?

উঃ। না।

প্রঃ। একটিও না?

উঃ। না।

প্রঃ। আচ্ছা, তুমি যখন ফতেপুরে এই বাড়ীতে ছিলে তখন তোমার ছেলে, স্বামী ছিল, গৃহদেবতা ছিল—তুমি এসবের মধ্যে কাহাকে সব চাইতে বেশী ভালবাসিতে? কাহাতে তোমার মন পড়িয়া থাকিত?

উঃ। আমার ঠাকুরের জন্য সবসময় মন পড়িয়া থাকিত।

প্রঃ। তুমি যখন ফতেপুরে ছিলে তখন প্রায় সব সময় তো পূজা-অর্চ্চনায় কাটাইতে, ঝুঁসিতেও কি খুব পূজা-অর্চ্চনাদি করিতে ?

উঃ। না।

প্রঃ। না কেন ? এখানে তুমি তোমার ঠাকুরকে পূজা করিতে, এত ভালবাসিতে, সেখানে গিয়া তাঁহার পূজাদি কিছুই করিলে না—এ কেমন কথা ?

মেয়েটি এই প্রশ্ন শুনিয়া ঘাড় নীচু করিয়া রহিল। তাহার সেই সময়ের হাবভাব দেখিয়া মনে হইল যে, যেন তাহার মনে খুব দুঃখ হইয়াছে।

প্রঃ। আচ্ছা, পূজা যে করিতে না, সে বাড়ীতে পূজাদি করিবার কি খুব অসুবিধা ছিল ?

উঃ। হ্যাঁ।

প্রঃ। বাড়ীর কর্ত্তা বা কর্ত্তারা কি তোমার পূজা-অর্চ্চনা করা পছন্দ করিতেন না বা করিলে অসন্তুষ্ট হইতেন, তাই পূজাদি করা তোমার পক্ষে সম্ভব হইত না—তাই কি ?

উঃ। হ্যাঁ, কেহ পছন্দ করিত না (খুব দুঃখের সহিত)।

প্রঃ। তবে তুমি কি করিতে ?

উঃ। প্রত্যহ প্রাতে গঙ্গাস্নান করিতাম, আর মনে মনে ঠাকুরকে ডাকিতাম।

প্রঃ। আর কিছু করিতে কি ?

উঃ। আর কিছু করা তো সম্ভবই হইত না, বাড়ীর সকলের বিরুদ্ধতার দরুণ (খুব দুঃখের সহিত এই কথাগুলি বলিল)।

প্রঃ। এখানে অর্থাৎ ফতেপুরে তুমি যখন তোমার ঠাকুরকে পূজা করিতে তখন কী ভাবে পূজা করিতে ?

উঃ। সমস্ত শরীর একখানি চাদর দ্বারা ঢাকিয়া মনে মনে নাম জপ করিতাম ও সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের ধ্যান করিতাম।

প্রঃ। তুমি যখন খুঁসি হইতে ফতেপুরে চলিয়া আসিলে অর্থাৎ সেখানে তোমার মৃত্যুর সময় তোমার সে-জন্মের স্বামী জীবিত ছিলেন, না, তোমার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ?

উঃ। আমার মৃত্যুর সময় তিনি জীবিত ছিলেন।

এইসব প্রশ্নোত্তরাদিতে বালিকাটি অত্যন্ত মনমরা ও অবসাদগ্রস্তা বোধ হইতে লাগিল। তখন বাবু নন্দীলালকে বলিলাম, এবার উহাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যান। বাবু নন্দীলাল মেয়েটির বড় ভাইকে ডাকিয়া মেয়েটিকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতে বলিলেন। মেয়েটি বাড়ীর ভিতর গেলে বাবু নন্দীলাল বলিলেন যে, এই মেয়েটির এই বিশেষত্ব দেখিতে পাই যে, সে খুব বিচার ও বিবেচনাসম্পন্না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোন ঝগড়াঝাঁটি হইলে সে ধীরভাবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করে। না পারিলে তখন আমার কাছে বা তাহার মার কাছে যাইয়া বলে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মিষ্টদ্রব্যাদির প্রতি ঝোঁক থাকে। কেহ কিছু মিষ্টদ্রব্যাদি দিলে ছেলেরা নিজেই খাইতে চায়। কিন্তু এ কিছু পাইলে সবাইকে দিয়া তবে খায়। এমন কি হয়তো সবটাই দিয়া দিল।

নন্দীবাবু আরও বলিলেন—আমাদের কালেক্টরী কাছারীতে পানি পাঁড়ে আছে, তাহার মাতা অত্যন্ত বৃদ্ধা। মেয়েটি সেই পেশকারিন, এই কথা শুনিয়া সে মেয়েটিকে দেখিতে আসে এবং মেয়েটিকে বলে, তুমি যখন পেশকারিন ছিলে তখন আমাকে কত লাড্ডু খাওয়াইয়াছ, এখন আমাকে কিছু খাইতে দাও। এই কথা শুনিয়া মেয়েটি তাহার পকেটে যতগুলি lemon drops ছিল তাহা বৃদ্ধাটিকে দিয়া দেয় এবং বাড়ীর মধ্যে যাইয়া তাহার মাতাকে বলে যে, বৃদ্ধাটি আমাকে বলিতেছিল, আমি তাহাকে লাড্ডু খাওয়াইতাম, কিন্তু শুধু লাড্ডু কেন, তাহাকে আমি জিলেপী, পেঁড়া বহু মিষ্ট জিনিসই খাওয়াইতাম।

শিউরাজ বাহাদুর আমার সঙ্গেই ছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

পেশকারিনের স্বামী বাবু গণেশপ্রসাদের বংশধর কেহ আছেন কি? তিনি বলিলেন, বাবু গণেশপ্রসাদ ফতেপুরের পেশকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পান্নার মহারাজার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তাঁহার দুইটি পুত্র হয়। একটির নাম কালীচরণ, তিনি রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে চাকুরী করিতেন ও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। অপরটি অপুত্রক অবস্থায় মারা যায়। কালীচরণের দেবীপ্রসাদ ও গোবিন্দপ্রসাদ নামে দুই পুত্র হয়। দেবীপ্রসাদের পুত্র বেণীমাধব বর্ত্তমানে এলাহাবাদ গভর্ণমেণ্ট স্কুলে চাকুরী করে।

বেলা অধিক হওয়াতে উঠিয়া পড়িলাম এবং বাবু নন্দীলালকে বলিয়া আসিলাম যে, শকুন্তলার ফটো লইবার জন্য বৈকালে ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে লইয়া আসিব। বৈকালে বাবু রঘুবংশীলালকে সঙ্গে করিয়া ফতেপুর ষ্টেশনের সন্নিকটে ফটোগ্রাফার-এর নিকট গেলাম এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নন্দীলালের বাড়ীতে আসিয়া শকুন্তলার ফটো লওয়া গেল। তাহার পরদিন প্রাতে উঠিয়া স্নানাদির পর শিউরাজ বাহাদুরের বাড়ী গেলাম— তাঁহার জ্যেষ্ঠা বিধবা ভ্রাতৃবধূ জগরাণী দেবীর নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে বালিকাটি সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ শুনিবার উদ্দেশ্যে। কারণ, শকুন্তলা প্রথমে তাঁহাকেই চিনিতে পারিয়াছিল এবং তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধাও করে এবং তিনি অশীতিপর বৃদ্ধা হইলেও তাঁহার সহিত মিশিতে ভালবাসে। তিনি মেয়েটির বাড়ী গেলে সে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জানায় এবং তিনি চলিয়া আসিবার সময় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আগাইয়া দিয়া যায়। মেয়েটি সাধারণতঃ অন্য কোথায়ও যায় না, কিন্তু জগরাণী দেবীর বাড়ীতে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য প্রায়ই আসিয়া থাকে। শিউরাজ বাহাদুর তাঁহার বৃদ্ধা ভ্রাতৃবধূকে সংবাদ দেওয়াতে তিনি আসিলেন। তখন তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম—

প্রঃ। বাবু নন্দীলালের কন্যা শকুন্তলা প্রথমে আপনাকে চিনিতে পারিয়াছিল, একথা সত্য কি?

উঃ। যখন লোকমুখে শুনিতে পাইলাম যে, মেয়েটিই পেশকারিন তখন অন্যান্য স্ত্রীলোকদের সহিত আমিও তাহাকে দেখিতে যাই। বহু স্ত্রীলোকের মধ্য হইতে আমাকে দেখাইয়া বলে যে, আমি ইহাকে চিনি। পেশ-কারিন পূর্ব্বে আমাদের বাড়ীতে আসিত, তাই ভাবিলাম, মেয়েটি যদি সত্যই পেশকারিন হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ী চিনিতে পারিবে।

এই ভাবিয়া তাহার মাতাপিতার অনুমতি লইয়া আমাদের বাড়ীতে তাহাকে লইয়া আসিলাম। মেয়েটি আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই বলে—পূর্ব্বে এ বাড়ীতে একটিমাত্র আঙ্গিনা ছিল, এখন দেখিতেছি, প্রাচীর উঠাইয়া দুইটি আঙ্গিনা করা হইয়াছে। আমাদের বাড়ীর ইন্দারাটি দেখিয়া বলে, ইন্দারার আকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, পূর্ব্বে অন্যরূপ ছিল। মেয়েটির এই সব কথাই ঠিক।

প্রঃ। পেশকারিনের স্বামী বাবু গণেশপ্রসাদকে আপনি জানিতেন কি? তাঁহার বাড়ীর কোন্ ঘরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিতে পারেন কি?

উঃ। আমাদের এই পাড়াতেই তাঁহাদের বাড়ী ছিল এবং ফোড়া হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ইহা জানি। বাড়ীর কোন্ ঘরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না, কারণ তখন আমি ঘরের বধূ, এ সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ জানা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

প্রঃ। আচ্ছা, এই পাড়াতে দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুলিবিশিষ্ট একটি স্ত্রীলোক ছিলেন কি?

উঃ। হ্যাঁ, এই পাড়াতেই ঐরূপ দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুলিযুক্ত একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ছিলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। শকুন্তলা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিল।

শিউরাজ বাহাদুরের বৃদ্ধা খুড়ীমাতা জয় দেবীকেও বালিকা শকুন্তলা চিনিতে পারিয়াছিল, কিন্তু শিউরাজ বাহাদুরের বৃদ্ধা ভ্রাতৃবধূ জগরাণী প্রতিই বালিকার প্রীতির আকর্ষণ অধিক ছিল।

শিউরাজ বাহাদুর আরও বলিলেন যে, তাঁহার বুয়া অর্থাৎ পিসিমা হরবংশাকেও মেয়েটি চিনিতে পারিয়াছিল।

বাবু শিউরাজ ও তাঁহার ভ্রাতৃবধূ জগরাণী দেবীর সহিত বালিকা শকুন্তলার বিষয়ে আলোচনা হইবার পর বাবু ভগবতীপ্রসাদের সঙ্গেও কথাবার্ত্তা হইল। তাঁহার বর্ত্তমান বয়স ৭৫ বৎসর হইবে; তিনি পূর্ব্বে ফতেপুরের জমিদার লালা ঠাকুরদাসের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। তিনি বলিলেন যে, গণেশপ্রসাদ ও তাঁহার স্ত্রী পেশকারিনের কথা তাঁহার মনে আছে। বাবু গণেশপ্রসাদ ফতেপুরের পেশকার ছিলেন; এখান হইতে পেনসন লইয়া তিনি পান্নার (রাজপুতনা) মহারাজা লছমন সিং-এর অধীনে তিন বৎসর চাকুরী করিয়াছিলেন। পান্নাতেই তাঁহার ফোড়া হয়—সেই অবস্থাতেই সপরিবারে ফতেপুরের বাড়ীতে আসেন এবং এখানেই মারা যান। পেশকারিন অর্থাৎ পেশকার গণেশপ্রসাদের স্ত্রী গণেশপ্রসাদের মৃত্যুর পনের বৎসর পরে মারা যান। বাবু ভগবতীপ্রসাদ আরও বলিলেন যে, পেশকারিন খুবই ভক্তিমতী ছিলেন, জীবনের অধিকাংশ সময় পূজা-অর্চ্চনাতেই অতিবাহিত করিতেন এবং এই অঞ্চলের সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। তিনি নিজে লাড্ডু খুব ভালবাসিতেন এবং সকলকে লাড্ডু খাওয়াইতেন। বাবু গণেশপ্রসাদের বংশধর তাঁহাদের ফতেপুরের এই বাড়ী বাবু দুর্গাপ্রসাদ এ্যাডভোকেটকে বিক্রয় করেন, তিনি এই বাড়ী মেরামত করিয়া ভাড়া দিয়াছেন।

সন্ধ্যার পর আর্য্যসমাজ-মন্দিরে আসিয়া দেখিলাম, হায়দ্রাবাদ-সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে বক্তৃতা হইতেছে। সত্যাগ্রহীদের মধ্য হইতে একজন বৃদ্ধ স্বামীজী ও পণ্ডিত শ্যামলালের বক্তৃতা বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল—নিজাম গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের কাহিনী তাঁহারা জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিলেন। সভায় বহু আর্য্য-সমাজী উপস্থিত ছিলেন। সভাভঙ্গের পর স্নান ও আহারাদি সারিয়া শুইয়া পড়িলাম।

তাহার পরদিন প্রাতে আবার বাবু নন্দীলালের বাড়ীতে গেলাম—

এই উদ্দেশ্যে যে, শকুন্তলাকে সঙ্গে লইয়া যে ব্রাহ্মণীর নিকট সে তাহার পূর্ব্বজন্মের গৃহদেবতার মূর্ত্তিগুলি দিয়াছিল, তাঁহার নিকট যাইব এবং সে মূর্ত্তিগুলি চিনিতে পারে কিনা বা মূর্ত্তিগুলি দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র তাহার কিরূপ ভাব উপস্থিত হয় তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিব।

নন্দীলালের বাড়ীতে গিয়া শিউরাজ বাহাদুর, বাবু নন্দীলালের ছেলেদের গৃহশিক্ষক ও আমি শকুন্তলাকে সঙ্গে লইয়া সেই ব্রাহ্মণীর বাড়ীতে গেলাম। বাবু নন্দীলালের বাড়ী হইতে ব্রাহ্মণীর বাড়ী অনুমান পদব্রজে ৬।৭ মিনিটের রাস্তা হইবে। ব্রাহ্মণীর সঙ্গে দেখা হইল—তাঁহার চেহারা দেখিয়া অনুমান হইল যে, তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইবে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার বয়স চার কুড়ির বেশী হইয়াছে। শকুন্তলাকে দেখিয়া আদর করিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন এবং আমাদের বসিবার জন্য কাষ্ঠাসন দিলেন। ব্রাহ্মণী ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে মূর্ত্তিগুলি দেখাইতে বলিলাম। তিনি বলিলেন, অস্নাতাবস্থায় তিনি কী করিয়া মূর্ত্তিগুলি স্পর্শ করিতে পারেন? তখন আমি বলিলাম যে, আমি প্রাতে স্নান করিয়াছি, আপনার কোন আপত্তি না থাকিলে আমি স্পর্শ করিতে পারি। তাঁহার আপত্তি নাই জানিয়া মূর্ত্তিগুলির আবরণ উন্মোচন করিয়া মূর্ত্তিগুলি শয়ান অবস্থায় আছে দেখিতে পাইলাম। মূর্ত্তিগুলিকে উঠাইয়া বসাইলাম। রাধা ও কৃষ্ণের রূপার মূর্ত্তি দুইটিই বড়—অনুমান অর্দ্ধহস্ত পরিমিত হইবে। উহাই সর্ব্বোপরি ছিল, তাহার নিম্নে ছোট ছোট কয়েকটি মূর্ত্তি ছিল—মহাবীর, গণেশ প্রভৃতির মূর্ত্তি। ইতিমধ্যে শকুন্তলা বাড়ীর ভিতর হইতে আসিয়া মূর্ত্তিগুলির সম্মুখে দাঁড়াইল। শকুন্তলা খুব ভক্তিভরে মূর্ত্তিগুলির দিকে তাকাইয়া রহিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল যে, মূর্ত্তিগুলি তাহারই। তারপর ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি এই মূর্ত্তিগুলি পাইলেন কি প্রকারে? উত্তরে তিনি বলিলেন যে, পেশকারিন মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিল। পেশকারিন নিজে সাধারণতঃ ঐ মূর্ত্তিগুলি পূজা করিত, কিন্তু বিশেষ দিনে—যেমন রাম-নবমী, দোল-পূর্ণিমা প্রভৃতিতে আমাকে ডাকাইয়া

পূজা করাইত। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে তাহার উপস্থিত আত্মীয়-স্বজনকে বলিল—আমাকে গৃহ হইতে বাহির করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণীকে ডাকাইয়া মূর্ত্তিগুলি তাহার হেপাজতে নিয়মিত পূজা করিবার জন্য দাও। আমাকে তদনুসারে ডাকিয়া পাঠান হইল। আমি যাইয়া দেখিলাম, পেশকারিন মৃত্যুশয্যায়, তখনও জ্ঞান আছে। আমাকে দেখিবামাত্রই মূর্ত্তিগুলিকে ইসারা করিয়া দেখাইয়া দিল। আমি তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া মূর্ত্তিগুলি একটি থালায় সাজাইয়া লইলাম এবং একটু দূরে দাঁড়াইয়া তাহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। মূর্ত্তিগুলি আমি লইয়াছি দেখিয়াই পেশকারিন যেন বেশ শান্তির সহিতই তাহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। আমি মূর্ত্তিগুলি বাড়ী লইয়া আসিয়া সেই অবধি নিয়মিতভাবে পূজা করিয়া যাইতেছি। যে রূপার থালাতে করিয়া আমি মূর্ত্তিগুলি লইয়া আসিয়াছিলাম, সেই থালাখানা পেশকারিনের শ্রাদ্ধসময়ে তাহার পুত্রেরা চাহিয়া পাঠাইতে আমি তাহা পাঠাইয়া দেই। ব্রাহ্মণী আরও বলিলেন যে, পেশকারিন বলিয়াছিল যে, সেবাইত হিসাবে যে তাহার গৃহদেবতার পূজা করিবে তাহাকে ঠাকুর-সেবার উদ্দেশ্যে সে তাহার সম্পত্তি সব দান করিয়া যাইবে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ঐ মর্ম্মে দলিল লিখাইয়া তাহার বাটীর নিকটস্থ বিশেষ পরিচিত একজনকে ঐ দলিলে সহি করিতে বলিলে তিনি শেষ মুহূর্ত্তে সহি করিতে রাজি না হওয়ায় উহা আর কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। ব্রাহ্মণীর সহিত এই সব কথাবার্ত্তা হইবার পর বাবু শিউরাজ বাহাদুর ও শকুন্তলাকে সঙ্গে লইয়া বাবু নন্দীলালের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। গৃহশিক্ষকমহাশয় ব্রাহ্মণীর বাড়ী হইতে নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন।

কথাপ্রসঙ্গে বাবু নন্দীলাল বলিলেন যে, একদিন তাঁহার স্ত্রী পুত্র-কন্যাসহ বাবু রঘুনাথপ্রসাদের ভগ্নীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। বাবু রঘুনাথ-প্রসাদের ভগ্নী কতকগুলি ঠাকুরমূর্ত্তি পূজা করিত। কন্যার মাতা শকুন্তলাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, "এই তো, তোমার ঠাকুর-মূর্ত্তি এইখানে আছে।" মেয়েটি মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া বলিল, "না, এ আমার ঠাকুর নয়।"

নন্দীলাল আরও বলিলেন—প্রথম দিন যখন পূজারিণী ব্রাহ্মণী তাঁহাদের বাড়ীতে মেয়েটিকে দেখিতে আসেন, ব্রাহ্মণীকে দেখিয়াই সে তাহার মায়ের নিকট দৌড়াইয়া গিয়া বলে, "মা, ইহারই নিকট আমার গৃহদেবতার মূর্ত্তিগুলি আছে।" আর একদিন সে তাহার মাতার সহিত গঙ্গাতে স্নান করিতে গিয়াছিল। গঙ্গাস্নানান্তে সে একটি জায়গায় আসিয়া বসিল। একটি মিঠাইওয়ালা সেখানে বসিয়া মিঠাই বিক্রয় করিতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "আমি এই জায়গায় বসিয়া পূজা করিতাম, তুমি এখানে মিঠাই বিক্রয় করিতেছ কেন? এখান হইতে সরিয়া যাও।" বালিকা একটি বটগাছ দেখাইয়া বলিল, "আমি মাঝে মাঝে ঐ বটগাছের তলাতেও বসিতাম —সেই সময় এই চৌতারা কাঁচা ছিল, পরে তাহা পাকা করা হইয়া থাকিবে।"

তাহার পর বাবু নন্দীলালকে বলিলাম—"মেয়েটি আপনার এই বাড়ীর যে দুইটি ঘর চিনিতে পারিয়াছিল, তাহা একবার দেখাইয়া দিবেন কি?" তিনি তাঁহার কন্যা শকুন্তলাকে লইয়া আমার সহিত অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন এবং মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ ঘরে তোমার স্বামী ফোড়ায় ভুগিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল তাহা বাবুজীকে দেখাইয়া দাও তো।" মেয়েটি খুবই দুঃখক্লিষ্ট চিত্তে উত্তর-পূর্ব্ব কোণের ঘরটি দেখাইয়া বলিল—"এই ঘরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।" উত্তরদিকের আর-একটি ঘর নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "এইটি তাঁহার ঘর ছিল।" তাহার পর সে তাঁহার ঠাকুরঘর দেখাইয়া দিল ও বলিল—"পূর্ব্বে এই ঠাকুরঘরের দরওয়াজা এই দিক্ দিয়া ছিল না, অন্য দিক্ দিয়া ছিল।"

বেলা অধিক হওয়াতে সেদিনকার মত বাবু নন্দীলালের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আর্য্যসমাজ-মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম।

বেলা ৪টায় বাবু নন্দীলালের বাড়ীতে যাইয়া শুনিলাম, ফটোগ্রাফার শকুন্তলার ফটো দিয়া যায় নাই। ষ্টেশনের নিকটে ফটোগ্রাফারের নিকট যাইয়া শুনিলাম যে, ফটো over exposed হইয়া গিয়াছে। আজ আর একবার ফটো তুলিয়া ফটো যাহাতে clear and distinct হয়

সেরূপ ফটো তিনি আমাকে দিবেন বলিলেন। সেদিন সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিলাম।

তাহার পরদিন প্রাতে উঠিয়া এই কয়দিনে যাঁহাদের সহিত বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে, তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া আসিতে মনস্থ করিলাম। প্রথমে হিন্দুমহাসভা ও আর্য্যসমাজের নেতা উকিল বাবু উমাশঙ্করের বাড়ীতে গেলাম। বাবু উমাশঙ্কর বলিলেন, "আগামী হিন্দুমহাসভার অধিবেশন কলিকাতায় হইবে, সেই সময় আমি কলিকাতা যাইব। আশা করি, সে সময় আপনার সঙ্গে দেখা হইবে।" হিন্দুমহাসভা উপলক্ষে উমাশঙ্করবাবু কলিকাতা গেলে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল।

সেখান হইতে উকিল বাবু কেশবশরণের বাড়ীতে গেলাম। তিনি তাঁহার মক্কেল লইয়া খুবই ব্যস্ত ছিলেন, তথাপি আমাকে যথেষ্ট আদর-অভ্যর্থনা করিলেন। সেখান হইতে ফতেপুর পাল্লি মহল্লার রাজারামের বাড়ীতে আসিলাম। তিনি জলযোগ না করাইয়া কিছুতেই ছাড়িলেন না। তাঁহার মাতার সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। লোকটি খুব মাতৃভক্ত—আমাকে বলিলেন, "মার হাতখানা দেখুন তো, আমি মাকে কিছুকাল সেবা করিতে পারিব কিনা?" তাঁহার মাতার বয়স অনুমান ৭৫ হইবে, স্বাস্থ্য বেশ ভালই। আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, পারিবেন।" তারপর জি, ডি, শুক্লের ওখানে গেলাম, তিনি E. I. Rlyর Chief Medical Officer Mr. S. C. Chatterjeeর সঙ্গে একসঙ্গে বিলাতে ছিলেন। আমি বলিলাম, "Mr. Chatterjeeর সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে।" পরে লাহোরে গেলে চাটার্জ্জির সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তিনি তখন N. W. Rlyর Chief Medical Officer. সর্ব্বশেষে প্রে কোম্পানীর ডাক্তারখানায় যাইয়া বর্দ্ধমানের দুর্গাপুর-নিবাসী বাবু শ্যামাপদ ব্যানার্জ্জি ও বাবু শিবমোহন ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আর্য্যসমাজে ফিরিয়া আসিলাম।

বৈকালে আর্য্যসমাজ-মন্দিরের চার্জ-এ যে বালকটি ছিল—নাম শিউবালক—তাহাকে টাঙ্গা আনিতে বলিয়া বিছানাপত্র বাঁধিয়া বেলা ৫টার কিছু পূর্ব্বে ষ্টেশনে গেলাম। ৫।১৮ মিনিটে ট্রেন ছাড়িল; সন্ধ্যা ৭॥টায় কানপুর পৌঁছিলাম।

॥ নয় ॥

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রথমবার যখন কানপুরে আসি, তখন কানপুরের পার্শেল ক্লার্ক বাবু কমলকুমার মিত্রের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, কানপুরের মেষ্টন রোডের উপর 'শর্ম্মা রেষ্টুরেণ্টের' স্বত্বাধিকারী বাবু মঙ্গলদেও শর্ম্মার স্ত্রী জাতিস্মর। তাহা ছাড়া কানপুরের প্রেমনগর মহল্লার দেবীপ্রসাদ ভাটনগরের সপ্তম বৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীমান্ নিরঙ্কর ভাটনগরের জাতিস্মরত্বের সম্বন্ধেও বিবরণ 'পাইওনিয়র' পত্রিকায় পাঠ করিয়াছিলাম। এইবারে কানপুরের একটি ঘটনার বিবৃতি দিতেছি।

সেবারে কানপুরে আসিয়া 'হরবংশমহলে' ইষ্টভ্রাতা বাবু বদ্রীবিশাল শ্রীবাস্তবের বাটীতে উঠিয়াছিলাম। বাবু বদ্রীবিশালের নিকট হইতে মেষ্টন রোডে 'শর্ম্মা রেষ্টুরেণ্ট' কোথা দিয়া যাইতে হইবে সন্ধান লইলাম। তখন গ্রীষ্মকাল; কানপুরে ভয়ানক গরম পড়িয়াছে, বেলা ৯।১০টার পর ঘরের বাহির হওয়া কঠিন। তাই পরদিন প্রাতে উঠিয়াই মেষ্টন রোডে বাবু মঙ্গলদেও শর্ম্মার সহিত দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার সহিত দেখা করিয়া তাঁহার নিকট আগমনের কারণ জানাইলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত সব মনে আছে। আপনি আগামীকল্য বৈকালে আসিবেন, আপনাকে সঙ্গে করিয়া গান্ধী-

নগরে আমার বাটীতে লইয়া যাইব। আমার স্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তা বলিলেই আপনি সব জানিতে পারিবেন।"

শর্ম্মাজীর সহিত আলাপে ও ব্যবহারে বিশেষ প্রীত হইলাম। তিনি আমাকে তাঁহার রেষ্টুরেণ্টের সব বিভাগ খুঁটিনাটি করিয়া দেখাইলেন। কানপুরে তাঁহার রেষ্টুরেণ্ট বিখ্যাত। খাবার-দাবার বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সহিত তৈয়ারী ও পরিবেশন করা হয়। শর্ম্মাজীর স্ত্রী নিজের তত্ত্বাবধানে খাদ্যাদি প্রস্তুত করান। গ্রাহকগণকে পরিবেশনের ভার শর্ম্মাজী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর। কাজেই তাঁহাদের এই পারিবারিক যৌথ প্রতিষ্ঠানটির একটা লক্ষ্মীশ্রী আছে। পরদিন বৈকালে পাঁচটায় আসিব বলিয়া শর্ম্মাজীর নিকট হইতে বিদায় লইলাম। তাহার পরদিন যথাসময়ে শর্ম্মাজীর রেষ্টুরেণ্টে উপস্থিত হইলাম। শর্ম্মাজী আমাকে একটু বসিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার পুত্রকে হিসাব-নিকাশ বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার কাজ শেষ হইলে আমরা উভয়ে একটি টাঙ্গায় করিয়া গান্ধীনগরে শর্ম্মাজীর বাড়ীর অভিমুখে রওনা হইলাম। বাড়ীতে পৌঁছিয়া বাহিরের ঘরে আমাকে একটু বিশ্রাম করিতে বলিয়া তিনি বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে আমাকে বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া লইয়া গেলেন। বাড়ীটি নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে, রাস্তার নামকরণ এখনও হয় নাই।

বাড়ীর ভিতর বারান্দায় আমি ও বাবু মঙ্গলদেও দুইখানা চেয়ারে উপবেশন করিলাম। শর্ম্মাজীর স্ত্রী ও ভগ্নী বারান্দায় সতরঞ্চি পাতিয়া উপবেশন করিলেন। শর্ম্মাজীর স্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম।

প্রঃ। মা, আপনার নামটি কি জানিতে পারি কি?

উঃ। শ্রীমতী বিদ্যাবতী দেবী।

প্রঃ। আপনার নাকি পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণে আছে?

উঃ। হ্যাঁ, ছেলেবেলায় খুব বেশী ছিল, এখন ততটা মনে না থাকিলেও কিছু কিছু আছে।

প্রঃ। ছেলেবেলায় কত বয়সে আপনি পূর্ব্বজীবনের কথা বলিতে আরম্ভ করেন এবং কি সূত্র ধরিয়া প্রথমে বলিতে আরম্ভ করেন ?

উঃ। ছেলেবেলায় আড়াই বৎসর বয়সে কথা ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি পূর্ব্বজীবনের কথা বলিতে আরম্ভ করি। প্রথমতঃ খাওয়া-দাওয়ার সূত্র ধরিয়াই কথা বলা শুরু হয়। আমার মা রুটি বানাইয়া সকলকে খাইতে দিতেন। আমিও সেই রকম করিয়া মাটির রুটি বানাইয়া আমার পূর্ব্বজীবনের স্বামী পণ্ডিত বাসুদেব শর্ম্মার উদ্দেশ্যে রাখিয়া দিতাম এবং মনে মনে বলিতাম, "পণ্ডিতজী, তুমি এই আসিয়া খাও।" কখন কখন মাটির রুটি তৈয়ারি করিয়া, আসন করিয়া খাইতে দিয়া চলিয়া যাইতাম এবং মাকে যাইয়া বলিতাম, "মা, পণ্ডিতজীকে ভাল করিয়া খাওয়াও।" তারপর বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে মা-বাবা জিজ্ঞাসা করিলে ক্রমশঃ পূর্ব্বপতির বাড়ীর ঠিকানা, বাড়ীর বিবরণ ইত্যাদি বলিতে থাকি।

প্রঃ। আচ্ছা, আপনার এখন বয়স কত ?

উঃ। পঁচিশ বৎসরে পড়িয়াছি।

প্রঃ। জন্মের সন, তারিখ ইত্যাদি কিছু মনে আছে কি ?

উঃ। না।

প্রঃ। কত বৎসর বয়সে আপনার এই বর্ত্তমান বিবাহ হইয়াছিল ?

উঃ। পনের বৎসর বয়সে।

প্রঃ। ছেলেবেলায় আপনার পূর্ব্বস্বামীর নিকট যাইতে খুবই ইচ্ছা হইত না কি ?

উঃ। হ্যাঁ, খুবই হইত। বাবা-মাকে বলিতাম, "আমাকে সেখানে লইয়া চল," কিন্তু তাঁহারা আমাকে লইয়া যাইতেন না। বরং ওসব কথা বলিলে বলিতেন, "তোমার পূর্ব্বজীবনের স্বামী জীবিত নাই" এবং ওসব কথা না বলিবার জন্য নানা রকমে শাসাইতেন ও উচ্ছিষ্ট খাইতে দিতেন যাহাতে আমি ওসব কথা ভুলিয়া যাই, কারণ তাঁহাদের ধারণা ছিল

যে, উচ্ছিষ্ট খাওয়াইলে মানুষের পূর্ব্বস্মৃতি লোপ পায়। কিন্তু তাহাতেও আমি কিছুই ভুলিলাম না।

প্রঃ। আচ্ছা, পূর্ব্বস্বামীর প্রতি এত টান থাকা সত্বেও আপনার এই জীবনে বর্ত্তমান স্বামীর সহিত বিবাহ করিতে কোন কষ্ট অনুভব করেন নাই কি?

উঃ। যে বয়সে আমার বর্ত্তমান বিবাহ হয়, সে সময়ে পূর্ব্ব-স্বামীর প্রতি তেমন টান আর ছিল না, তবে তাঁহার কথা মনে ছিল এবং এখনও আছে। (তাঁহার বর্ত্তমান স্বামী বাবু মঙ্গলদেও শর্ম্মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলিয়াই সঙ্কোচবশতঃ এই কথা বলিলেন অথবা ইহা তাঁহার প্রকৃত মনোভাব—তাহা নির্দ্ধারণ করিবার অবসর আমার আর হয় নাই। কারণ, যখন আমি তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় বলিলাম যে, আমি উঝানিতে যাইয়া তাঁহার পূর্ব্বস্বামী পণ্ডিত বাসুদেব শর্ম্মার সহিত দেখা করিব, তখন তিনি খুবই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিজের কথা পূর্ব্বস্বামী পণ্ডিত বাসুদেব শর্ম্মাকে জানাইবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন। অথবা তাঁহার কথাই সত্য হইতে পারে। মোট কথা, এই বিষয়ে আমার মনে একটা সংশয় রহিয়া গিয়াছে।)

প্রঃ। আপনার পূর্ব্বস্বামীর সহিত দেখা হইয়াছিল কি? যদি হইয়া থাকে তবে তাহা কি প্রকারে সংঘটিত হইল এবং তিনিই বা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন আপনার কথা?

উঃ। হ্যাঁ, আমার পূর্ব্বস্বামীর সহিত দেখা হইয়াছে। বদায়ূনে আমার ভগ্নীর বাড়ীতে তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আমার ভগ্নীপতির নাম বাবু রামভরোসী, তিনি এখন দিল্লীতে টুপির কারবার করেন। আমি কামগঞ্জে থাকাকালীন আমাদের যে মহল্লায় বাড়ী ছিল সেই মহল্লার একটি ছেলের বিবাহ 'উঝানি' গ্রামে হয়। সেই বৌটির ভাই উঝানি হইতে তাহার বোনকে লইয়া যাইতে কামগঞ্জে আসে। একটি ছেলে উঝানি হইতে

আসিয়াছে শুনিয়া আমি তাহার সহিত দেখা করিতে যাই এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, উঝানি গ্রামের পণ্ডিত বাসুদেব শর্ম্মাকে সে চেনে কি না। তিনি কেমন আছেন ইত্যাদি নানা প্রশ্নই তাহাকে জিজ্ঞাসা করি। ছেলেটি একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত মেয়ের একটি অপরিচিত পুরুষ সম্বন্ধে এইরূপ কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত হয় এবং তাহার ভগ্নীকে আমার সম্বন্ধে নানা তথ্যাদি জিজ্ঞাসা করে। তাহার ভগ্নীর নিকট হইতে আমার সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া সে বাড়ী যাইয়া পণ্ডিত বাসুদেব শর্ম্মাকে সমস্ত কথা বলে। বাবু বাসুদেব শর্ম্মা তাহার প্রমুখাৎ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া আমাকে দেখিবার জন্য কানপুরে আমার কাকার বাড়ীতে আসেন, কিন্তু তিনি যখন আমাকে দেখিবার জন্য কানপুরে আসেন, তখন আমি বদায়ুনে আমার ভগ্নীর বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছিলাম। তিনি কানপুর হইতে বদায়ুনে যান এবং সেখানে আমার সহিত তাঁহার দেখা হয়।

প্রঃ। আচ্ছা, আপনার পূর্ব্বস্বামীকে দেখিয়াই তখন চিনিতে পারিয়াছিলেন কি?

উঃ। যতদূর মনে পড়ে, খুব স্পষ্টভাবেই চিনিতে পারিয়াছিলাম।

প্রঃ। তাঁহার নিকট আপনি কিছু বলিয়াছিলেন কি?

উঃ। যতদূর মনে পড়ে, তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আমার গলার যে সোনার গুলিবন্ধ ছিল, তাহা আমি বাড়ীর আঙ্গিনার তুলসীমঞ্চের পাশে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলাম। বাড়ীতে যাইয়া খুঁড়িয়া তিনি তাহা পাইয়াছিলেন—এই খবর তিনি আমাকে পরে জানাইয়াছিলেন।

প্রঃ। আচ্ছা, আপনার পূর্ব্বস্বামীর বাড়ীর বিবরণ আপনার মনে আছে কি?

উঃ। হ্যাঁ, আমার পূর্ব্বস্বামীর 'উঝানি' গ্রামের বাড়ীর সম্মুখে একটি চবুতরা আছে। বাড়ীটি ইষ্টকনির্ম্মিত। বাড়ীর দরজা লাল রংয়ের। বাড়ীর ভিতরে নিমের গাছ আছে। আঙ্গিনা প্রাচীর দিয়া ঘেরা এবং আঙ্গিনার ভিতর কুয়া আছে।

প্রঃ। কিরূপে আপনার মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা মনে আছে কি ?

উঃ। হ্যাঁ, মনে আছে। উঝানিতেই আমার মৃত্যু হয়। আমার একটি কন্যাসন্তান হয়। কন্যাটি প্রসবের তিন দিন পরেই আমার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার বসন্তরোগও হইয়াছিল।

প্রঃ। পূর্ব্বজীবনে আপনার কাহার প্রতি টান খুব বেশী ছিল ?

উঃ। আমার স্বামীর প্রতিই আমার সব চাইতে গভীর টান ছিল। কি করিয়া তাঁহাকে সুখী করিব—ইহাই ছিল আমার একমাত্র চিন্তা।

প্রঃ। পূর্ব্বজীবনের পিতামাতার নাম আপনার মনে আছে কি ?

উঃ। পূর্ব্বজীবনে আমার পিতার নামও ছিল বাবু বাসুদেব শর্ম্মা; মাতাজীর নাম মনে নাই।

প্রঃ। বর্ত্তমান জন্মের পিতামাতা সম্বন্ধে কিছু মনে আছে কি ?

উঃ। আমার পিতার নাম ছিল বাবু নাথুরাম, তিনি দুই বৎসর পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন। কানপুর হইতে বি, বি, সি, আই, লাইনে রুদেইন নামে একটি ষ্টেশন আছে, সেই গ্রামেই আমাদের বাড়ী ছিল। আমাদের বংশের এখন আর কেহ জীবিত নাই। আমার যখন পাঁচ বৎসর বয়স তখন আমার মাতাজীর মৃত্যু হয়। তিনি মারা যাইবার পর আমি আমার চাচীর কাছেই প্রতিপালিত হই, চাচী আবার আমার মাসীমাও বটেন। আমার চাচা বাবু পূরণচাঁদ দীক্ষিত এখনও জীবিত আছেন এবং এখন কানপুরেই থাকেন। তাঁহার নিকট হইতে আমার বাল্যজীবনের সংবাদ কিছু জানিতে পারেন, কারণ তিনি উঝানিতে যাইয়া সংবাদ লইয়াছিলেন।

প্রঃ। পূর্ব্বজীবনে আপনি পূজা-অর্চ্চনাদি করিতেন কি ? লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন কি ?

উঃ। পূর্ব্বজীবনে আমি মহাদেওজীর পূজা করিতাম, লেখাপড়া বিশেষ কিছু করি নাই।

প্রঃ। আপনি যাহা যাহা বলিলেন তাহা ছাড়া এখন আর কিছু মনে আছে কি ?

উঃ। এখন তো আর কিছু মনে পড়ে না। ছেলেবেলায় আরও অনেক কথা মনে ছিল—তখন যাঁহারা শুনিয়াছিলেন তাঁহাদের যদি কিছু মনে থাকে।

শ্রীযুক্তা বিদ্যাবতী দেবীর সহিত উক্তরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর তাঁহার স্বামী বাবু মঙ্গলদেও শর্ম্মাজীর সহিত নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা হইল।

প্রঃ। আপনি কত বয়সে এই বিবাহ করিয়াছিলেন?

উঃ। আমার পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে আমি ইহাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করি, তখন ইহার বয়স ছিল পনের বৎসর। আমার মৃতা পত্নীর একটি সন্তান আছে, সেই এখন রেষ্টুরেন্টের কার্য্যাদি সব দেখে। বর্ত্তমান স্ত্রীর দুইটি কন্যা—প্রথমটির বয়স পাঁচ বৎসর, দ্বিতীয়টির বয়স দেড় বৎসর।

প্রঃ। আপনার এই দ্বিতীয় পত্নীর আচার-ব্যবহার আপনার সহিত কিরূপ?

উঃ। এক কথায় বলিতে পারি, সে অত্যন্ত পতিপরায়ণা—কিসে আমি সুখে থাকিব, কি করিয়া আমার শরীর ও মন সুস্থ থাকে, আমি সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি লাভ করি, ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয়। সে খুব ধীর ও শান্ত; কাহারও প্রতি কখনও বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইতে জানে না। জীবনে সে কখনও আমার সহিত মিথ্যাচরণ করে নাই। আমার জীবনের যাহা কিছু উন্নতি তাহা হইতেই। তাহাকে যখন আমি বিবাহ করি তখন আমার সাংসারিক অবস্থা এরূপ যে, আমার দৈনন্দিন আহার সংস্থানের কোন উপায় ছিল না। আমি হাতরাশে এক ডেয়ারী ফার্ম্ম খুলি, তাহা ফেল হইয়া যাওয়াতেই আমার এইরূপ অবস্থা হয়, তখন আত্মহত্যা করিয়া জীবন শেষ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, এই অবস্থায় আমার এই স্ত্রী আমার নিকট আসিতে চাহিল এবং লিখিল যে, যদি তোমার এক টুক্‌রা রুটি মেলে তার আধ টুক্‌রা আমায় দিও—তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকিব।

সে আমার সংসারে আসিবার পর হইতেই সংসারের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট ক্রমশঃ দূর হইয়া গেল। আমার এই ব্যবসায়েও সে আমাকে সর্ব্ব-

প্রকারে সাহায্য করিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে বলিবার আমার কিছুই নাই, সে প্রকৃতই লক্ষ্মীস্বরূপা।

রাত্রি ৮॥টা পর্য্যন্ত এই সব কথাবার্ত্তা কহিয়া হরবংশ-মহলে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

তৎপরদিবস প্রাতে পূজাদি সমাপনান্তে বেলা ৭টার সময় বাবু মঙ্গলদেও শর্ম্মার রেষ্টুরেণ্টে গেলাম ও তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীযুক্তা বিদ্যাবতী দেবীর কাকা বাবু পূরণচাঁদ দীক্ষিতের বাড়ীতে গেলাম।

তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, বিদ্যাবতী দেবীর বাল্যকালের ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার কিছু জানা আছে কিনা। উত্তরে তিনি বলিলেন—"আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহা হইলেই সব জানিতে পারিবেন, কারণ তিনিই বাল্যকালে তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর তাঁহাকে লালন-পালন করিয়াছিলেন।" তিনি তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া দিলেন। তাঁহার স্ত্রী আসিয়া মেঝেতে উপবেশন করিলে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম—বিদ্যাবতী কয় বৎসর বয়সে তাহার পূর্ব্বজীবনের কথা বলিতে আরম্ভ করে এবং কি সূত্র ধরিয়া বলিতে আরম্ভ করে ?

উঃ। আড়াই বৎসর বয়সে মাটির খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া সে বলিত, "পণ্ডিতজী, তুমি আসিয়া এইসব গ্রহণ কর।" বাড়ীতে একটা বেলগাছ ছিল, তাহার দিকে তাকাইয়া ঐভাবে পণ্ডিতজীকে ডাকিত। তারপর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে পণ্ডিতজী, কোথায় তিনি থাকেন ইত্যাদি।" তাহার উত্তরে ক্রমশঃ সে সব কথাই বলিতে লাগিল। সে বলিত—"আমার গহনা, কাপড় ইত্যাদি সবই আমি উঝানিতে রাখিয়া আসিয়াছি, বাবা আমাকে কিছুতেই সে সব আনিতে দিতে চাহেন না।" পাঁচ বৎসর বয়সে তাহার মাতার মৃত্যু হয়, সেই অবধি সে আমাকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছে।

প্রঃ। আচ্ছা, তাহার পূর্ব্বজীবনের স্বামী যখন তাহাকে দেখিতে আসেন, তখন বিদ্যাবতী তাঁহার সহিত যাইতে চাহিয়াছিল কি ?

উঃ। সে তখন কোন কথা বলে নাই, চুপ করিয়া ছিল। তাহার পূর্ব্বস্বামী পণ্ডিত বাসুদেব বিদ্যাবতীকে লইতে ও তাহার সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলেন, কিন্তু আমরা তাহাকে দিতে রাজি হই নাই।

প্রঃ। ছেলেবেলায় মেয়েটি কি খুব বুদ্ধিমতী ছিল?

উঃ। হ্যাঁ, অন্যান্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে সে ঢের বেশী বুদ্ধি রাখিত, এবং বিবেচনা-শক্তিও বেশ তীক্ষ্ণ ছিল।

তাঁহার স্ত্রীর সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর বাবু পূরণচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি বিদ্যাবতী সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কি?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি উঝানি গ্রামে নিজে গিয়াছিলাম। বিদ্যাবতী উঝানি গ্রামের বাড়ীর যে বর্ণনা দিয়াছিল, সেখানে যাইয়া মিলাইয়া দেখিলাম, সবই ঠিক ঠিক মিলিল।"

প্রঃ। আর কাহারও সহিত এ বিষয়ে আলাপ করেন নাই কি?

উঃ। না, আর কাহারও সহিত আলাপ করি নাই। আমি গুপ্তভাবেই গিয়াছিলাম পরীক্ষা করিবার জন্য যে, বিদ্যাবতীর বর্ণিত বাড়ীর বিবরণ ঠিক কিনা—যখন দেখিলাম যে, তাহার বর্ণনা আশ্চর্য্যভাবে মিলিয়া গেল তখন আমার বিশ্বাস হইল যে, সে যাহা যাহা বলিয়াছে সবই ঠিক, তাই আর কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই।

বিদ্যাবতী দেবীর কাকা বাবু পূরণচাঁদ কানপুরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, এককালে তিনি খুবই ধনী ছিলেন। এখন অধিকাংশ সময় আর্য্য-সমাজেই অতিবাহিত করেন।

আলাপাদির পর তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিলাম।

কানপুরে আরও কয়েকদিন থাকিয়া উঝানি যাইবার উদ্দেশ্যে কানপুর হইতে সন্ধ্যার ট্রেনে রওনা হইয়া লক্ষ্ণৌএ বদল করিয়া পরদিন প্রাতে বেরেলী পৌঁছিলাম। বেরেলী সিটি ষ্টেশন হইতে প্রাতে ৭-২২ মিঃ-এর ট্রেনে উঠিয়া বেলা ৯॥টায় উঝানি ষ্টেশনে যাইয়া পৌঁছিলাম।

ষ্টেশনে নামিয়া রাস্তা দিয়া চলিবার সময় একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হইল, তিনি এখানে ব্যবসা করেন এবং এখানকার একজন অধিবাসী। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি এখানকার বাসুদেব শর্ম্মাকে চেনেন কিনা? তিনি বলিলেন যে, এখানে ঐ একই নামের দুইজন লোক আছেন এবং দুইজনই বৈদ্যের ব্যবসা করেন। শুনিয়া আমি একটু মুস্কিলে পড়িলাম। তখন ভদ্রলোকটিকে আমার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"আপনি হাকিম বাসুদেব শর্ম্মা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা হইলেই লোকে বলিয়া দিবে; তিনি ঐ নামেই এ অঞ্চলে পরিচিত।" আরও বলিলেন—"তাঁহার পূর্ব্বজীবনের স্ত্রীর জাতিস্মরত্বের কথা যাহা আপনি শুনিয়াছেন তাহা সবই সত্য।" সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির সহিত আলাপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দেখিলাম ইহা একটি বেশ বড় গঞ্জ—প্রকাণ্ড সূতার কল, হাসপাতাল, থানা ইত্যাদি সবই আছে। সব্জীর বাজারটি তো বেশ বড়।

ভদ্রলোকটি আমাকে হাকিম বাসুদেব শর্ম্মার বাড়ী দেখাইয়া দিবার জন্য আমার সহিত অনেকদূর আসিলেন। আমাকে হাকিম বাসুদেব শর্ম্মার বাড়ী দেখাইয়া দিয়া তিনি তাঁহার কার্য্যে অন্যত্র গেলেন। শর্ম্মাজীর বাড়ী ষ্টেশন হইতে দেড় মাইল হইবে। শর্ম্মাজীর সহিত আলাপ হইল। লোকটি বেশ সজ্জন। আমার হাত-মুখ ধুইবার জন্য ছেলেদের জল দিতে বলিলেন এবং হাত-মুখ ধোয়া হইলে সরবৎ আনিয়া দিলেন। তাহার পর তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। আমি বলিলাম—"আপনি আপনার পূর্ব্বপত্নী—যিনি জাতিস্মর হইয়া অন্যত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ—তাঁহাকে দেখিয়াছেন কি? কবে, কি ভাবে তাঁহার সহিত আপনার দেখা হইয়াছিল তাহা বলিবেন কি?"

উঃ। মেয়েটির বয়স যখন অনুমান সাত বৎসর তখন তাহার সম্বন্ধে শুনিয়া কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে দেখিতে যাই বদায়ুনে—সেখানে

সে তখন তাহার ভগ্নীর বাড়ীতে ছিল। আমরা দুইজন গিয়াছিলাম এবং যাইয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, আমরা কাশগঞ্জ হইতে আসিয়াছি। তাহার ভগ্নীর বাড়ীতে যাইয়া একটি ছোট ছেলেকে দেখিয়া তাহাকে ডাকিয়া—যে মিঠাই আমি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম উহা বাড়ীতে দিবার জন্য বলিলাম এবং বলিয়া দিলাম যে, জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে যে, দুইটি ভদ্রলোক কাশগঞ্জ হইতে এই মিঠাই দিবার জন্য আসিয়াছেন। মেয়েটি তখন ঐ ছেলেটির সঙ্গেই ছিল, সেও ছেলেটির সঙ্গে বাড়ীর ভিতর গেল এবং পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, মেয়েটি ছেলেটির হাত হইতে মিঠাই লইয়া তাহার বড় ভগ্নীকে দিল। তাহার বড় ভগ্নী অপরিচিত লোকের মিঠাই লইতে অস্বীকার করিলে মেয়েটি বলিল, ইহাতে কোন দোষ হইবে না—ইহারা কাশগঞ্জ হইতে আইসে নাই, আসিয়াছে উঝানি হইতে।

মেয়েটি প্রথমে আমাকে দেখিয়াই ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। ছেলেটির সহিত সে যখন বাড়ীর ভিতর যাইতেছিল তখন এই সেই মেয়ে ইহা অনুমান করিয়াই আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি আমাকে চিনিতে পার কি না? আমার কথার কোন উত্তর না দিয়াই সে ছেলেটির সঙ্গে বাড়ীর ভিতর যায় এবং তাহার ভগ্নীকে ঐ কথা বলে এবং আমার নামও তাহার ভগ্নীর নিকট প্রকাশ করে।

সেদিন তাহাদের বাড়ীতে অবস্থান করি। পরে মেয়েটির সহিত যখন পরিচয় হইল তখন তাহাকে আমার বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করি। সে তখন আমার বাড়ীর সম্বন্ধে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা দিল যে, আমি শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমার বাড়ীতে দীর্ঘদিন অন্তরঙ্গ-ভাবে অবস্থান না করিলে কাহারও পক্ষে এরূপ সুন্দর বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে, ছোট মেয়ের পক্ষে তো একেবারেই অসম্ভব।

তারপর আমার ভাই-এর কথা, আমার নিকট-আত্মীয় প্রভৃতির

কথা, আমার বাড়ীতে যে যে আসবাবপত্র আছে, বাসন-কোসন যাহা আছে—খুঁটিনাটি করিয়া সে বলিল।

প্রঃ। মেয়েটি টাকাপয়সা বা গহনা সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলিয়াছিল কি?

উঃ। সে আমাকে বলিয়াছিল—"বাড়ীর ভিতর আঙ্গিনায় যে নিম-গাছ আছে তাহার গোড়ায় আমি একশত টাকা পুঁতিয়া রাখিয়াছি, তাহা তুলিয়া লইবেন। আর আমার সোনার গুলীবন্ধ আঙ্গিনার তুলসী-মঞ্চের পাশে পোঁতা আছে, তাহাও তুলিয়া লইবেন।" আমি টাকার কথায় তাহাকে বলিলাম যে, সেই একশত টাকা তুমি কোথায় রাখিয়াছিলে তাহা আমার জানা ছিল, তাই তোমার মৃত্যুর পর আমি উহা উঠাইয়া লইয়া তোমার বার্ষিক শ্রাদ্ধে উহা দ্বারা ব্রাহ্মণভোজন করাইয়াছি।

আমার এই কথা শুনিয়া মেয়েটি খুবই খুশী হইল। বাড়ীতে যাইয়া তাহার নির্দ্দেশমত তুলসীমঞ্চের পাশে খুঁড়িয়া তাহার সোনার গুলীবন্ধ পাওয়া গেল না। না পাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বাবু বাসুদেব শর্ম্মা বলিলেন—আমার মনে হয়, তাহার অসুখের সময় যে স্ত্রীলোকটি তাহার পরিচর্য্যা করিত সম্ভবতঃ টের পাইয়া সে উহা উঠাইয়া লইয়া থাকিবে।

প্রঃ। মেয়েটি আপনাকে তাহার সন্তান সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিয়া-ছিল কি?

উঃ। হ্যাঁ, সে তাহার মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল (অর্থাৎ যে মেয়েকে রাখিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছিল)। যখন আমি তাহাকে বলিলাম যে, তাহার মৃত্যুর দুইদিন পরেই মেয়েটি মারা গিয়াছে তখন তাহা শুনিয়া মেয়েটিও কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রঃ। আচ্ছা, মেয়েটি আপনার বাড়ীর যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিবরণ দিয়াছিল, তাহা সবই মিলিয়াছিল, না কোথাও গরমিল ছিল?

উঃ। তাহার সব বিবরণই মিলিয়াছিল, কেবল সে যে বলিয়াছিল যে, বাড়ীর ভিতর কুয়া ছিল, তাহা ঠিক নহে।

প্রঃ। আচ্ছা, মেয়েটি অর্থাৎ বিদ্যাবতী দেবী আমাকে বলিয়াছিল যে, সন্তান প্রসবের দরুণই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল—ইহা কি ঠিক?

উঃ। তাহা হইলে তাহার মৃত্যু সম্বন্ধীয় ব্যাপারটা একটু খুলিয়া বলি।

একবার আমি তাহাকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া যোধপুর যাই। তখন সে অন্তঃসত্ত্বা ছিল। বাড়ীতে বা শ্বশুরালয়ে ছয় মাস কোন খবর দিই নাই বা চিঠিপত্রাদি লিখি নাই। দীর্ঘদিন আমার কোন সংবাদ না পাওয়ায় রটনা হইয়া গেল যে, আমার মৃত্যু হইয়াছে। এই সংবাদ তাহার নিকট পৌঁছিলে সে চৌদ্দ দিন আহারাদি ত্যাগ করিয়া অনশনে ছিল। আমি ইতিমধ্যে তাহার পিত্রালয়ে মনি অর্ডারযোগে পঞ্চাশ টাকা পাঠাই এবং তাহার অব্যবহিত পরেই তাহাকে দেখিতে আসি। আমি আসিলেই সে আমাকে অনুরোধ করিল, তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে আসিতে, তখন তাহার পুরা নয় মাস গর্ভাবস্থা—তাহার একান্ত অনুরোধে বাধ্য হইয়া পাল্কীতে করিয়া তাহাকে আমার নিজগৃহে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলাম। পথিমধ্যে বিলাসী নামক গ্রামে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে সে একটা কন্যা-সন্তান প্রসব করে। প্রসবের ছয়-সাত দিন পরে পাল্কী করিয়া তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আসি। বাড়ীতে আসিবার তিন দিন পরে তাহার মৃত্যু হয় এবং তাহার মৃত্যুর দুই দিন পরে কন্যাটি মারা যায়।

প্রঃ। তাহা হইলে সে যে আমাকে বলিয়াছিল যে, কন্যা প্রসবের তিন দিন পরে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল তাহা ঠিক নয় দেখিতেছি। আপনার কথানুসারে আপনার বাড়ীতে আসিবার তিন দিন পরেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল, আর কন্যা প্রসবের দশ দিন পরে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

উঃ। হ্যাঁ তাই, ব্যাপারটা উল্টা-পাল্টা হইয়া থাকিবে—আপনি যখন তাহার নিকট হইতে তাহার পূর্ব্বজীবনের কথা শুনিয়াছেন তখন তাহার বয়স অনুমান পঁচিশ বৎসর হইবে। দীর্ঘদিনের ব্যবধান হেতু ভ্রান্তিও হইতে পারে।

প্রঃ। আপনি মেয়েটিকে একবারই দেখিয়াছিলেন, না তাহার পরে আরও দেখা হইয়াছিল ?

উঃ। প্রথমবার সাত বৎসর বয়সে তাহার সহিত আমার দেখা হয়, তাহার পর তাহার বসন্তরোগ হইয়াছে শুনিয়া তাহাকে বদায়ূনে দ্বিতীয়বার দেখিতে যাই—সেবারেও ফিরিয়া আসিবার সময় কিছুতেই আমাকে আসিতে দিতে চাহে নাই, নানা অছিলায় আমাকে কয়েকদিন আটকাইয়া রাখিয়াছিল। ভাল কথা, প্রথমবারে তাহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—প্রথমবারে যখন তাহার সহিত দেখা হয়, সে তখন তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে বলিয়াছিল—"দিদি, ইহাকে বেশী করিয়া পান দিও, ইনি অনবরত পান খাইতে অভ্যস্ত।" কথাটা খুবই সত্য, তখন আমি খুবই পান খাইতাম।

প্রঃ। আচ্ছা, আপনার কয়টি বিবাহ হইয়াছিল ? পত্নীদের মধ্যে সব চাইতে কে আপনার প্রতি অনুরক্তা ছিলেন ?

উঃ। আমি পর পর চারিবার বিবাহ করি ; বর্ত্তমান স্ত্রী আমার চতুর্থী পত্নী। যাহার কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেই মোহন দেবী ছিল আমার তৃতীয়া পত্নী। আমার এই চার পত্নীর মধ্যে মোহন দেবীই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অনুরক্তা। তাহার কথা স্মরণ হইলে আমার এই বৃদ্ধ বয়সেও চোখে জল আসে। সে জীবনে কখনও আমার ভোজনের পূর্ব্বে অন্নগ্রহণ করে নাই। আমি বৈদ্য, চিকিৎসার জন্য দূর গ্রামে গেলে কোন কোন সময় এক-দুই দিন দেরী হইত, সে দুই-এক দিন পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিত, এরূপ প্রায়ই ঘটিত। আমি নানাপ্রকারে বুঝাইলেও সে কিছুতেই তাহা বুঝিতে চাহিত না। অবশেষে তাহার পিতা তাহাকে অনেক করিয়া বলিলেন যে, যখন তোমার স্বামী গ্রামে থাকেন, জানা আছে যে তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন, তখন না হয় তুমি তাঁহার ভোজনের পূর্ব্বে অন্নগ্রহণ না করিলে, কিন্তু যখন তিনি দূরে যান, তখন অযথা এরূপ উপবাস না করিয়া তাঁহার নামে অন্ন নিবেদন করিয়া তুমি অন্নগ্রহণ করিও, তাহাতে দোষ হইবে না। তাহার

পর হইতে সে ঐরূপই করিত। কিরূপে আমি সুখে থাকিব—ইহাই ছিল তাহার একমাত্র চিন্তা—আর সে বর্ত্তমান থাকিতে আমার কোন অভাব ছিল না।

প্রঃ। আচ্ছা তাহার মৃত্যুর সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন কি ?

উঃ। হ্যাঁ, আমি তাহার মৃত্যুর সময় তাহার শয্যাপার্শ্বেই উপস্থিত ছিলাম। রামনাম জপ করিতে করিতে তাহার মৃত্যু হয় এবং তাহার ইচ্ছানুযায়ী গঙ্গাতীরে যাইয়া তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

প্রঃ। মেয়েটির সহিত আপনার প্রথম যখন দেখা হয় তখন কি আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাহার কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহার স্মরণে ছিল কি ?

উঃ। না, সে সব কিছু তাহার স্মরণে ছিল না।

প্রঃ। যখন তাহার সহিত আপনার প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন সে কি আপনার সঙ্গে আসিতে চাহিয়াছিল ?

উঃ। হ্যাঁ, সে আমার সঙ্গে আসিতে খুব উৎসুক ছিল। তাহার আত্মীয়েরা আমাকে তাহাকে পুনরায় বিবাহ করিবার কথা বলিয়াছিলেন। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, আমার এখন বয়স হইয়াছে, মেয়েটি অত্যন্ত ছোট, তাহার পর আমি পুনরায় বিবাহ করিয়াছি—সুতরাং আমার সহিত এ বিবাহ কি প্রকারে হইতে পারে ?

প্রঃ। মেয়েটি নিজে আপনার সহিত বিবাহিত হইবার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল কি ?

উঃ। না, মেয়েটি নিজে এ সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা বলে নাই, এ সম্বন্ধে সে বরাবরই চুপচাপ ছিল।

প্রঃ। আচ্ছা, আপনার 'রতিয়া' নামে কোন ভাই ছিল কি ?

উঃ। আমার 'রামপ্রসাদ' নামে একটি ছোট ভাই ছিল, সে তাহার বৌদিদির খুব প্রিয় ছিল, সেও তাহার বৌদিদিকে খুবই ভালবাসিত।

প্রঃ। মোহন দেবী পূর্ব্বজীবনে পূজা-অর্চ্চনাদি করিত কি ?

উঃ। হ্যাঁ, সে মহাদেবের পূজা করিত, কিন্তু আমার মনে হইত, তাহার 'জেয়াদা খেয়াল' আমার দিকেই ছিল।

এই সব কথাবার্ত্তাদি হইবার পর তিনি আমার আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। স্বহস্তে আহারাদি প্রস্তুত করিয়া ভোজনান্তে বিশ্রামের পর পণ্ডিত বাসুদেব শর্ম্মা ও তাঁহার পুত্রদের ফটো লইলাম। আসিবার সময় আমার কাশি আছে দেখিয়া শর্ম্মাজী আমাকে কয়েকটি গুলি খাইতে দিলেন এবং তাঁহার নিজের হাতের প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ দিলেন—তাহার রং কাল নহে। তিনি বলিলেন—প্রকৃত শাস্ত্রীয় মতে তৈয়ারী করিলে রং কাল হইতে পারে না। ইহা গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ঋতুতে একরূপই থাকিবে, গরমে নরম বা শীতে বেশী জমাট হইবে না।

আসিবার সময় পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—বিদ্যাবতী দেবীই যে আপনার মৃতা পত্নী মোহন দেবী সে বিষয়ে আপনার মনে কোনরূপ সন্দেহ আছে কি? উত্তরে তিনি বলিলেন—না, এ বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আসিবার সময় বাসুদেব শর্ম্মা বলিলেন—আমার নামে চিঠি দিলে হাকিম বাসুদেব শর্ম্মা বলিয়া লিখিবেন, কারণ আমার এই নামে এখানে অন্য আর একজন লোকও আছেন।

সেই দিনই সন্ধ্যা ৬টার ট্রেনে উঝানি হইতে রওনা হইয়া রাত্রি ৮৷৷টায় বেরেলী পৌঁছিলাম।

॥ দশ ॥

উঝানি হইতে ফিরিয়া বেরেলীতে আসিলাম। পূর্ব্বে বেরেলীতে থাকাকালীন বাবু কৈকেয়ীনন্দন সহায়ের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, মোরাদাবাদের বর্ত্তমান সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু রামগোপাল মিশ্র

জাতিস্মরদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তাই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য মোরাদাবাদ যাইতে মনস্থ করিলাম। বেরেলী হইতে বেলা ২টায় পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া বেলা ৪॥টায় মোরাদাবাদ পৌঁছিলাম। বেরেলীর Cane development officer-এর হেড একাউন্‌টেণ্ট বাবু বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, এম-কম, মহাশয় মোরাদা-বাদের Deputy cane development officer-এর হেড ক্লার্ক বাবু ওম্ প্রকাশকে আমার মোরাদাবাদ যাইবার কথা পূর্ব্বেই জানাইয়া দিয়াছিলেন। ট্রেন হইতে নামিতেই বাবু ওম্ প্রকাশের সহিত দেখা হইল,—তিনি আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া তাঁহার বাসাতেই যাইয়া উঠিবার জন্য ধরিয়া পড়িলেন। তাঁহার উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া সম্মত হইলাম। টাঙ্গা করিয়া কাঠগড় মহল্লায় বাবু ওম্ প্রকাশের বাসায় আসিলাম।

সন্ধ্যায় স্নান ও আহারাদি সমাপনান্তে রামগঙ্গা ব্রিজের দিকে বেড়াইতে গেলাম।

ভ্রমণান্তে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া বাবু ওম্ প্রকাশের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হইল। তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে বাবু ওম্ প্রকাশের সঙ্গে তাঁহার অফিসে গেলাম। তিনি তাঁহার অফিসের এক আরদালিকে আমার সঙ্গে দিলেন। সে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু রামগোপাল মিশ্রের বাসায় আমাকে পৌঁছাইয়া দিল।

খবর দিতেই বাবু রামগোপাল মিশ্র-মহাশয় বাহিরে আসিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় হইল এবং আমার আগমনের কারণ তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার একটি পুত্রের টাইফয়েড হওয়ার দরুণ তাঁহার মন উদ্বিগ্ন আছে, ডাক্তার ছেলেটিকে দেখিতে আসিয়াছে। এখন তিনি এবিষয়ে আলোচনা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে সন্ধ্যার পর তাঁহার বাসায় আসিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। আমি বলিলাম, "আপনার পুত্র এরূপ সাংঘাতিক-ভাবে পীড়িত জানিলে আমি আপনাকে এসময়ে আসিয়া উত্যক্ত করিতাম

না।” উত্তরে তিনি বলিলেন, “আপনি এতদূর হইতে আসিয়াছেন, আমারই সময় করিয়া লওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা পারিয়া উঠিতেছি না, আপনি দয়া করিয়া সন্ধ্যার পর আসিবেন।” আমি তথাস্তু বলিয়া সে-সময়ের মত বিদায় লইলাম।

সন্ধ্যার সময় ওম্ প্রকাশের শ্যালক লালাকে সঙ্গে লইয়া বাবু রাম-গোপাল মিশ্রের বাটিতে গেলাম। তাঁহার ছেলেটির তখন খুব critical stage, তবুও তিনি আসিলেন এবং গোয়ালিয়রের একটি জাতিস্মর বালকের কথা বলিলেন এবং বলিলেন যে, আলোয়ার ষ্টেটের দেওয়ান রাও বাহাদুর শ্যামসুন্দর লাল, সি, আই, ই, মহোদয় স্বয়ং নিজে পরীক্ষা করিয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, জাতিস্মরদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য তাঁহারা একটি সমিতি গঠন করিয়াছিলেন, তিনি নিজে উহার Organizing secretary ছিলেন এবং রাও বাহাদুর শ্যামসুন্দর লাল উহার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। রাও বাহাদুরের রাজপুতানা ষ্টেটসমূহের উপর বিশেষ প্রভাব ছিল এবং তিনি আমাদের এই সমিতির জন্য দেশীয় রাজন্যবর্গের নিকট হইতে অর্থও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি বয়োবৃদ্ধ হইলেও এবিষয়ে যুবার ন্যায় উদ্যমশীল ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আর এই সমিতির কোন কাজ হয় নাই।

গোয়ালিয়রের সেই জাতিস্মর বালকটির সম্বন্ধে বলিলেন যে, সেই ছেলেটির নাম ছিল সুখলাল, জাতিতে ব্রাহ্মণ—তাহার পিতার নাম মিহিলাল। গোয়ালিয়র ষ্টেটের ভিন্দ জেলার বিশালপুরা গ্রামের অধিবাসী ইহারা।

বালক সুখলালের পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণে ছিল। সে বলে যে, পূর্ব্বজন্মে সে ভিন্দ জেলার নহাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তখন তাহার নাম ছিল কাশীরাম এবং সে পাটোয়ারীর কার্য্য করিত। নহাটা গ্রামের ভগবন্ত সিংহের পুত্র ছোটেলাল শত্রুতাবশতঃ তরবারির আঘাতে তাহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি কাটিয়া দেয়, তাহার বুকে গুলি বিদ্ধ

করে এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, জন্মাবধি শিশু সুখলালের দক্ষিণ হস্তের আঙ্গুলগুলি নাই।

শিশু সুখলালের (যখন সে কথা বলিতে আরম্ভ করে তখন) দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি নাই বলিয়া সকলে বিস্ময় প্রকাশ করিত। যখন সে প্রথম কথা বলিতে আরম্ভ করে তখন একদিন এই সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলে যে, পূর্ব্বজন্মে ছোটেলাল তাহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি কাটিয়া দিয়াছিল, তাই এজন্মে তাহার অঙ্গুলিগুলি নাই এবং ক্রমশঃ তাহার হত্যার বিবরণ প্রকাশ করিতে থাকে। পূর্ব্ব-জীবনে কাশীরামের হত্যা এরূপ সাবধানতা ও চতুরতার সহিত করা হইয়াছিল যে, পুলিশ সন্দেহ করিতে পারে নাই যে, নহাটা গ্রামের ভগবন্ত সিংহের পুত্র ছোটেলাল কর্ত্তৃক এই হত্যা সংঘটিত হইয়াছে।

বিশালপুরা গ্রামের এই শিশু সুখলাল যখন তাহার পূর্ব্বজীবনের কথা বলিতে আরম্ভ করে, তখন এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হয় এবং বহুলোক বালকটিকে দেখিতে আসিত। একদিন বহু জনতার সহিত নহাটা গ্রামের ভগবন্ত সিংহের পুত্র ছোটেলাল কৌতূহলী হইয়া বালকটিকে দেখিতে আসে। জনতার মধ্য হইতে ছোটেলালকে সুখলাল চিনিতে পারে এবং চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে, 'ঐ আমার হত্যাকারী'। ছোটেলাল কোন রকমে পলায়ন করিয়া জনতার ক্রোধবহ্নি হইতে স্বীয় প্রাণ রক্ষা করে। বাবু রামগোপাল মিশ্র বালকটির ফটোও আমাকে দেখাইলেন। ফটোতে দেখিলাম যে, বালক সুখলালের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি নাই।

বিদায় লইবার সময় তিনি বলিলেন, "আপনার ঠিকানা রাখিয়া যান, আমি সুবিধামত জাতিস্মর সম্বন্ধে যে কয়টি genuine case-এর রিপোর্ট আমার নিকট আছে,—যাহার সত্যতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছি—তাহা আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব।" উঠিবার সময় আমার সহিত ভালভাবে কথা বলিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

তাঁহার এই সৌজন্যে আমি বড়ই বিব্রত বোধ করিতে লাগিলাম। তাঁহাকে বলিলাম যে, আপনার এই সঙ্কট-সময়ে আসিয়া আপনাকে বিরক্ত করিতেছি মনে করিয়া আমি নিজেই বড় সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম। তবুও আপনি আমার জন্য যে এতটা সময়ক্ষেপ করিলেন তাহার জন্য আপনার নিকটে চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। তিনি আরও বলিলেন, আমার ছেলেটি অসুস্থ না হইলে আমি আপনাকে অন্যত্র অবস্থান করিতে দিতাম না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ভদ্রতা ও সৌজন্য আমাকে মুগ্ধ করিল।

পণ্ডিত মিশ্রের ওখানেই মোরাদাবাদের জেলা জজ ও অন্যান্য উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইল। বাসায় ফিরিতে রাত্রি প্রায় ১১টা হইল।

তৎপর দিন মোরাদাবাদ শহর দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। এখানকার brassware বিখ্যাত, কুটীরশিল্প হিসাবে ইহা প্রচলিত। শহর দেখিয়া ফিরিবার পথে বাজার হইতে ওম্‌প্রকাশের মেয়ে মুন্নার জন্য লিচু কিনিয়া আনিয়া তাহাকে দিলাম। সে উহা পাইয়া মহাখুশী, সকলকে ডাকিয়া দেখাইতে লাগিল—"বাবা আমাকে আনিয়া দিয়াছে"—'বাবা' এদেশে ঠাকুরদাকে বলে, সে আমাকে বাবা বলিয়াই ডাকে। তাহার পরদিন মোরাদাবাদ হইতে অন্যত্র যাইব শুনিয়া মুন্না, মুন্নার মা ভীষণ প্রতিবাদ জানাইলেন। মুন্নার মা বলিয়া পাঠাইলেন, বাবুজীকে কাল কিছুতেই যাইতে দেওয়া হইবে না। ওম্‌প্রকাশ বলিতে লাগিল—কেন জানি না, আপনাকে ছাড়িতে মন কিছুতেই চাহিতেছে না। তাঁহাদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইলাম, মনে হইল, দুদিন আগেও তো ইহাদের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় ছিল না—ইহারা কি আমার পর, না, পরমাত্মীয়!

॥ এগার ॥

বাবু রামগোপাল মিশ্র পরে ডাকযোগে জাতিস্মর সম্বন্ধে কয়েকটি রিপোর্ট আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তিনি জাতিস্মর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যে ঘটনাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহশূন্য হইয়াছিলেন তাহার রিপোর্ট আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে কয়েকটি বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

৭ই নবেম্বর, ১৯২৭ সালে উত্তর প্রদেশের মৈনপুরী জেলার থানা ফরহা, তহশিল যশরানার অন্তর্গত কৌরারী গ্রামের রামচরণ মহাজনের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। যখন তাহার বয়স প্রায় আড়াই বৎসর তখন একদিন সে তাহার কুর্ত্তা পরিধান করিয়া এবং কাঁধে একখানা গামছা ফেলিয়া ফরহা গ্রামের রাস্তা দিয়া যাইবার চেষ্টা করে। যখন তাহাকে প্রশ্ন করা হয় যে, সে কোথায় যাইতেছে, তখন সে বলে যে, সে ফরহা গ্রামের গোপী বানিয়া—তাহার নিজের বাড়ীতে যাইতেছে। তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তুমি যে সেই গ্রামের গোপী বানিয়া ছিলে তাহার প্রমাণ কি? কিরূপে গোপী বানিয়ার মৃত্যু হইয়াছিল তাহা বলিতে পার কি? তখন সে বলে যে, ফরহা গ্রামে তাহার একখানা মুদিখানার দোকান ছিল, একদিন সে তাহার এক খরিদ্দারের জন্য গুদাম হইতে গুঁড়া রং বাহির করিতেছিল, তখন অতর্কিতে একটি সাপ তাহাকে কামড়ায় এবং সেই সর্পাঘাতই তাহার মৃত্যুর কারণ হয়। তখন তাহাকে পুনরায় প্রশ্ন করা হয়, বলিতে পার কি গোপী বানিয়ার আর কে আছে? উত্তরে সে বলে যে, এক স্ত্রী, এক পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া সে মারা যায়। সে আরও প্রকাশ করে যে, তাহার বাড়ীর একস্থানে সে কিছু টাকা পুঁতিয়া রাখিয়া আসিয়াছে।

ফরহা গ্রামখানি কৌরারী গ্রাম হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ফরহা গ্রামের গোপী বানিয়ার সর্পাঘাতে মৃত্যু

হয় এবং বালকটি যেভাবে তাহাকে সাপে কামড়াইয়াছিল বলিয়া বলে, তাহা যথার্থ। সুতরাং কৌরারী গ্রামের এই সংবাদ লোকমুখে ফরহা গ্রামে পৌঁছাইতে মোটেই বিলম্ব হইল না। ফরহা গ্রামের গোপী বানিয়ার স্ত্রী এই সংবাদ অবগত হইয়া ঔৎসুক্যবশতঃ তাহার পুত্রকন্যা লইয়া বালকটিকে দেখিবার জন্য কৌরারী গ্রামে আসে। বালকটির এই অদ্ভুত কাহিনী প্রচারিত হইবামাত্র বহুলোক তাহাকে দেখিতে আসে। তাহাদের মধ্য হইতে সে প্রথমে তাহার বিধবা স্ত্রীকে সনাক্ত করে, পরে তাহার পুত্র ও কন্যাকে চিনিতে পারে।

পরে গোপী বানিয়ার বিধবা পত্নী যখন তাহার পুত্র এবং কন্যাসহ নিজ বাড়ীতে যাইবার উপক্রম করে তখন সেই বালকটি তাহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে চাহে না। যখন সন্ধ্যা আগতপ্রায় তখন সেই বিধবা স্ত্রীলোকটি বালকের হাত হইতে নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলে বালকটি ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করে এবং তাহার সঙ্গে যাইতে চাহে। তখন গোপী বানিয়ার বিধবা স্ত্রী অনন্যোপায় হইয়া রামচরণ মহাজন ও তাহার স্ত্রীকে বলে যে, ছেলেটিকে আমায় দিন, আমি উহাকে লালনপালন করিব। প্রকৃতপক্ষে সেইদিন এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। পরে অতিকষ্টে বালকের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া গোপী বানিয়ার বিধবা পত্নী অতিশয় দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পুত্র-কন্যাসহ বাড়ীতে ফিরিয়া আসে।

বালকটি বলিয়াছিল যে, গোপী বানিয়া একস্থানে কিছু টাকা পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যে বাড়ীতে সে টাকা পুঁতিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ করে তাহা দেনার দায়ে বিক্রয় হইয়া যাইবার জন্য উহার সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব হইয়া উঠে না। কিন্তু ইহা জানা যায় যে, রামস্বরূপ নামে যে ব্যক্তি এই বাড়ী ক্রয় করে, সে গরীব ছিল। গোপী বানিয়ার মৃত্যুর পর সে হঠাৎ ধনী হইয়া উঠে। তাহাতে গ্রামের সকলেই সন্দেহ করে যে, গোপী বানিয়ার প্রোথিত অর্থ পাইয়াই সে হঠাৎ ধনবান্ হইয়া থাকিবে।

সাড়ে তিন বৎসর হইল গোপী বানিয়ার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায় না এবং সেই বালকটির বর্ত্তমান বয়স তুই বৎসর ছয় মাস।

এই ঘটনার বিবরণ মৈনপুর কলেক্টরেটের ষ্টেনোগ্রাফার বাবু রাজুনাথ ভাটনাগার ও মৈনপুরীর কলেক্টরেটের কর্ম্মচারী বাবু শ্যামচরণ ও বাবু নাথীলাল কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছিল। কৌরারী গ্রামের চৌকীদার এবং ফরহা গ্রামের ট্যাক্স কালেক্টর ও অন্যান্য অধিবাসিগণও উক্ত বিবরণ সত্য বলিয়া আমার নিকট বলিয়াছে।

বালকটির বর্ত্তমান বয়স তুই বৎসর ছয় মাস। ফরহা গ্রাম মৈনপুরী হইতে ৪০ মাইল, প্রত্যহ সন্ধ্যায় বাস মৈনপুরী হইতে ফরহা যায়। কৌরারী গ্রাম মৈনপুরী-ফরহা রোড হইতে তুই ফারলং দূরে। ফরহা গ্রাম হইতে তিন মাইল। বালকটির পিতামাতা বালকটিকে পরীক্ষা করিতে কোন আপত্তি করে নাই।

স্বাঃ রামগোপাল মিশ্র, ২২।১২।১৯২৯

॥ বার ॥

বিটলী প্রায়ই বলিত যে, তাহার মৃত্যু হইলে সে তাহার ভ্রাতা বাবুরামের স্ত্রীর গর্ভে আসিবে। গত ১৯৬৫ সম্বতে, বৈশাখ মাসে যখন সে তাহার ভগ্নী কৃষ্ণা দেবীর বিবাহ-উপলক্ষে 'এটোয়া' আসিয়াছিল তখন শেষবারের মত এই কথা সে তাহার ভ্রাতা বাবুরামের স্ত্রীকে বলিয়াছিল। ১৯৫৬ সম্বতের আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে ফরাক্কাবাদে তাহার স্বামীর গৃহে বিটলীর মৃত্যু হয়।

১৯৬৮ সম্বতে আষাঢ় মাসে কৃষ্ণপক্ষে এটোয়াতে বাবুরামের প্রথম সন্তান

কন্যা গিরিজার জন্ম হয়। বিটলীর শ্বশুরমহাশয় একদিন দৈবক্রমে এটোয়াতে বাবুরামের বাটিতে আসেন। গিরিজার বয়স তখন চারি বৎসর মাত্র হইয়াছে। বালিকা গিরিজা তাহাকে দেখিয়াই তাহার পূর্ব্বজীবনের শ্বশুর বলিয়া তাহাকে চিনিতে পারে।

পাঁচ বৎসর বয়সের সময় গিরিজা দেবীকে ফরাক্কাবাদে কৃষ্ণা দেবীর শ্বশুরগৃহে লইয়া যাওয়া হয়। একদিন বিটলীর স্বামী বাবু বলদেওপ্রসাদ কৃষ্ণা দেবীর গৃহে আগমন করেন—এবং তাঁহাকে দেখিয়া বালিকা গিরিজা তাঁহাকে তাহার পূর্ব্বজীবনের স্বামী বলিয়া চিনিতে পারে।

১৯৭৭ সম্বতের বৈশাখ মাসে কৃষ্ণাদেবীর পুত্র প্যারীলালের বিবাহ-উপলক্ষে বালিকা গিরিজাকে ফরাক্কাবাদে লইয়া যাওয়া হয়—বিটলীর স্বামী বাবু বলদেওপ্রসাদের গৃহে তাহাকে লইয়া যাওয়া হয়। বাবু বলদেও-প্রসাদের বাড়ী দেখিয়া সে বলে যে, উহা তাহার বাড়ী নহে।

তারপর তাহাকে তাহার পুরাতন বাটিতে লইয়া যাওয়া হয়। এই বাড়ী দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ উহা নিজের বাড়ী বলিয়া চিনিতে পারে। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া যে-স্থানে সে নিদ্রা যাইত সেই স্থানটি নির্দ্দেশ করিয়া দেয় এবং তাহার এই বাড়ী অত্যন্ত নোংরা হইয়াছে দেখিয়া খুব দুঃখ প্রকাশ করে এবং বলে যে, বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘর মায় আঙ্গিনা শুদ্ধ সে নিজ হাতে তক্‌তকে-ঝক্‌ঝকে করিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিত। সে বাবু বলদেওপ্রসাদকে পুনরায় এই বাড়ীতে চলিয়া আসিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানায়। বাবু বলদেওপ্রসাদ বিটলীর মৃত্যুর পর ভূতের বাড়ী সন্দেহে উক্ত বাড়ীতে বসবাস করা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। গিরিজা বিটলীর কাপড়-চোপড়, পোষাক-পরিচ্ছদ, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি নিজের বলিয়া সনাক্ত করে। ট্রাঙ্কটি দেখাইয়া বলে যে, এই ট্রাঙ্কটি তাহার ভ্রাতা বাবুরাম এলাহাবাদ হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া তাহাকে উপঢৌকন দিয়াছিল। গিরিজা বাবু বলদেওপ্রসাদের দ্বিতীয়া স্ত্রীকে দেখিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে।

শিশুকালে গিরিজা বলিত যে, তাহার মা তাহার ভাজ, এবং তাহার

বর্ত্তমান পিতা তাহার বড়দাদা। গিরিজার বর্ত্তমান বয়স ১৬ বৎসর, এবং বাল্যকালে যে-সব কাহিনী সে বলিত তাহা সবই তাহার মনে আছে।

গিরিজা পূর্ব্বজীবনে বাবুরামের ভগ্নী বিটলীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, এ জন্মে বাবুরামের কন্যারূপে আসিয়াছে। বাবুরাম বর্ত্তমানে এটোয়াতে ওকালতি করেন।

স্বাক্ষর—রামগোপাল মিশ্র, ৪।৪।২৭

পত্রান্তরে বাবু রামগোপাল মিশ্র, সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট মুরাদাবাদ—আরও একটি সুইডেন দেশবাসী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জাতিস্মর স্ত্রীলোকের কথা জানাইয়াছিলেন, তাহার নাম মিসেস সিগনী রুণ্ডগুইষ্ট (Mrs. Signe Rundguist)। তিনি জনকোপিং, সুইডেন (Jonkoping, Sweden) এই ঠিকানায় থাকেন। রামগোপালবাবু উক্ত পত্রে আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি এই মহিলাটির জাতিস্মরত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ-প্রয়োগ পাইয়া নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। বাবু রামগোপাল মিশ্রের নিকট উক্ত মহিলাটির বিস্তৃত বিবরণ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলাম, দুঃখের বিষয় তাহার কোন উত্তর পাই নাই। জানি না, আমার সে পত্র তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছিল কিনা।

॥ তের ॥

কানপুরে অবস্থান কালে একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে কানপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়া প্লাটফর্ম্মের একখানি বেঞ্চে বসিয়া একখানি ইংরাজী দৈনিক ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা পড়িতেছিলাম। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে, উহাতে টুণ্ডলার একটি জাতিস্মর বালিকার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদটি পাঠ করিয়াই স্থির করিলাম যে, কানপুরের কাজ শেষ করিয়াই টুণ্ডলা যাইয়া এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া আসিব—আর টুণ্ডলা কানপুর হইতে বেশী দূরেও নয়।

তদনুসারে শুক্রবার দিন কানপুর হইতে রাত্রি ১১টা ৫৫ মিনিটের পার্শেল এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া রাত্রি ৪॥টার সময় টুণ্ডলা পৌঁছিলাম। পৌঁছিয়া প্রথমে রিলিভিং গার্ড-এর রুমে যাইয়া একজন গার্ডকে ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের ষ্টেটসম্যান দেখাইয়া জাতিস্মর মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আবার এ সম্বন্ধে অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন, দুঃখের বিষয় এ সম্বন্ধে কেহই কিছু বলিতে পারিল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া একজন কুলির মাথায় আমার সুটকেশ ও বেডিং চাপাইয়া ধর্ম্মশালার উদ্দেশ্যে চলিলাম। ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে আর একজন কুলিকে উক্ত বালিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে, এখান হইতে দুই মাইল দূরে মামুদাবাদ গ্রামে এইরূপ একটি ঘটনার কথা সে শুনিয়াছে এবং সে বলিল যে, বেলা দশটার সময় আমাকে ঐ গ্রামে লইয়া যাইতে পারে। বেলা হইলে আসিয়া তাহার খোঁজ লইব বলিয়া তাহার নিকট হইতে তাহার নম্বর জানিয়া লইলাম, তাহার নম্বর সে ৩৫ বলিয়া জানাইল। যে কুলিটি আমার সুটকেশ-বিছানা লইয়া মাথায় করিয়া যাইতেছিল তাহার নম্বর ছিল ২১। এই কুলিটি ধর্ম্মশালায় আমাকে পৌঁছিয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধানান্তে বাহির হইব মনে করিতেছি এমন সময়ে সেই ২১ নম্বরের কুলিটি আসিয়া আমায় জানাইল যে, সে সেই মেয়েটির সন্ধান পাইয়াছে। Train examiner-এর অফিসের sick line-এর menial staff-এর শিবলালের কন্যা সে, তাহার বাড়ী মামুদাবাদ। কুলিটি বলিল, আপনি যদি যাইতে চাহেন তবে এখনই চলুন, কারণ বেলা ৭টা হইতে শিবলালের ডিউটি আরম্ভ হয়। কুলিটির নিকট এই সংবাদ শুনিয়া কালবিলম্ব না করিয়া কুলিটির সঙ্গে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িলাম। পাকা রাস্তা দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গ্রাম্যপথ দিয়া চলিতে লাগিলাম, চারিদিকে বজরার ক্ষেত, স্থানে স্থানে বৃষ্টির জল বাধিয়া রহিয়াছে। মামুদাপুর গ্রামে পৌঁছিয়া শুনিলাম যে, শিবলাল কাজে চলিয়া গিয়াছে। শিবলালের স্ত্রী ও কন্যা বাড়ীতে ছিল। শিবলালের স্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে

লাগিলাম। সে বলিল, "তাহার তিনটি কন্যা, এই জাতিস্মর মেয়েটি মধ্যম। বড়টির বিবাহ হইয়াছে (তাহাকেও দেখিলাম)। মধ্যম কন্যার নাম "চরণ দেই"। তাহার বর্ত্তমান বয়স এগার বৎসর। ৭ই কার্ত্তিক সন্ধ্যা পাঁচ ঘটিকার সময় তাহার জন্ম হয়, আগামী ৭ই কার্ত্তিক তাহার এগার বৎসর পূর্ণ হইবে। তিন বৎসর বয়স হইলে মেয়েটি কথা বলিতে আরম্ভ করে। কথা বলিতে আরম্ভ করিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে তাহার পূর্ব্বজীবনের শাশুড়ী কোকালিয়া ব্রাহ্মণীর নাম করে। কিছুদিন পরে যখন সে একটু ভাল করিয়া কথা বলিতে সক্ষম হয় তখন একদিন সে আমাকে বলে—তোমাদের ঘর দিয়া জল পড়ে, আমার বাড়ী এর চাইতে কত ভাল ছিল, আমার পাকা বাড়ী ছিল। তাহার বড় বোনের বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়া বলে, "তোমাদের মেয়ের বিয়েতে তোমরা মোটেই পয়সা খরচ করিলে না, আমার মেয়ের বিয়েতে কিন্তু আমি বহু টাকা খরচ করিয়াছিলাম।"

মেয়েটির মা বলিতে লাগিল, "আমরা মেয়েটিকে তাহার পূর্ব্বজীবনের কথা যাহাতে সে না বলে, তাহার জন্য কত প্রহার করিয়াছি, কারণ—আমাদের সংস্কার আছে যে, যাহারা এইরূপ পূর্ব্বজীবনের কথা বলে তাহারা বেশীদিন বাঁচে না। প্রচলিত সংস্কারানুযায়ী মেয়েটিকে কুম্ভকারের চাকে বসাইয়া পাক দেওয়া হইয়াছিল; এরূপ করিলে নাকি পূর্ব্বজীবনের স্মৃতি বিলুপ্ত হয়—এরূপ ধারণা এ অঞ্চলে আছে। কিন্তু তাহাতেও তাহার স্মৃতি বিলুপ্ত হইল না।"

সে মাঝে মাঝে তাহার পূর্ব্বজীবনের কথা বলিয়া যাইত। একদিন সে বলিল যে, পূর্ব্বজীবনে তাহার বাড়ী আগ্রা শহরের জীন-কী-মণ্ডি মহল্লায় ছিল। মেয়েটির মাতা বলিলেন, "মেয়েটির কথা সত্য কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তাহার পিতা শিবলাল তাহার এক সহকর্ম্মী সরাকৎ আলিকে সঙ্গে লইয়া কন্যা সহ গত ২৭শে আগষ্ট তারিখে আগ্রা শহরে যায়। আগ্রা সিটি ষ্টেশনে নামিয়া তাহারা প্রথমে বেলুনগঞ্জ goods shed-এর

নিকটে যায়। সেখান হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া জীন-কী-মণ্ডির রাস্তা ঠিক করিতে না পারিয়া পুনরায় বেলুনগঞ্জ goods shed-এর নিকট ফিরিয়া আসে। পুনরায় সরাকৎ আলি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সেই দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, হঠাৎ পথে একটি বাড়ী দেখাইয়া মেয়েটি 'এইটিই আমার বাড়ী' এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে।"

মেয়েটির মা বলিতে লাগিলেন যে, "টুণ্ডলা হইতে রওনা হইবার পূর্ব্বেই চরণ দেই বলিয়াছিল যে, তাহার বাড়ী পূর্ব্বমুখী এবং বাড়ীর নিকটে নিম ও বটের গাছ আছে। আমার স্বামী ও সরাকৎ আলি আগ্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিয়াছিল যে, মেয়ের বর্ণিত বিবরণ সত্য। তাহাদের নিকট আরও শুনিলাম যে, এই আমার বাড়ী বলিয়া সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং বাড়ীর মধ্যে মহিলাদের মধ্য হইতে একজনকে তাহার বিধবা পুত্রবধূরূপে চিনিয়া লইল এবং যাইয়া তাহার হাত ধরিল। ইতিমধ্যে এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইয়া যাওয়াতে অসংখ্য জনতা আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটির পূর্ব্ব-জীবনের পুত্র আগ্রা শহরের ইণ্ডিয়া মিলে কাজ করিত, তাহার নিকট এ সংবাদ পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। খবর পাইয়া তাহার পুত্র মিলের বহু লোকজনসহ মেয়েটিকে দেখিতে আসিল। অসংখ্য জনতার মধ্য হইতে মেয়েটি তাহার পুত্রকে চিনিয়া লইল। পূর্ব্বজীবনে যে-স্থানে বসিয়া সে পূজা করিত সেই স্থানটি দেখাইয়া দিল। বাড়ীর আর একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সে বলিল যে, এখানে মিস্ত্রীরা থাকিত (এখনও সেখানে মিস্ত্রীরা থাকে)। তারপর বাড়ীর আর একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া মেয়েটি বলে যে, ঐখানে টাকা পোঁতা আছে। পূর্ব্বজীবনের এক বৃদ্ধা মামীশাশুড়ীকেও সে সনাক্ত করিয়াছিল।"

আগ্রা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর মেয়েটির পূর্ব্বজীবনের পুত্র দয়ানন্দ মেয়েটিকে দেখিবার জন্য মামুদাবাদ গ্রামে আসে এবং মেয়েটিকে পুনরায় আর একবার আগ্রায় লইয়া যাইবার জন্য মেয়ের পিতাকে

অনুরোধ জানায়। তদনুসারে মেয়ের পিতা শিবলাল মেয়েটিকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় ৩রা সেপ্টেম্বর, রবিবার তাহাদের জীন-কী-মণ্ডির বাড়ীতে গিয়াছিল। এবারে যাইয়া মেয়েটি বলে, জীন-কী-মণ্ডির বাড়ীতে বসবাস করিবার পূর্ব্বে তাহারা উজিরপুর মহল্লায় (near Harbit Park, Agra) বাস করিত ; সেখানে তাহাদের চারিখানি বাড়ী ছিল। সেই সব বাড়ী ও সম্পত্তি লইয়া তাহার জীবিতকালে আত্মীয়দের সঙ্গে মোকর্দ্দমা চলিতেছিল (সে মোকর্দ্দমা তখনও চলিতেছিল)।

মেয়ের মায়ের সঙ্গে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর আমি মেয়েটিকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম—

প্রঃ। পূর্ব্বজীবনে তোমার কি নাম ছিল বলিতে পার কি ?

উঃ। দ্রোপা।

প্রঃ। পূর্ব্বজীবনে তোমার কাহার প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতি ছিল ? কাহার কথা সব সময়ে মনে পড়িত ?

উঃ। আমার স্বামীকেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতাম এবং তাঁহার কথাই প্রায় সব সময়েই মনে পড়িত ; তাঁহার পর আমার পুত্র।

প্রঃ। মৃত্যুসময়ে তোমার কাহার কথা মনে হইয়াছিল, মনে আছে কি ?

উঃ। হ্যাঁ আছে। আমার স্বামীর কথা এবং পুত্রের কথা।

প্রঃ। গতজীবনে কি তুমি পূজা-অর্চ্চনাদি করিতে ?

উঃ। হ্যাঁ, আমাদের গৃহ-দেবী ছিলেন, আমি তাঁহারই পূজা করিতাম।

প্রঃ। তুমি তোমার গৃহ-দেবীর পূজা করিতে কিন্তু মৃত্যু-সময়ে তাঁহার কোন কথা তোমার মনে হইল না কি ?

মেয়েটি এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

প্রঃ। কিসে তোমার মৃত্যু হইয়াছিল ? মৃত্যুকালের কোন ঘটনার কথা তোমার মনে আছে কি ?

উঃ। আমার জ্বররোগে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই আমাদের সম্পত্তি লইয়া আত্মীয়দের সহিত আমাদের মোকর্দ্দমা চলিতেছিল—তাহার কথা আমার মনে আছে, আর কোন বিষয়ের কথা মনে নাই।

প্রঃ। তোমার স্বামী কি তোমার মৃত্যুসময়ে জীবিত ছিলেন?

উঃ। আমার স্বামীর মৃত্যুর অনেক পরে আমার মৃত্যু হয়।

প্রঃ। মৃত্যুসময়ে তোমার পুত্র-কন্যা কয়টি ছিল?

উঃ। মৃত্যুসময়ে আমার এক পুত্র, এক কন্যা ছিল। আমার দেবরের পুত্রকে আমি পালন করিয়াছিলাম, তাহার পিতামাতা অল্প বয়সেই মারা যায়, কাজেই সেও আমার পুত্রই ছিল।

প্রঃ। তুমি জীবিতকালেই তোমার পুত্র-কন্যার বিবাহ দিয়াছিলে কি?

উঃ। আমার নিজের পুত্র ও কন্যার বিবাহ আমার জীবিত কালেই আমি দিয়াছিলাম।

প্রঃ। তোমার নিজপুত্র কি তোমাকে খুব ভক্তি করিত?

উঃ। হ্যাঁ, সে আমাকে খুব ভক্তি করিত।

প্রঃ। তোমার স্বামী কী কার্য্য করিতেন? ব্রাহ্মণের কার্য্য যজন-যাজন করিতেন কি?

উঃ। না, তিনি যজন-যাজনাদি করিতেন না; তিনি ক্ষেতের কাজ করিতেন।

প্রঃ। আচ্ছা, পূর্ব্বজীবনের স্মৃতি যাহা-যাহা প্রথমে তোমার মনে ছিল, বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা ম্লান হইয়া যাইতেছে কি?

উঃ। যাহা-যাহা আমার মনে আছে, তাহা স্পষ্টভাবেই মনে আছে—বয়সের সঙ্গে তাহা মোটেই ম্লান হয় নাই।

প্রঃ। পূর্ব্বজীবনে তুমি কি তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়াছিলে? কোন্ কোন্ তীর্থে গিয়াছিলে বলিতে পার কি?

উঃ। এইটুকু মনে আছে যে, আমি অনেক তীর্থে গিয়াছিলাম, কিন্তু কোন্ কোন্ তীর্থে গিয়াছিলাম তাহা মনে নাই।

প্রঃ। আচ্ছা, তোমার স্বামী ও পুত্র ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গে তোমার বিশেষ ভাব ছিল কি ?

উঃ। আমার মামীশাশুড়ীর সহিত খুব হৃদ্যতা ছিল, তাঁহার নাম আমার মনে নাই।

প্রঃ। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তোমার কি অবস্থা হইয়াছিল, কেমন করিয়া তুমি এখানে আসিলে—তাহা বলিতে পার কি ?

উঃ। না, তাহা কিছু বলিতে পারি না।

মেয়েটির সহিত কথাবার্ত্তা শেষ হইবার পর তাহার মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিবার সময় তাহার মাতা বলিলেন যে, মেয়েটি কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন করে না, তাহার পিতামাতারও না। তাহার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর এবং সে খুব বুদ্ধিমতী। মেয়েটি তাঁহাকে বলিয়াছে যে, এ জীবনে সে বিবাহ করিবে না।

তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া বালিকার পিতা শিবলাল ও সরাকৎ আলির সহিত দেখা করিবার উদ্দেশ্যে কুলিটির সহিত টুণ্ডলা ষ্টেশনে আসিলাম। প্রথমে রিলিভিং গার্ড মিঃ জি, আর, পলিওয়ালের সহিত দেখা হইলে বালিকা ও মাতার সহিত যে-সব কথা হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে বলিলাম। মেয়েটির একটি ফটো লইবার ইচ্ছা ছিল, তাই মিঃ পলিওয়ালকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এখানে কোন ফটোগ্রাফার আছে কিনা। উত্তরে তিনি বলিলেন যে, এখানে কোন ফটোগ্রাফার নাই বটে কিন্তু তিনি ফটো লইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন—এই বলিয়া তিনি আমাকে তাঁহার কোয়ার্টারে লইয়া গেলেন এবং মিঃ আর, বি, লাল নামে অপর একজন রিলিভিং গার্ডের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মিঃ লাল আমাকে বলিলেন যে, তাঁহার নিকট এখন ফটো-প্লেট নাই, তিনি প্লেট আনাইয়া মেয়েটির ফটো উঠাইয়া উহা আমাকে পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং আমার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইলেন। তাঁহাদের সহিত আরও নানাপ্রকার আলাপাদির পর শিবলালের সহিত দেখা করিবার

জন্য ট্রেন একজামিনারের অফিসে আসিলাম। সেখানে শিবলাল ও সরাকৎ আলির সহিত দেখা হইল। মেয়ে ও মেয়ের মাতার নিকট যাহা-যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা ঠিক কিনা জানিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে প্রশ্ন করায় তাহারা যাহা-যাহা বলিল, তাহা মেয়ে ও তাহার মাতার প্রদত্ত বিবরণের সহিত ঠিক ঠিক মিলিয়া গেল। তখন আমি সরাকৎ আলিকে বলিলাম, তুমি ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী, তোমরা তো জন্মান্তরে বিশ্বাস কর না, এই বালিকাটি সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কি? উত্তরে সরাকৎ আলি বলিল, "বাবুজী, আমাদের ধর্ম্মাবলম্বীরা জন্মান্তরে বিশ্বাসী নহে, কিন্তু আমার বন্ধু শিবলালের কন্যার ব্যাপার আমি প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি এবং মেয়েটিকে আমিই সঙ্গে করিয়া প্রথমে আগ্রায় লইয়া যাই। সেখানে মেয়েটি যেভাবে সেখানকার সকলকে সনাক্ত করিল তাহাতে জন্মান্তর যে সত্য এ কথা অস্বীকার করা আমার পক্ষে অসম্ভব মনে হইতেছে, কিন্তু আমার জাতভাইরা আমার এ কথা শুনিলে আমাকে হয়তো সমাজচ্যুত করিবে। তাই ব্যাপারটা সত্য হইলেও সকলের নিকট স্বীকার করিতে ভয় পাই।"

সেখানেই Train-examiner বাবু বেণীপ্রসাদের সঙ্গে আলাপ হইল। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, আলিগড়ে একটি মুসলমানের ছেলের পূর্ব্বজীবনের স্মৃতি আছে। তিনি বলিলেন, এখন হইতে প্রায় দেড়মাস পূর্ব্বে তিনি গাজিয়াবাদ যাইতেছিলেন, ট্রেনের মধ্যে সেই মুসলমান ভদ্রলোক ও তাহার জাতিস্মর ছেলেটির সহিত আলাপ হয়। বালকের পিতার নিকট হইতে তিনি ছেলেটির পূর্ব্বজীবনের স্মৃতি সম্বন্ধে অনেক ঘটনা জানিতে পারেন। তিনি বলিলেন, ছেলেটি নাকি পূর্ব্বজন্মে হিন্দুগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বালকটির বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন ইদ্‌পর্ব্ব উপলক্ষে তাহাদের বাড়ীর পাশেই গো-কোর্ব্বানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইদের দিন বালকটি আসিয়া কোর্ব্বানীর জন্য নির্দ্দিষ্ট গোবৎসের গলা এরূপভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে ও কাঁদিতে থাকে যে, তাহাকে ছিনাইয়া

লওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। সে বলিতে থাক যে, "যদি গোবৎসকে বধ করিতে হয় তবে আগে আমাকে কোর্ব্বানী দাও, তাহার পর তোমরা গরুকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পার, কিন্তু আমি জীবিত থাকিতে কিছুতেই ইহাকে কোর্ব্বানী করিতে দিব না।" ইহা লইয়া ঘটনাস্থলে মহা হাঙ্গামা উপস্থিত হয়, অগত্যা কোর্ব্বানীর উদ্যোক্তাগণকে স্থানান্তরে যাইয়া বালকের অজ্ঞাতসারে কোর্ব্বানীপর্ব্ব সমাধা করিতে হয়।

বাবু বেণীপ্রসাদ আমাকে বলিলেন যে, ছেলেটির বাপের ঠিকানা ও আর আর বিষয় তিনি পরে আমাকে জানাইবেন। সেখানেই আর এক মুসলমান Train-examiner মহম্মদ সেকেন্দর খান-এর সঙ্গে পরিচয় হইল। তিনি মুসলমান হইলেও জন্মান্তরে বিশ্বাসী। তিনি বলিলেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ পৃথ্বীরাজের সময়ে মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করেন—তাঁহারা চৌহান রাজপুত ছিলেন। এইরূপ আলাপাদির পর তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ধর্ম্মশালায় আসিয়া মধ্যাহ্নভোজন সমাপ্ত করিয়া বিশ্রাম করিলাম। বিশ্রামের পর বেলা ৪॥ টার ট্রেনে আগ্রা রওনা হইলাম। আগ্রা কোর্ট ষ্টেশনে নামিয়া টাঙ্গা করিয়া আগ্রা সিটি ষ্টেশনের নিকটে রায়বাহাদুর বিশ্বম্ভরনাথের ধর্ম্মশালায় আসিলাম। স্নানাদি সারিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম।

পরদিন রবিবার, ১৪-৯-৩৯ তারিখে প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে জীন-কী-মণ্ডির দিকে চলিলাম। রাস্তার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে দয়ানন্দের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। মেয়েটি আগ্রা আসিবার পূর্ব্বে তাহার পূর্ব্বজীবনের নিজ বাড়ীর যে বর্ণনা দিয়াছিল, দেখিলাম উহা ঠিকই। কারণ, দেখিলাম যে, বাড়ীটি পূর্ব্বমুখী এবং বাড়ীর সামনে বটগাছ আছে এবং পাশেই নিমগাছ আছে।

বাড়ীটির ঠিকানা ১৮৭৯ নং জীন-কী-মণ্ডি। বাড়ীর উপরে একজন মিস্ত্রি থাকে, তাহার নাম লালারাম। বাড়ীর প্রকৃত মালিক বাবু মঙ্গল সেন, কিন্তু সকলে লালারাম মিস্ত্রির বাড়ী বলে। কারণ, বহুকাল হইতে

লালারাম মিস্ত্রি এই বাড়ী ভাড়া লইয়া অন্যান্য ভাড়াটিয়া বসাইয়াছে। দয়ানন্দ এই বাড়ীতে বহুকাল হইতেই আছে এবং এই বাড়ীতেই দয়ানন্দের মাতা দ্রোপা দেবীর মৃত্যু হয় এবং এই দ্রোপা দেবীই বর্ত্তমান জন্মে চরণ দেই-রূপে টুণ্ডলার নিকটবর্ত্তী মামুদাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

যাহা হউক, দয়ানন্দজীর বাড়ীতে পৌছিয়া খবর দেওয়াতে দয়ানন্দজী বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। প্রথমে আমি তাহাকে আমার আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলাম, তাহার পর তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—

"ইহা কি সত্য যে, টুণ্ডলার নিকটবর্ত্তী মামুদাবাদ গ্রামের শিবলালের কন্যা চরণ দেই প্রথমে আগ্রায় আসিয়া তোমাকে দেখিবামাত্রই পূর্ব্বজীবনে নিজের পুত্র বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল? কিরূপে সে তোমাকে চিনিতে পারিল এবং সনাক্ত করিল, বলিতে পার কি?" উত্তরে সে বলিল—"হ্যাঁ, আমাকে সর্ব্বপ্রথমে দেখিয়াই সেই মেয়েটি আমাকে তাহার পুত্র দয়ানন্দ বলিয়া চিনিতে পারে।

প্রথমে মেয়েটি যখন আমাদের বাড়ীতে আসে তখন আমি বাড়ীতে ছিলাম না, মিলে কাজ করিতে গিয়াছিলাম। মিলে একজন আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে, টুণ্ডলা হইতে একটি মেয়ে আসিয়াছে, সে বলিতেছে যে, পূর্ব্ব-জীবনে সে নাকি আমার মাতা ছিল এবং আমাদের বাড়ী দেখিয়াই সে নাকি তাহার বাড়ী বলিয়া চিনিয়া লইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে মিলের আরও বহুলোক মেয়েটিকে দেখিবার জন্য আসিল। বাড়ীতে আসিয়া দেখি, উহা জনারণ্যে পরিণত হইয়াছে. লোকের ভিড় ঠেলিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করাই কঠিন। যাহা হউক, অতিকষ্টে কোনরকমে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া দেখিলাম, মেয়েটি আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহাকে ঘিরিয়া বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, কেহ বা দাঁড়াইয়া, কেহ বা বসিয়া আছে। অনেকে তাহাকে প্রশ্ন করিতেছিল, তাহাকে সে চিনিতে পারিয়াছে কি না। আমি আঙ্গিনায় ঢুকিতেই শুনিতে

পাইলাম যে, একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাহাকে প্রশ্ন করিতেছিলেন যে মেয়েটি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে কি না—মেয়েটি ঈষৎ হাসিয়া বলিল যে, হাঁা, সে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে কিন্তু তাঁহার নাম তাহার স্মরণে নাই।

যখন মেয়েটির প্রতি এইরূপ প্রশ্নবাণ বর্ষিত হইতেছিল, তখন আমিই প্রশ্নকারীদের মধ্যে একজন হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "তোমার পূর্ব্বজীবনের পুত্র দয়ানন্দকে তুমি চেন কি? এই ভিড়ের মধ্য হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দিতে পার কি?" আমি প্রশ্ন করিবামাত্র মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "যে আমার সঙ্গে এখন কথা বলিল, সেই দয়ানন্দ।" আমি স্তব্ধ হইয়া গেলাম, মনের মধ্যে হর্ষ, বিস্ময়, শোক, আনন্দের যুগপৎ আবির্ভাবে আমি যেন ভূতাবিষ্টের মত হইয়া গেলাম, মুখে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

তাহার পর আমার ভোজাই (বৌদিদি) আমার নিকট আসিয়া আমাকে বলিল যে, বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই মেয়েটি আমাকে দেখিয়াই আমার হাত ধরিয়া বলিল, "এই আমার পুত্র-বধূ।" (দেবর-পুত্রের বধূ, দেবর-পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার নাম ছিল বিশ্বম্ভর নাথ)।

তারপর দয়ানন্দ বলিল, "যখন তাহার বয়স অনুমান এক বৎসর তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়, তাহার ত্রিশ বৎসর বয়সে তাহার মাতা দ্রোপা দেবীর মৃত্যু হয়। আমার স্ত্রীর মৃত্যু আমার মাতার সাক্ষাতেই হইয়াছিল। আমার পিতা লম্বরদার ছিলেন, জোত-জমার কাজই তিনি দেখিতেন। তিনি ব্রাহ্মণের কাজ যজন-যাজন কোন দিনই করেন নাই।" দয়ানন্দ আরও বলিল,—"আমার মাতার মৃত্যু-সময়ে আমাদের আত্মীয়দের সহিত আগ্রার উজিরপুর মহল্লার সম্পত্তি লইয়া মোকর্দ্দমা চলিতেছিল—সেই মোকর্দ্দমা এখনও চলিতেছে।"

দয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুনিলাম যে, মেয়েটি তোমাদের বাড়ীর কোন স্থানে নাকি টাকা পুঁতিয়া রাখিবার কথা বলিয়াছে, তাহা কি সত্য? তুমি কি সে স্থান খনন করিয়া দেখিয়াছ?"

উত্তরে সে বলিল, "হ্যাঁ, টাকা পুঁতিয়া রাখার কথা বলিয়াছে, আমি এখনও খনন করিয়া দেখি নাই। ইচ্ছা আছে, মেয়েটিকে একবার লইয়া আসিয়া তাহার সম্মুখেই, যে স্থান সে দেখাইয়া দিবে এবং যত ফুট নীচে বলিবে—ততদূর পর্য্যন্ত খনন করিয়া দেখিব।"

পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, "মেয়েটি কত টাকা রাখিয়াছে, তাহা কিছু বলিয়াছে কি?" উত্তরে দয়ানন্দ বলিল, "মেয়েটি দুইটি মোহর আর কিছু টাকা রাখিয়াছে বলিয়াছে, কিন্তু কত টাকা রাখিয়াছে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া কিছু বলে নাই।" দয়ানন্দের মিলে যাইবার সময় হইয়া গিয়াছিল, কাজেই সে আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, মিলে চলিয়া গেল।

দয়ানন্দ মিলে চলিয়া গেলে আমি তাহার বাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর লোকজনদের সঙ্গে আলাপ করিলাম, তাহারা সকলেই দয়ানন্দ যাহা বলিয়াছে, তাহা যথার্থ বলিল। পাশের বাড়ীর মালিক বাবু রামভরোসী লালের সহিত বিশেষভাবে আলাপ হইল, তিনিও দয়ানন্দের কথা সব সমর্থন করিলেন এবং বলিলেন যে, মেয়েটি যখন প্রথম আসে, তখন তিনি উপস্থিত ছিলেন। চলিয়া আসিবার সময় তাঁহাকে বলিলাম, "যদি দরকার হয়, পত্র দিব, দয়া করিয়া উত্তর দিবেন।" উত্তরে তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।" তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিলাম এবং তৎপর দিনই আবার কানপুরে আসিলাম।

॥ চৌদ্দ ॥

কানপুরে একবার হিন্দু-মুসলমানে খুব দাঙ্গা হয়। সেই সময় মুসলমানেরা কানপুরের প্রেমনগর মহল্লা-নিবাসী মোক্তার শিবদয়ালকে হত্যা করে। এই ঘটনার কিছুকাল পরে উক্ত মহল্লার দেবীপ্রসাদ ভাটনাগারের একটি পুত্র জন্মে। সেই ছেলেটি যখন প্রথম কথা বলিতে আরম্ভ করে,

তখনই আধ-আধ স্বরে বলিতে থাকে যে, সেইই মৃত মোক্তার শিব-দয়াল—বালকটির জাতিস্মরত্বের বিবরণ মনে হয় ইং ১৯৩৮ সালের মাঝামাঝি পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়। এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্য একবার কানপুরে যাই এবং কানপুরে হরবংশ মহল্লা-নিবাসী আমাদের গুরুভ্রাতা বাবু বদ্রিবিশাল শ্রীবাস্তব মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া উঠি। তাঁহাকে আমার আগমনের উদ্দেশ্য বিবৃত করাতে তিনি বলিলেন যে, বালকটির সম্বন্ধে বিবরণাদি পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে বটে কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন না, তবে তিনি প্রেমনগরের কয়েকজন ভদ্রলোককে জানেন, তাঁহাদের নিকট আমাকে লইয়া যাইবেন বলিলেন।

তাঁহার গৃহে যেদিন পৌঁছিলাম তাহার দুই দিন পরে একদিন অপরাহ্ণে গড়্‌ড়িয়া মহল্লা-নিবাসী বাবু শ্যামলাল ও বাবু বদ্রিবিশাল শ্রীবাস্তবকে সঙ্গে লইয়া একখানি টাঙ্গা করিয়া প্রেমনগর অভিমুখে রওনা হইলাম। হরবংশ মহল হইতে প্রেমনগর মহল্লার দূরত্ব অনুমান তিন মাইল হইবে। সেখানে পৌঁছিয়া বদ্রিবিশালজী তাঁহার এক পরিচিত ভদ্রলোকের সন্ধানে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আমার নিকট আসিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহার সহিত পরিচয় হইলে জানিতে পারিলাম যে, তিনি সেই জাতিস্মর বালকটির কাকা হন। তিনি বলিলেন যে, এখানে তাঁহার একটি দোকান আছে এবং সেই দোকানের ৩।৪ খানা বাড়ীর পরেই পরলোকগত শিব-দয়াল মোক্তারের বাড়ী।

সেই ভদ্রলোকটি বলিলেন যে, প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে ৪।৫ দিন বালকটি পূর্ব্বজীবনের কথা বলিয়াছিল, তাহার পর আর কিছু বলে নাই। বোধ হয়, এখন সে ঐ সমস্ত কথা বিস্মৃত হইয়া গিয়া থাকিবে। আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম যে, বালকটিকে একবার ডাকিয়া দিন, তাহাকে অন্ততঃ দেখিয়া যাই। সেখানে তখন পরলোকগত শিবদয়াল মোক্তারের পনর বৎসর বয়স্ক একমাত্র পুত্র ও আরও দুই-তিনটি বালক দাঁড়াইয়া

ছিল। উক্ত ভদ্রলোকটি তখন ঐ বালকদিগকে ছেলেটিকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরেই ছেলেটি তাহার বড়ভাই-এর সঙ্গে আসিল। তাহার কাকা আমাদিগকে নমস্কার করিতে বলায় বালকটি আসিয়া আমাদিগকে নমস্কার করিল। তখন আমি তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। নাম জিজ্ঞাসা করিবামাত্র বালকটি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া চলিয়া যাইতে চাহিল, কাকা তাহাকে পুনরায় ডাকিতে সে পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

বালকটি নিকটে আসিলে তাহাকে নিকটে ডাকিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কিছু খাইবে কি? সে উত্তর করিল, হ্যাঁ, মোমফলী (অর্থাৎ চিনাবাদাম) খাইব। বলিলাম—আর কিছু খাইবে কি? রসগোল্লা কি লালমোহন? বালকটি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

একটি ছেলেকে পয়সা দেওয়াতে সে বালকটির জন্য মোমফলী ও রসগোল্লা লইয়া আসিল—বালকটিকে দিলে সে আগ্রহ সহকারে লইয়া কাকার কোলে বসিয়া উহা খাইতে লাগিল। তাহাকে তখন খুব উৎফুল্ল দেখা যাইতে লাগিল। তখন তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম—

প্রঃ। তোমার নাম কি?

উঃ। মোক্তার সাহেব।

প্রঃ। মোক্তার সাহেব তো শুনিয়াছি মারা গিয়াছেন।

উঃ। আমিই সেই মোক্তার সাহেব।

প্রঃ। কি করিয়া তোমার মৃত্যু হইয়াছিল স্মরণে আছে কি?

উঃ। হ্যাঁ। মুসলমানেরা আমাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল।

প্রঃ। কি দিয়া মারিয়াছিল?

উঃ। করৌলী অর্থাৎ ছুরি দিয়া আমাকে মারিয়াছিল।

প্রঃ। যখন তোমাকে মারে, তখন সেখানে আর কেহ ছিল কি?

উঃ। একজন নয়, অনেক লোক ছিল।

প্রঃ। কে তাহারা?

উঃ। সেখানে অনেক মুসলমান ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন আমাকে ছুরিদ্বারা মারিয়াছিল।

প্রঃ। তাহার পর কি হইল ?

উঃ। আমাকে ছুরিদ্বারা মারিবার পর আমার খুব জল পিপাসা পাইয়াছিল। খুব কাতরকণ্ঠে জল চহিলাম, কেহ জল দিল না।

প্রঃ। তোমার মৃত্যুসময়ে তোমার বাড়ীতে কে কে ছিল ?

উঃ। বাবা, বৌ, একটি ছেলে, দুটি মেয়ে।

প্রঃ। তুমি কাহাকে সব চাইতে বেশী ভালবাসিতে এবং তোমাকেই বা কে বেশী ভালবাসিত ?

উঃ। আমি আমার বৌকে সবচাইতে বেশী ভালবাসিতাম এবং আমার বৌও আমাকে খুব ভালবাসিত।

প্রঃ। তুমি তোমার বৌকে খুব ভালবাসিতে, সেই বৌকে তুমি এখন দেখিতে যাও না ?

উঃ। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে যাই।

প্রঃ। বৌ এখন কোথায় থাকে ?

উঃ। (শিবদয়াল মোক্তারের বাড়ীর দিক্ দেখাইয়া বলিল) ঐখানে থাকে।

ইতিমধ্যে চারিদিক্ হইতে বহুলোক জমা হইয়া গেল—বহু চেষ্টা করিয়াও ভিড় কমাইতে পারা গেল না। বালকটিও এত অধিক জনতা দেখিয়া কেমন যেন ভড়কাইয়া গেল। একেবারে নির্ব্বাক্ স্তব্ধ হইয়া রহিল। বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার নিকট হইতে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। বালকটির কাকা তখন আমাকে বলিলেন—আজ আর হইবে না, আপনি আগামী রবিবারে আসিবেন। আমি আমার দাদাকে অর্থাৎ বালকটির পিতাকে আপনার সম্বন্ধে বলিয়া রাখিব। বালকটির কাকা তখন আমাদিগকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ

জানাইলেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া একখানি টাঙ্গা করিয়া বাবু বদ্রি-বিশালের বাড়ী হরবংশ মহলে ফিরিয়া আসিলাম।

রবিবার প্রাতঃকালে বাবু বদ্রিবিশালকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় একাযোগে প্রেমনগরে দেবীপ্রসাদ ভাটনাগারের বাটীতে গেলাম। সেখানে দেবীবাবুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ ভাটনাগারের সঙ্গে পরিচয় হইল। কুশলপ্রশ্নাদির পর বাবু হরপ্রসাদ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু দেবীপ্রসাদ ভাটনাগারের পুত্র জাতিস্মর বালকটিকে ডাকিলেন। ছেলেটি আসিয়া আমাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়া আমাকে নমস্কার জানাইল। আমি তখন হরপ্রসাদ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—বালকটির নাম কি? উত্তরে তিনি বলিলেন যে, ছেলেটির নাম নিরঙ্কার ভাটনাগার, এই নাম ছাড়া ইহার অন্য কোন ডাকনাম নাই। তখন আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রথমে কতদিন পূর্ব্বে এবং কিভাবে ছেলেটি তাহার পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করে—তাহা আমাকে বলিবেন কি? উত্তরে তিনি বলিলেন—

গতবৎসর গ্রীষ্মকালে যখন খবরের কাগজে এই ছেলেটি সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাহার ১৫।২০ দিন পূর্ব্বে একদিন খেলিবার সময় তাহার বোন ও সঙ্গীদিগের নিকট শিবদয়াল মোক্তারের বাড়ী যে-দিকে সেই দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলে যে, তাহার বাড়ী ঐ দিকে। তারপর হইতে এরূপ প্রায়ই তাহার খেলার সাথীদের নিকট বলিত। ক্রমে ক্রমে এই সংবাদ তাহার পিতামাতার কর্ণগোচর হয়। ইহার কয়েকদিন পরে সে একদিন বলিল, 'আমার বৌ-এর খুব অসুখ করিয়াছে, তাহার জন্য ঔষধ লইয়া যাইব'—এই বলিয়া সে জলের কল হইতে শিশিতে জল ভরিয়া লইল।

ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ বালক কোন দিন শিবদয়াল মোক্তারের বাড়ী যায় নাই বা তাহার বাড়ী কোন্ দিকে বা কতদূর তাহা জানিবার তাহার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। সেইদিন বালককে ঐরূপ শিশিতে

জল ভরিয়া লইতে দেখিয়া, সে উহা লইয়া কোন দিকে যায় তাহা দেখিবার জন্য তাহার মা তাহাকে কোলে করিয়া লইলেন এবং সঙ্গে বালকের পিসিমা, বড়বোন এবং শিল্প-বিভাগের কর্ম্মচারী বাবু দেবকীনন্দন প্রসাদের সতের বৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীমান্ নওয়ালকিশোরও তাহার অনুসরণ করিল। বালকটি মাতার ক্রোড় হইতেই তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। শিবদয়াল মোক্তারের বাড়ীর নিকটে আসিয়া সকলকে থামিতে বলিল এবং শিবদয়ালের বাড়ী দেখাইয়া বলিল—এই বাড়ী আমার। তখন বালক সহ সকলে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাড়ীতে ঢুকিয়া তাহার মা তাহাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া বলিল, "এখানে তোমার বৌকে খুঁজিয়া বাহির কর।" যে ঘরে পরলোকগত শিবদয়াল মোক্তারের স্ত্রী থাকিতেন, সেই ঘরটি তখন বন্ধ ছিল। যাঁহারা বালকটির সঙ্গ লইয়াছিলেন তাঁহারা কেহই শিবদয়াল মোক্তারের স্ত্রীকে চিনিতেন না বা বাড়ীর কোন্ ঘরে তিনি থাকেন তাহাও জানিতেন না। যে ঘরটি বন্ধ ছিল সেই ঘরের নিকট যাইয়া দরজার নীচের শিকল ধরিয়া সে খুব জোরে নাড়িতে লাগিল এবং বলিল, এই ঘরে আমার বৌ থাকে। শিকল নাড়িবার শব্দে একটি স্ত্রীলোক ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল—বালক স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "এই আমার বউ।"

প্রকৃতপক্ষে শিবদয়ালবাবুর স্ত্রী তখন খুবই অসুস্থ ছিলেন। ১৯৩১ সালে কানপুরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় শিবদয়ালবাবুর মৃত্যু হইবার পর শিবদয়ালবাবুর বাড়ীর অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। বাড়ীতে নূতন সিঁড়ি করা হইয়াছিল এবং বাড়ীর সংলগ্ন যে বাগান ছিল তাহাতে কয়েকটি নূতন বাড়ী তৈয়ারী করা হইয়াছিল।

নূতন সিঁড়ি দেখাইয়া বালকটি বলিল যে, "এ সিঁড়ি পূর্ব্বে ছিল না। আমি বাগানের মধ্য দিয়া সিঁড়ি করিয়াছিলাম।" এই বলিয়া সে বাগানের মধ্যে যাইয়া সেই পূর্ব্বেকার সিঁড়ি দেখাইয়া দিল। তারপর বাবু শিবদয়াল যে-ঘরে থাকিতেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "এই

আমার ঘর” এবং তাহার অর্থাৎ শিবদয়ালের ব্যবহৃত জুতা, জামা, বাক্স ইত্যাদি সনাক্ত করিল।

বালককে আরও উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি বিভিন্ন লোকের ছবি আনিয়া তাহার সম্মুখে ধরা হইল এবং তাহাকে বলা হইল, “তোমার অর্থাৎ শিবদয়াল মোক্তারের ছবি কোনটি, তাহা খুঁজিয়া বাহির কর।” ছবিগুলির মধ্য হইতে সে ৺শিবদয়াল মোক্তারের ছবিটি দেখাইয়া দিল। পরে আর একখানি ছবিতে পরলোকগত শিবদয়াল মোক্তারের ছেলেমেয়েদের দেখাইয়া বলিল, “এরাই আমার ছেলেমেয়ে।”

তাহার পর বাগানে যে সমস্ত নূতন বাড়ী উঠিয়াছিল তাহা দেখাইয়া বলিল, “এই সমস্ত বাড়ী আমার সময়ে ছিল না, পরে তৈয়ারী হইয়াছে।”

এই প্রসঙ্গে একটি কথা প্রথমে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—প্রথমে সে যখন শিবদয়াল মোক্তারের স্ত্রীকে দেখিল তখনই তাহাকে বলিয়াছিল, “তোমার নিকট আমি বন্দুক চাহিয়াছিলাম, তুমি তাহা দিলে না, সেইজন্যই তো মুসলমানেরা আমাকে হত্যা করিতে পারিয়াছিল।”

ইহার পর বালক তাহার তিন ভগ্নী, পিসিমা ও নওয়ালকিশোরকে সঙ্গে লইয়া যে স্থানে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যেখানে ৺শিবদয়াল মোক্তারকে মুসলমানেরা ছোরা মারিয়া হত্যা করিয়াছিল সেই স্থান দেখাইয়া বলিল, “এইস্থানে মুসলমানেরা আমাকে ছোরা মারিয়াছিল।” ইহার পর আর একবার বালক কানপুর সনাতন ধর্ম্ম স্কুলের Carpentry Department-এর শিক্ষক বাবু গুরুচরণ লাল, বাবু রঘুবর দয়াল, কানপুর কালেক্টরের ষ্টেনোগ্রাফার ও অন্যান্য অনেককে সঙ্গে লইয়া যাইয়া ঘটনাস্থল দেখাইয়া দিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রাসাদ আরও বলিলেন যে, সেই সময় কানপুর শহরের বহু বিশিষ্ট লোক যথা—Mr. Nayar, I. C. S., Dist. Judge, Cawnpore প্রভৃতি বালকের জাতিস্মরত্ব সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া-

ছিলেন। বাবু হরপ্রসাদ আরও বলিলেন—"আমাদের ইচ্ছা নয় যে, বালকটির পূর্ব্বেকার স্মৃতি পুনঃপুনঃ জাগরিত করিয়া দেওয়া হউক, বরং আমরা চাহি যে, সে যেন পূর্ব্বেকার স্মৃতি বিস্মৃত হয়; পূর্ব্বেকার স্মৃতিসম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করে ইহা আমরা চাহি না।"

তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, শুধু কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি আসি নাই, এই বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্যই আসিয়াছি। তাহাতে আপনার কি আপত্তি হইতে পারে?

তখন বাবু হরপ্রসাদ বলিলেন—"আচ্ছা, বালককে আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।" তখন আমি বালককে জিজ্ঞাসা করিলাম:

প্রঃ। তোমাকে যখন মারিয়াছিল, তখন যে তোমাকে ছোরাদ্বারা মারিয়াছিল সে ব্যতীত আর কেহ ছিল কি?

উঃ। হ্যাঁ, সে ছাড়া আরও অনেক লোক ছিল।

প্রঃ। যখন তোমাকে ছোরা মারিল তখন অর্থাৎ তোমার মৃত্যুর সময় তোমার কাহার কথা মনে পড়িয়াছিল?

উঃ। বৌ-এর কথা।

প্রঃ। আচ্ছা, মৃত্যুর পর এবং পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তুমি কোথায় ছিলে, বলিতে পার কি?

বালক নিরুত্তর রহিল।

প্রঃ। মৃত্যুর পর তুমি কি অবস্থায় ছিলে, কি খাইতে বলিতে পার কি?

বালক তাহারও কোন উত্তর দিল না।

হরপ্রসাদবাবু বলিলেন—পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রশ্ন করিয়াছিল, তাহার কোন উত্তর সে দেয় নাই। হরপ্রসাদবাবুর নিকট বালকটির ফটো লইবার কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন—বেলা ২টার সময় আসিবেন, সেই সময় বালকের পিতার সহিত দেখা হইবে ও ফটো

তুলিবার ব্যবস্থা করা যাইবে। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, Revolutionary partyর একজন লোক—নাম চন্দ্রশেখর আজম—এলাহাবাদে সম্ভবতঃ তাহার ফাঁসি হইয়াছিল, সে পুনরায় লক্ষ্ণৌ-এর নিকটে কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ও তাহার ফাঁসির বৃত্তান্ত ও পূর্ব্বজীবনের আর আর ঘটনার বর্ণনা করিয়াছিল, উহার বিশদ বিবরণ কানপুর হইতে প্রকাশিত "বর্ত্তমান" কাগজে এবং লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক "পাইওনিয়ার"-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

হরপ্রসাদবাবুর সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া টাঙ্গাযোগে পুনরায় হরবংশ মহলে আসিলাম। টাঙ্গাওয়ালাকে বেলা দুই ঘটিকার সময় আসিতে বলিয়া দিলাম। টাঙ্গাওয়ালা ঠিক বেলা দুইটার সময় আসিয়া হাঁক দিল—আমি একাই রওনা হইলাম।

দেবীপ্রসাদবাবুর বাসায় পৌঁছিয়া প্রথমে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাবু হরপ্রসাদের সহিত দেখা হইল। তিনি আমাকে লইয়া গিয়া ঘরের ভিতর বসাইলেন এবং revolving electric fan খুলিয়া দিলেন। জুন মাস—কানপুরে ভীষণ গরম পড়িয়াছে। ইতিমধ্যে দেবীপ্রসাদবাবু আসিলেন, তাঁহার সহিত পরিচয় হইবার পর তাঁহাকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করিলাম :

প্রঃ। এই বালকের জন্মসময়ে আপনার বা বালকের মাতার মনে কিরূপ চিন্তার উদয় হইয়াছিল, বলিতে পারেন কি ?

উঃ। দেখুন, এ সম্বন্ধে কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন। তবে এইমাত্র আপনাকে বলিতে পারি যে, আমার ও আমার স্ত্রীর এই ধারণা বরাবরই ছিল যে, সন্তানের জন্মসময়ে যে-ভাবের প্রাবল্য পিতামাতার মনে থাকে, সেইরূপ সন্তানই জন্মগ্রহণ করে। সেইজন্য সন্তানের জন্মদান সময়ে যাহাতে মনে সদ্ভাব জাগরূক থাকে, সেইদিকে আমাদের উভয়ের লক্ষ্য ছিল। আমরা উভয়েই simply for enjoyment's sake পরস্পর উপগত হই নাই। তাহার পর বালকের মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া বলিলেন—বালকের মাতা বলিল যে, এই ছেলে জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই তাহার

মনে ধর্ম্মজীবন যাপন করিবার একটা প্রবল আকুতি দেখা দিয়াছিল। ছেলে যখন গর্ভে তখনও এই ভাব খুব প্রবল ছিল। দেবীপ্রসাদবাবু বলিলেন—এ বিষয়ে ইহা ছাড়া আর বিশেষ কিছু বলিতে পারিব না।

প্রঃ। আপনি ও আপনার স্ত্রী বাবু শিবদয়ালের মৃত্যুসম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু শুনিয়াছিলেন কি? বালকের জন্মসময়ে ঐ সম্বন্ধে কোন চিন্তা আপনাদের মনকে অধিকার করিয়াছিল কি?

উঃ। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় শিবদয়াল মোক্তারের মৃত্যু-সংবাদ আমরা শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহা সাধারণ মানুষের যেমন হইয়া থাকে—কিছুদিন পরেই সব বিস্মৃত হইয়াছিলাম, উহা আমার মনের উপর কোন গভীর রেখাপাত করে নাই। আমার স্ত্রীর সম্বন্ধেও ঐ কথা। এমনকি আমার পুত্রসম্বন্ধে এইসব ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিবদয়াল মোক্তারের বাড়ী কোনটা বা সে কেমন লোক ইত্যাদি জানিবার কোন অবসর হয় নাই বা জানিতাম না। তাহাদের সহিত কোন সম্পর্ক আমাদের কোনকালে ছিল না।

প্রঃ। আপনার এই পুত্রটির জন্ম কখন হইয়াছিল মনে আছে কি?

উঃ। ১৯৩৩ সালের আগষ্ট মাসে এই ছেলেটির জন্ম হইয়াছিল, সুতরাং ছেলেটির বর্ত্তমান বয়স ছয় বৎসর।

প্রঃ। এই সন্তানের জ্ঞানের উন্মেষ আপনার অন্যান্য সন্তানদের অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বে হইয়াছিল কি?

উঃ। না, অন্যান্য সন্তানদের যেরূপ হইয়াছিল, ইহারও সেইরূপই হইয়াছে।

প্রঃ। অন্য কোন সন্তানদের মধ্যে জাতিস্মরতা বা উজ্জ্বল স্মৃতি-শক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় কিনা?

উঃ। না।

প্রঃ। অন্যান্য সন্তান অপেক্ষা এই সন্তানে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুভব করেন কি?

উঃ। এই জাতিস্মরতা ছাড়া, অন্য কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য তো কিছু দেখিতে পাই না।

প্রঃ। বালকের জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আপনি বা আপনার স্ত্রী কোনরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন কি?

উঃ। না।

প্রঃ। বালক প্রথম তাহার এই পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি কখন বলিতে আরম্ভ করে?

উঃ। যতদূর মনে পড়ে, তিন বৎসর বয়সে বালক কথা বলিতে আরম্ভ করে। বালক পূর্ব্বজন্মসম্বন্ধে প্রথম কথাপ্রসঙ্গে তাহার সঙ্গী ভাইবোনদের নিকট ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে বলিতে আরম্ভ করে অর্থাৎ সংবাদপত্রে বালক সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশিত হইবার ২০।২৫ দিন পূর্ব্বে।

প্রঃ। বালক কি এখনও শিবদয়াল মোক্তারের স্ত্রীর নিকট যায়?

উঃ। পূর্ব্বে যাইত, এখন আর ততটা যায় না।

প্রঃ। তাহার পর কথাপ্রসঙ্গে দেবীবাবু বলিলেন যে, বালক প্রথমে যখন শিবদয়াল মোক্তারের বাড়ীতে গিয়াছিল তখন বলিয়াছিল যে, বাড়ী নির্ম্মাণসময়ে ছুতার-মিস্ত্রী দ্বারা দরজার চৌকাঠে তাহার নাম খোদাই করা হইয়াছিল—ইহা কাহারও জানা ছিল না। খোঁজ লইয়া জানা গেল যে, বালকের কথিত বিবরণ সত্য। তারপর বাবু দেবীপ্রসাদ বলিলেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাস মথুরানগরীর নিকট মহাবন নামক স্থানে। উহাকে গোকুলও বলে। গত ত্রিশ বৎসর হইতে তাঁহারা কানপুরে প্রেমনগর মহল্লায় বাড়ী তৈয়ারী করিয়া বসবাস করিতেছেন। তিনি পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগের Irrigation Branch-এর ওভারসিয়ার ছিলেন, বর্ত্তমানে শিল্পবিভাগের অন্য সেক্‌সনে ওভারসিয়াররূপে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার বর্ত্তমান বয়স ৩৯, তাঁহার স্ত্রীর বয়স ৩২ বৎসর। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিলেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাস মহাবনে বাবু বলদেও দাস স্বরূপ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মথুরা শহরে ওকালতি করিতেন;

হার ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পূর্ব্বজীবনের স্মৃতি জাগ্রত ছিল, আমরা ছেলেবেলায় সে কথা শুনিয়াছি। তিনি মারা গিয়াছেন, তাঁহার ভ্রাতা বাবু গণপৎস্বরূপ ভাটনাগার বর্ত্তমানে আগ্রার মোক্তার। আগ্রায় তাঁহার নিকট অনুসন্ধান করিলে বাবু বলদেও দাস সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ পাইতে পারেন।

তারপর বালকটির ফটো উঠাইবার কথায় ছেলের মাতা প্রথমে আপত্তি করিলেন, পরে বুঝাইয়া বলাতে রাজী হওয়ায় Glass Bazar-এর বাবু নাগনারায়ণের শিবমন্দিরের নিকট J. P. Bhatnagar ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া বালকটির ফটো তুলিয়া লই।

তাহার পর 'দৈনিক বর্ত্তমান' অফিসে যাইয়া সম্পাদকমহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, কানপুরের জাতিস্মর বালক সম্বন্ধে তাঁহার পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সত্য কিনা। উত্তরে তিনি বলিলেন যে, বালকটি সম্বন্ধে তখন এখানকার স্থানীয় জজও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তিনি এখন উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরীর জেলা-জজ। আপনি তাঁহার নিকট পত্র দিলে সব জানিতে পারিবেন।

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১। ৶০ পৃষ্ঠার ১৩ লাইন	
জীব-যোনী	জীব-যোনি
২। ১৭ পৃষ্ঠার ১৩ লাইন	
প্রবোদিরে	প্রপেদিরে
৩। ৩৮ পৃষ্ঠার ২৫ লাইন	
ইং ১৯৩৬ সালের	ইং ১৯৩৫ সালের
৪। ৪৮ পৃষ্ঠার ৭ লাইন	
যায়েজী	জায়েগা
৫। ১৩৮ পৃষ্ঠার ২৪, ২৬ লাইন	
কামগঞ্জে	কাশগঞ্জে
৬। ১৪৭ পৃষ্ঠার ২০ লাইন	
আমাকে	আপনাকে
৭। ১৬৯ পৃষ্ঠার ১১ লাইন	
ডোজাই	ভোজাই